লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

প্রথম প্রকাশ :
২০ শে মে ১৯৬০

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
এ ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭

মুদ্রক :
শ্রীশুভেন্দু রায়
রামকৃষ্ণ-সারদা প্রিণ্টার্স
৯এ রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

মূল্য : ষোল টাকা

লে
নি
ন
বা
দী
র
চো
খে
গা
ন্ধী
বা
দ

উৎসর্গ

তিরিশ দশকের গোড়ায় যাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের পতাকা নিয়ে কাজে নেমেছিলাম তাঁদের অনেকে আজ জীবিত নেই। অনেকে সংগ্রামে আত্মদান ক'রে শহীদ হয়েছেন। তাঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় এই পুস্তক উৎসর্গীত হলো।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

প্রথমেই বলে রাখা ভাল গান্ধীজীর কোনও আনুপূর্বিক জীবনী নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত নয়। এটি কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রবন্ধগুলি মুখ্যত গান্ধীজীর জীবনী সংক্রান্ত নয়, তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব সংক্রান্ত। দুই একটি ক্ষেত্রে দেখা যাবে এমন প্রবন্ধ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে তত্ত্ব সংক্রান্ত না হলেও সেই প্রবন্ধগুলিতে এমন বিষয় আলোচিত হয়েছে যা গান্ধীবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বস্তুতঃ, মূলেই কোনও পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবন্ধগুলি রচিত হয়নি। প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রের জন্য লেখা। এগুলি প্রকাশের পর, সহকর্মী বন্ধু-বান্ধব, যাঁরা অনুগ্রহ করে পড়েছিলেন তাঁরা এগুলি সঙ্কলিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য বলেন। তাঁদের নির্দেশ পালন করলাম মাত্র। পালন করতে গিয়ে স্বভাবতই কিছু নতুন প্রবন্ধ সংযোজন করতে হলো। সেগুলি ইতঃপূর্বে কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশকও প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত সঙ্কলনটির কী রূপ দাঁড়ালো তা সহৃদয় পাঠকগণই বিচার করবেন।

এখন আমি নামকরণের কথা বলবো।

"লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ"—প্রশ্ন উঠতে পারে এ নাম কেন?

ধরুন, গান্ধীজীর প্রশ্ন, "কৃষককে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিয়ে কী করতে চান? সেতো তার পিতামাতা, পত্নী, সন্তানসন্ততি ও নিজ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করতে হয় তা জানে।" এর কী উত্তর দেব? ১৯০৮ সালে যখন তিনি এ কথা লেখেন তখনতো নিপীড়িত কৃষক তার উৎপীড়ক গ্রামবাসী জমিদার বা তার কর্মচারী, পাইক পেয়াদা প্রভৃতি এবং মাতব্বর মহাজন প্রভৃতির সঙ্গে একরকম ব্যবহার করতেই জানতো। শত নিপীড়ন সত্ত্বেও সে ছিল অসহায়। কাজেই মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতো এবং কখনও কখনও বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও অসহায়তার কারণে আবার সেই পুরাতন অবস্থাকেই মেনে নিত। আজও মহাজন একশত টাকার ঋণের বদলে প্রকাশ্যে স্বীকৃত ভাবে দুইশত লিখে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেয়,

জমী তমসুক করিয়ে নেয় বা সচরাচর যা হচ্ছে, বিক্রী কোবালা লিখিয়ে নেয়। ষাট বৎসর আগে কী অবস্থা ছিল গান্ধীজী কি জানতেন না? তখন-তো অক্ষর-জ্ঞানহীন, নেতৃত্ববিহীন সহায়হীন কৃষককে অন্ধভাবে যা কিছু কাগজ সামনে ধরে টিপসই করতে বলা হতো তাতেই টিপসই দিতে হতো। জমীদার ও তাদের কর্মচারীরা খাজনার দাখিলায় সত্য মিথ্যা কী লিখিত তাও তারা জানতে পারত না। অগণিত চাষী যথা সময়ে যথাবিহিত প্রাপ্য মিটিয়েও জমীদার মহাজনের কাছে জমি হারিয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে। এ সব কি একটা পশ্চাৎপদ দেশীয় রাজ্যের আইনজ্ঞ নাগরিক গান্ধীজীর জানা ছিল না?

লেনিনবাদের দৃষ্টিতে গান্ধীজীর উপরে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর যে ভাল ভাবে, নির্দ্দিষ্ট ভাবে দেওয়া যায় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কি প্রয়োজন হয়?

সেই জন্য নামটা কেন এরূপ দিলাম তার কৈফিয়ত দিতে চাই। লেনিনের জন্ম শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে ভারতের বুর্জোয়া-জমীদার শাসকগণের মুখ-পাত্রগণ তাদের ইচ্ছামতো লেনিনকে চিত্রিত করতে লাগলো এবং লেনিন ও গান্ধীকে (ফলে তাঁদের আদর্শ ও কার্য্যক্রমকে) সমতুল হিসাবে উপস্থিত করতে লাগলো। এ কাজে তাদের প্রধান সহায়ক হলো (দেশে ও বিদেশে) একদল বুদ্ধিজীবী যারা নিজেদের মার্কস ও লেনিনের অনুগামী বলে দাবী করে অথচ যারা বিশ্বাসঘাতী সংশোধনবাদের পথ গ্রহণ করেছে। ফলে গান্ধীজীর পূজা অর্চনার সঙ্গে সঙ্গে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে প্রকৃত তত্ত্ব বর্জন ক'রে তাকে হেয় স্তরে অবনমিত ক'রে পরিবেশন করতে লাগলো।

গান্ধীজীও মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিচার করেছেন তাঁর নিজস্ব মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, তাতে, সঙ্গতি থাক কিংবা না থাক।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। সুতরাং গান্ধীবাদ বিচারের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীও হবে লেনিনবাদীয় দৃষ্টিভঙ্গী। সেই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীই বৈজ্ঞানিক বলে আমরা মনে করি এবং সব বিষয় সেই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীতেই আমরা দেখার চেষ্টা করি। চারিদিকে যখন বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তখন পরিষ্কার ভাবে ঐ দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষণা করে দেওয়াই সমীচীন মনে করলাম। বই খোলার আগে পাঠক অজ্ঞাত থাকুন এটা চাই না।

এখন প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলা উচিত। প্রথমেই বলেছি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি লেখা। তার সঙ্গে আছে কিছু নতুন

লেখা। সুতরাং বিচ্ছিন্নতার চরিত্র কিছুটা থাকবে। কিছু কিছু পুনরাবৃত্তিও নজরে পড়তে পারে। আশা করি পাঠক এই ত্রুটিগুলি ক্ষমা করবেন।

এসব সত্ত্বেও সমস্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে যোগসূত্র সহজেই দেখা যাবে। কারণ, বিষয়বস্তুও এক, দৃষ্টিভঙ্গীও এক। দু'টি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কৈফিয়ত প্রয়োজন হতে পারে। একটি হলো মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্ট আসামীদের বিবৃতি সম্বন্ধে আলোচনা। কিন্তু প্রবন্ধ পাঠেই পাঠক দেখবেন, এই পুস্তকের শিরোনামার সঙ্গে ঐ প্রবন্ধের সঙ্গতি আছে। প্রধানতঃ এর কৃতিত্ব যাঁরা বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁদের। অধিকন্তু পাঠক তার সঙ্গে আরও কিছু পাবেন; সেটা হচ্ছে 'পটভূমিকা' বলে যা বর্ণিত হয়েছে। সেও এই পুস্তকের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কারণ, সমসাময়িক কালের অবস্থা সম্বন্ধে এখনকার তরুণরা অনেকে অবহিত হওয়ার সুযোগ পান না। দ্বিতীয় অধ্যায়টি উভয় বাংলার দাঙ্গা সংক্রান্ত প্রবন্ধ। এগুলি ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসের দাঙ্গার পর লেখা। (ফেব্রুয়ারী মাসে 'দেশহিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।) বিনা রক্তে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বলে গান্ধীবাদীরা দাবী করেন। অথচ আমরা দেখেছি রক্তপাত ঘটেছে। যে রক্তপাত হয়েছে তা দেশের পক্ষে বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর। কিন্তু বিনা রক্তপাতে ইংরাজের সঙ্গে সমঝওতা ও ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে—এর চেয়ে বড় নির্লজ্জ মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। সেই মিথ্যার প্রতিবাদে সঙ্কলনে এই প্রবন্ধের স্থান। বাকী বক্তব্যটা পাঠক উল্লিখিত প্রবন্ধেই পাবেন।

এই সূত্রে গান্ধীজীর কতকগুলি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করব :

"...insulting and injuring the Europeans is not non-violence of the Congress type..."

(মর্মার্থ : 'ইউরোপীয়ানদের অপমান করা বা আহত করা কংগ্রেস টাইপের অহিংসা নয়।' গান্ধীজী লিখিত প্রবন্ধ 'মিউটিনি ইন দি নেভী', হরিজন, ৩রা মার্চ, ১৯৪৬)

"...A combination of Hindus and Muslims and others for the purpose of violent action is unholy..."

(মর্মার্থ : 'ঐ উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম এবং অন্যদের সম্মিলিতভাবে হিংসায় সক্রিয় হওয়া অপবিত্র।' উপরিউক্ত প্রবন্ধ।)

"...It is a great relief that the ratings (navymen) have listened to Sardar Patel's advice to surrender...."

(মর্মার্থ : 'নৌবাহিনীর লোকেরা যে আত্মসমর্পণ করার জন্ত সর্দার প্যাটেলের নির্দেশ গ্রহণ করেছেন এতে মহা উদ্বেগের অবসান ঘটেছে।' (উপরোক্ত প্রবন্ধ।)

নৌবাহিনীর বিদ্রোহ সম্বন্ধে গান্ধীজীর এই সব উক্তি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূদের রক্তপাত বন্ধ হল। তার স্থান গ্রহণ করলো দেশের মানুষের রক্তপাত। তাই কি কাম্য ছিল ?

এই কয়টি উদ্ধৃতিই দেখিয়ে দিচ্ছে ১৯২১-২২ সালে বুর্জোয়া নেতৃত্বের দিক থেকে যা ঘটেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বেও ঘটেছিল তাই। বিপ্লবের বিভীষিকাই তাঁদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের রক্তপাতের পরিবর্তে দেশের মানুষের পরস্পরের হাতে পরস্পরের রক্তপাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দিকে প্ররোচিত করেছিল।

নিম্নের উদ্ধৃতিতে তাঁর বক্তব্য আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। নেভীর মিউটিনি কেন মন্দ ? অন্যান্য কারণের সঙ্গে তিনি বলছেন :

"...The lesson would be a bad inheritance. Discipline will be at least as necessary under swaraj as it is now..." (Harijan, 16-3-64)

(মর্মার্থ : 'এই সবক; এই পাঠ পরবর্তী বংশধরদের কাছে হস্তান্তরিত একটা মন্দ ঐতিহ্য হবে। শৃঙ্খলা রক্ষা স্বরাজের অধীনেও প্রয়োজন হবে।' হরিজন, ১৬ই মার্চ, ১৯৪৬।)

যিনি হিংসা চান না তিনি নৌবাহিনীও চান আর তার শৃঙ্খলাও চান। এর সম্বন্ধে পরেও আলোচনা করছি।

ইতোমধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা উচিত। কারণ, গান্ধীজীর আত্মদান এই ব্যাপারে।

সকলেই জানেন সাম্প্রদায়িক বিভেদের ব্যাপারে দায়িত্ব একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যদিকে হিন্দু মুসলমান শোষক-শ্রেণীর, প্রধানত জমিদার শ্রেণীর।

কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মাচার ইত্যাদি জনিত ভেদ-বিভেদের আচারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে লাভ নেই। মার্কস বলেছেন, ভবিষ্যতে শিল্পের ফলে নতুন শ্রেণী বিন্যাস ভারতের "ক্ষমতা ও প্রগতির" এই অন্তরায়গুলি দূর

করবে। এ কাজ শুরুও হয়েছিল। কিন্তু ইংরাজ ও তার সহায়কগণ পুরাতনের জেরকে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিল। দেশের স্বাধীনতা যাঁদের কাম্য এ বিষয়ে তাঁদের অন্যান্য কাজের মধ্যে উচিত ছিল "মধ্যযুগীয় বেষ্টনী ও বিচ্ছেদের" এই রাজনীতিক (১) ব্যবহারের চেহারা খুলে দেওয়া এবং (২) তার প্রতিরোধ করা। নানান দিক থেকেই এই পরিষ্কার পথের বিরোধিতা করা হয়েছে। এখানে একটা সামান্য দৃষ্টান্ত রাখতে চাই—যদিও আমি এ কথা বলতে চাই না যে এই দৃষ্টান্তে উল্লিখিত সমাধানেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হতো।

দৃষ্টান্তটি দিচ্ছি একদিকে দৃষ্টিভঙ্গীটা পরিষ্কার করার জন্য, অন্যদিকে এও সত্য যে খুচরো ঝগড়া ঝাঁটির বিষয় কিছুটা মিটিয়ে দিতে পারলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাজনীতিক কার্য্যসূচীর সুবিধা হতো।

বুর্জোয়া-জমীদার ভেদ-বিভেদের পাণ্ডারা গো-হত্যা আর মসজিদের সামনে বাজনা এই দুইটি বিষয়ে মানুষের নিরীহ ধর্ম-সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে ভেদ বিভেদের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ১৯২৬-২৭ সালে যখন এ বিষয়ে আলোচনা হয়, ইউনিটি কনফারেন্স হয় তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে বেশ জোরদার মত দাঁড়ায় যে সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার মেনে নেওয়ার উপর ভিত্তি করে এর সমাধান করা যায়।

কিন্তু গান্ধীজীর সাধারণ মতই ছিল এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে। তিনি শ্রমিকদের বলতেন, কোটি কোটি নিস্পেষিত মানুষের অধিকারের অকুণ্ঠ দাবী অসাম্যের মতোই ক্ষতিকর। তিনি বলতেন অধিকারের দাবীর পরিবর্তে শ্রমিককে করতে হবে তার কর্তব্য পালন। (হরিজন ৬-৭-৪৭)। যাঁর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ তিনি কিভাবে ধর্ম্ম পালনের গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নেবেন? হিন্দ স্বরাজে তিনি ইংরেজকে মুসলমানকে তাদের নিজেদের ধর্মাচার বর্জন করে তাঁর নিজের ধর্মাচার মেনে নিতে বলেছেন। বস্তুতঃ হিন্দুদেরও আমিষ সম্পূর্ণ বর্জন করে তাঁর ধর্মে সাথী হওয়ার দাবী করেছেন।

তিনি এই ভাবে ক্ষুদ্র জিনিসকে বড় করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথও একবার তাঁকে এই বিষয়ে সাবধান করেছিলেন:

I must repeat that to give undue value to the comparatively unimportant, lowers the value of the important. And so we find that there are numbers of Hindus who

would not hesitate even to kill a Mohammedan if he came to draw water from their own well. If the small be put on an equal footing with the big, it is not content to rest there but needs must push its way higher up. That is how the injunction : 'Thou shalt not drink dubious water' gets the better of the commandment 'Thou shalt not kill'…" (Modern Review September. 1923)

"আমাকে পুনরায় বলতে হবেই—অপেক্ষাতর গুরুত্বহীনকে অযথা গুরুত্ব ও মূল্য দিলে তা যা যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ, তার মূল্য কমিয়ে দেয়। তাই দেখি এমন বেশ কিছু হিন্দু আছে যারা একজন মুসলমান তাদের কুয়ায় জল তুলতে এলে তার প্রাণ হনন করতেও দ্বিধা করে না। যদি ক্ষুদ্র বিষয়কে বড় বিষয়ের সমমর্যাদা দেওয়া হয় তা হলে সেই ক্ষুদ্র বিষয়টি ঐ স্তরেই অবস্থিত থাকে না, ঠেলে উঁচিয়ে ওঠে। এই ভাবেই সেই ধর্মীয় নির্দেশ যাতে বলা হয়েছে যে-জল সম্বন্ধে সংশয় আছে তা পান করো না অন্য যে আর একটি ধর্মীয় নির্দেশ 'প্রাণ হনন করো না,' তাকেও ছাড়িয়ে যায়। (মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোর নিষেধ অন্য ধর্মাবলম্বীরা কেন মানতে বাধ্য হবে? বিশেষ করে পথে বাজনা বাজানো যদি অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচার হয়? এ কথা কিছু মৌলানাও সে সময় বলেছিলেন। কিন্তু ছোট খাটো ব্যাপারে ধর্মোচ্ছ্বাস প্রবল করার একটা অংশ হিসাবেই তো এই উত্তেজনার আবির্ভাব। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ঐরূপ উত্তেজনা সঞ্চারনের ফলে ছোট খাটো জিনিসের বিধি নিষেধ প্রাণ হনন-বিরোধী ধর্মীয় নির্দেশকে অতিক্রম করে চলতে পারে। বলা বাহুল্য শাসক ও শোষক শ্রেণী কর্তৃক মেহনতী শ্রেণীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পরিকল্পিত চক্রান্ত থাকে। সে উদ্দেশ্য ও অপচেষ্টা নিরপেক্ষ—পৃথকভাবেই এসব আলোচনা করছি। তাতে চক্রান্ত করার অনুকূলে কিরূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে পড়ে তার স্বরূপ কিছুটা বোঝা যায়।

১৮৫৭-র বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা এবং গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা তুলনা করলেই ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রথমটিতে ইংরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই অখাদ্যকে মুখ দিয়ে স্পর্শ করানো বা প্রকারান্তরে খাওয়ানো হচ্ছে। অভিযোগ বা অনুযোগ কোনও কিছুই

পরস্পরের বিরুদ্ধে নয় অর্থাৎ হিন্দুর বা মুসলমানের একজনের অপরের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং এই বিদ্রোহ সহজেই ব্যাপক জনসাধারণকে টানতে পারলো এবং ধর্মের প্রশ্ন ছাড়িয়ে ইংরাজকে রাজক্ষমতা থেকে দূর করার আন্দোলনে পর্যবসিত হলো। গান্ধীজীর আন্দোলনে মুসলমানকে তার কতকগুলি ধর্মানুমোদিত আচার (যাতে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ হয় না এমন আচার) বন্ধ করতে বলা হলো। এ রকম ভাবে হিন্দুকেও বলা হলো তার অনুরূপ আচার (যা অপরকে আঘাত করে না এমন আচার) বন্ধ করতে। সংগ্রামের মুখে এসব তবুও সহ্য হচ্ছিল। শেষে চৌরীচৌরার পর সংগ্রামও বন্ধ করা হলো। এখন পরস্পরের নিজের নিজের ধর্মের আচার পালন (যে আচার পালন অপরকে আঘাত করে না সেই আচার পালন) পরস্পরের কাছে অপরাধ হয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে হবে পরস্পরের ধর্মপালনে ব্যাঘাত না করাই ভারতের ঐতিহ্যে সমর্থিত। বিপরীতটা নয়। অবশ্য এ সব হাঙ্গামার মূল কারণ হচ্ছে শত্রুর চক্রান্ত ছাড়া সংগ্রামে পশ্চাদপসরণ। আরও কথা আছে। তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব হচ্ছে না। বস্তুতঃ এইরূপ আলোচনা একটি পৃথক পুস্তকই দাবী করবে। রাজনীতি, অর্থনীতি বাদ দিয়ে মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক প্রীতির পক্ষে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত আকর্ষণের সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। তিনি প্রাণ দিয়ে সে আন্তরিকতার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। কিন্তু পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা, ভুল দৃষ্টিভঙ্গী, বিপ্লবের ভীতি এবং শোষক শ্রেণীর পক্ষে তাঁর শ্রেণীগত পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর প্রধান প্রতিবন্ধক। দুঃখের বিষয় তাঁর এবং বুর্জোয়া জমিদার নেতৃবৃন্দের ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার মূল্য শুধু তাঁকে দিতে হলো না, গোটা দেশটাকে দিতে হলো। অবশ্য তিনি যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন সেই হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়াদের কোন ক্ষতি হয়নি। তাদের এখন পোয়া বারো। কিন্তু ভারতে ও পাকিস্তানে তাদের "নাশিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"। সে হলো উভয় দেশেই শ্রমিক শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বার অগ্রগতি। তাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কারও নেই।

গান্ধীজী ও নৈরাজ্য

গান্ধীজীর সম্বন্ধে বলা হয় তিনি নৈরাজ্যের পক্ষপাতী। অথচ তাঁর রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা সামগ্রিকভাবে দেখলে বোঝা

যায় এরূপ বলার কোনও ভিত্তি নেই। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রের ব্যবহার এবং শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তার প্রয়োগে অবশ্য তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু ধনিক শ্রেণীর প্রয়োজনে রাষ্ট্রের নিষ্পেষণে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলে গেছেন। রাশিয়ার কথা উঠলেই তিনি বলেছেন মানুষ সেখানে যন্ত্রের অংশে পরিণত হয়েছে (হরিজন, ২৮-১-৩৯)। রাশিয়ার রাষ্ট্রজোরের উপর প্রতিষ্ঠিত (হরিজন, ২-১১-৩৪), রাশিয়ার রাষ্ট্রের নিকট তিনি দাবী করেছেন তার হিংসা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্থাৎ পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করতে হবে (হরিজন, ১২-৫-৪৬)। কিন্তু ভারতের তাঁর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্রের জন্য বলেছেন—"we might have to maintain a police force" (Harijan, 25-8-40)—আমাদিগকে হয়তো একটা পুলিশ বাহিনী বজায় রাখতে হবে। "I have not the courage to declare that we can carry on without a police force" (Harijan, 1-9-40)—পুলিশবাহিনী বাদ দিয়ে আমরা চালিয়ে নিতে পারবো এ কথা বলার আমার সাহস নেই। ১৯২২ সালের ৯ই মার্চ 'ইং ইণ্ডিয়ায়' (কত আগে!) তিনি লিখেছেন, পুলিশের কাজের জন্য সেনাবাহিনীর দরকার হবে যদিও তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে অর্থের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বলেছেন, তাদের ভলানটিয়ার হতে হবে। যে দেশে বাধ্যতা মূলক ভাবে নাগরিককে একটা সময় সেনাবাহিনীতে থাকতে হয়, সে দেশে ছাড়া সব দেশেই তো সেনাবাহিনীকে ভলানটিয়ার বাহিনী বলা হয়। (কারণ তাঁরা স্বেচ্ছায় সৈনিকের কাজ গ্রহণ করেন।) তা হলে নৈরাজ্য হয় কেমন করে? নৈরাজ্যের অর্থ তো হচ্ছে এমন ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্র থাকবে না, রাষ্ট্রের নিষ্পেষণের যন্ত্র সৈন্য বাহিনী, পুলিশ প্রভৃতি থাকবে না।

স্বাভাবিক ভাবেই তিনি প্রকৃত নৈরাজ্যের কথা বলতে পারেন না। কারণ, তিনি শ্রেণীহীন সমাজ কল্পনা করেন না। তিনি যেখানে নিজস্ব এক কল্পনার কমিউনিজমের কথা বলেছেন সেখানেও বলেছেন ধনী থাকবে; কেবল সে মাত্র 'ট্রাস্টি' হয়ে থাকবে। এই অযথা আমদানী করা ট্রাস্টি শব্দটি বাদ দিলে দাঁড়ায় এই যে তিনি শ্রেণীবিভেদের স্থায়ীত্বে বিশ্বাসী। আর শ্রেণী বিভেদ থাকলেই নিষ্পেষণের যন্ত্র সৈন্যবাহিনী, পুলিশ প্রভৃতি প্রয়োজন হবে যথা রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে।

এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করব। "রাষ্ট্র তা হলে

এমন কিছু নয় যা চিরন্তন আছে। এমন সমাজ থেকেছে যাদের এই জিনিস প্রয়োজন হয়নি। তাদের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও ধ্যান ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের এক পর্যায়ে এর উদ্ভব। সমাজ তখন শ্রেণী বিভক্ত হয়েছে। সমাজের এইরূপ বিকাশের পর্য্যায়ের সঙ্গেই রাষ্ট্রের আবশ্যিক সংশ্লিষ্টতা ভাবেই প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল।......উৎপাদনের উন্নয়নের এমন এক পর্যায়ে আমরা দ্রুত গিয়ে পৌঁছাচ্ছি যেখানে এই সব শ্রেণীগুলির আবশ্যিকতা থাকবে না। শুধু তাই নয়। তখন এই শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব উৎপাদনের পক্ষে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবে। যেমন আবশ্যিকভাবে তাদের এক দিন উদ্ভব হয়েছিল, তেমনই আবশ্যিকভাবেই তাদের পতন ঘটবে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও পতন হবে। এমন একটা সমাজ হবে যে-সমাজ উৎপাদকদের স্বাধীন এবং সমান সম্মেলনের ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করবে। সে-সমাজ তখন রাষ্ট্র-যন্ত্রটি সেই স্থানেই রাখবে যেখানে তার তখন স্বাভাবিক স্থান। চরখা এবং ব্রঞ্জের কুড়ালের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের যাদুঘরে থাকবে তার স্থান! ..."
(এঙ্গেলস্ : "পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি", ১৮৮৪)

এই প্রসঙ্গে আমরা দেখব শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব উৎপাদনে বিঘ্ন ভাবা তো দূরের কথা গান্ধীজী সে-অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন মনে করতেন। তাঁর সোভিয়েত প্রীতি এবং নৈরাজ্যে বিশ্বাস বলে যা প্রচারিত হয়ে থাকে তা ভ্রান্তি মূলক, এ কথা আমরা সহজেই বুঝছি।

শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী

এখন শ্রেণী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দেখা যাক। এখানে অল্প কয়েকটি উদ্ধৃতিই উপস্থিত করছি।

"যাদের জমি আছে তাদের নিশ্চিন্ত করে দিতে হবে যে তাদের বিরুদ্ধে কখনোই শক্তি প্রয়োগ করা হবে না" (হরিজন ২০-৪-৪০)। (তবে পুলিশ কার বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যে! যারা বেনাম জমি উদ্ধার করবে তাদের বিরোধিতার জন্যে?) "কংগ্রেসের পক্ষে জমিদারের সম্পত্তি নেবার কোনও ইচ্ছা নেই" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ৮-১০-৩১)। চাষীরা মজুরী বাড়াবার জন্য কাজ করতে পারে এটা মেনেছেন কিন্তু জমির কথা বলেননি। (হরিজন ৫-১২-৩৬)। লক্ষ্যণীয়, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কোনও প্রস্তাব বা কার্যক্রম নেই।

"সরকার, রাষ্ট্র কিংবা জমিদার প্রভৃতি অন্যদের উপর দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। তারা নিশ্চয়ই আমাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী, কিন্তু আমরা নিজেরাও দায়ী" (হরিজন, ১১-৫-৩৫)। দোষ কাদের দেওয়া যাবে? "আমরা (অর্থাৎ কৃষকরা) দায়ী।" তাছাড়া গ্রামের যাঁরা গঠনমূলক কাজ করেছেন তাঁদের অভিমত হিসাবে বলছেন: "যদি গ্রামবাসীদের কোনও মতে বরাবরকার আলস্য পরিহার করাতে পারা যায়, তারা আরামে থাকতে পারে" (হরিজন, ১৪-৯-৩৫)

শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব নিম্নের উদ্ধৃতিতে যথেষ্ট পরিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে শ্রেণীভেদের প্রয়োজনীয়তায় তিনি কিরূপ বিশ্বাস করতেন তাও দেখা যাবে।

"If you were strong in number even if you were a million you would not be able to run a mill. You lack talent to run it. You have not acquired the capacity to run a mill even after twenty years of organised work, nor are you likely to acquire that capacity the next twenty years. If you think you have you do not need a leader to lead you.

"I do wish you may acquire that capacity some day. It is certainly possible for you individually so to train yourselves as to run a mill. In that case the rest of you will be as much slaves as you are today. What I mean is that you as a body could not own a mill in a given number of years.

"If instead of insisting on rights everyone did his duty there will immediately be the rule of order established among mankind. There is no such thing as divine rights of kings to rule and the humble duty of the ryots to pay respectful obedience to their masters. ....it is true that these hereditary inequalities must go, these are harmful to society."

[মর্মার্থ: "তোমরা যদি সংখ্যায় শক্তিশালী হও, এমন কি যদি দশ লক্ষ হও একটা কল (মিল্) চালাতে পারবে না। তোমাদের সে প্রতিভার অভাব! বিশ বৎসরের সংগঠিত কাজ করা সত্ত্বেও তোমরা একটা কল (মিল্) চালাবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারো নি। আগামী বিশ বৎসরেও তা পারবে এমন সম্ভাবনা নেই। তোমরা যদি ভাব তোমাদের তা আছে, তোমাদের পরিচালনা করার জন্য নেতার প্রয়োজন হতো না।

"আমি চাই যে তোমরা সে-ক্ষমতা একদিন অর্জন কর। এ নিশ্চয়ই সম্ভব ব্যক্তিগত ভাবে একজন কিংবা আর একজন এমনভাবে শিক্ষা অর্জন করবে যে মিল্ চালাতে পারবে। সে ক্ষেত্রে তোমরা বাকী সকলে তেমনই গোলাম থাকবে এখন যেমন তোমরা আছ। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই, তোমরা সমষ্টি হিসাবে একটা নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে মিলের মালিক হতে পারবে না।

"যদি অধিকার নিয়ে জেদ করার বদলে প্রত্যেকেই তার কর্তব্য পালন করে যায়. মানবজাতির মধ্যে অবিলম্বে-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। শাসন করার ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার রাজাদের আছে এবং রায়তদের কর্তব্য হচ্ছে নত হয়ে তাদের প্রভুদের নিকট সশ্রদ্ধ বাধ্যতা নিবেদন করা—এ রকম কিছু অবশ্য নেই। এই সব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অসাম্য চলে যাওয়ার এখন সময় হয়েছে। সমাজের পক্ষে এ হচ্ছে ক্ষতিকর।" কিন্তু ঐরূপ কথার অব্যবহিত পরেই তিনি বলছেন "কিন্তু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যারা পদনিষ্পেষিত হলো সেই সব কোটি কোটি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অকুণ্ঠ ও বেপরোয়া জেদাজেদিও সমাজের পক্ষে তেমনই ক্ষতিকর। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ঈশ্বর প্রদত্ত বা অন্যান্য অধিকারের দাবী করে (অর্থাৎ ধনীরা—লেখক) তাদের অ- ক্ষা কোটি কোটি জনগণের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ উপরোক্ত বেপরোয়া ব্যবহার করা হয়।" (হরিজন, ৬ই জুলাই, ১৯৪৭)

লক্ষ্য করার বিষয় অভিজাতদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারকে গান্ধীজী এখানে অস্বীকার করছেন বটে কিন্তু 'ভুঁইফোড়' বুর্জোয়ার অধিকারকে তিনি অচল অনড় এবং অনস্পর্শনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। প্রকারান্তরে তিনি শ্রমিকের নিকট দাবী করেছেন ঐ বুর্জোয়াদের নিকট বাধ্য থাকতে হবে। বুর্জোয়ারা অভিজাতদের নিকট তাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কিন্তু শ্রমিক যদি বুর্জোয়ার নিকট তার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে যায় তা হবে অকুণ্ঠ বেপরোয়াগিরি।

ক্ষমতা হস্তান্তরের মাত্র ৪০ দিন পূর্বে উচ্চারিত ও প্রকাশিত তাঁর এই বক্তব্য শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় দেয়। ১৯৪৬ এর ৬ঠা আগস্ট অর্থাৎ উপরোক্ত বক্তব্য প্রকাশের বৎসর খানেক পূর্বে ধনী ও নির্ধনের যোগ্যতার পরিমাপ ধন থাকা না থাকার উপর স্থির ক'রে তিনি তাদের পৃথক পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন "ধনীদের তত্ত্বাবধায়কের কাজ শেখাতে হবে এবং গরীবদের শেখাতে হবে আত্মনির্ভরশীলতা।" (হরিজন, ৬-৮-৪৬)। প্রসঙ্গতঃ স্কুলেতেই শিক্ষার বিভাগব্যবস্থা করা (যাকে স্ট্রিমভাগ বলে) এবং মার্কিন কায়দায় ম্যানেজমেন্টের কলেজের আবির্ভাব যে বুর্জোয়া চিন্তাধারার কোনও বিচ্ছিন্ন নিদর্শন নয় গান্ধীজীর এই উক্তি থেকে তা বোঝা যায়।

এইরূপ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িকতার সমাধানে কিরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে তাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না তা নয়। মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতাও যথেষ্ট ছিল, যেমন হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারাও ছিল। কিন্তু এও সত্য ১৯৩৭-এ মুসলীম লীগ শাসনে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে তার সাংগঠনিক অস্তিত্ব ছিল দুর্বল। কিছু কংগ্রেস থেকে এসে এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রথম যে-প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ালো সে হচ্ছে কৃষকপ্রজা দল। এই কৃষকপ্রজা দলের উদ্ভব প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে বিক্ষোভকে অবলম্বন করে। প্রজাস্বত্ব আইনের ও প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসড়া অবলম্বন করে। এই দুইটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই বাংলার জমীদাররা উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁদের প্রভাবে স্বরাজদল তথা কংগ্রেসদলও প্রজাস্বার্থের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সক্রিয় হলেন। বাংলা দেশে তখন গরীব প্রজাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান অনুপাত প্রায় সমান সমান। জনসংখ্যার গুরুত্বে মুসলমান অনুপাতে কিছু বেশী হলেও তারতম্য এমন কিছু নয়। কিন্তু জমীদারদের মধ্যে মুসলমানের অনুপাত ছিল নগণ্য। শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিহত করার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে তীব্র করা হলো। তখন প্রাথমিক শিক্ষা বিলের এবং প্রজাস্বত্ব বিলের পক্ষাপক্ষকে সাম্প্রদায়িক ভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হলো। যদিচ ডাঃ নরেশ সেন গুপ্ত, অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী, আচার্য পি. সি. রায় প্রমুখ গণ্যমান্য হিন্দু প্রজাদের পক্ষে ছিলেন, তবু স্বরাজ দল এবং তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির প্রচার ও আন্দোলনের ফলে এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্ররোচকদের বক্তৃতা ভাষণাদির দ্বারা বিষয়টি সাম্প্র-

দায়িক রূপ নিল। বিক্ষোভের ফলে যে-সংগঠনের আবির্ভাব হলো তা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়—তা হলো কৃষকপ্রজা দল।

এও স্মরণে রাখতে হবে যে কৃষক প্রজা দলের নেতৃত্বে ছিলেন অনেক প্রবীণ রাজনীতিক। বাংলা দেশে জমীদারী নিপীড়ন নতুন সমস্যা নয়। সুতরাং ইতঃপূর্বে এইসব মধ্যবিত্ত নেতারা কৃষক সংগঠন করেননি কেন? অনুপ্রেরণা এলো কোথা থেকে। সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে গ্রেপ্তার ইত্যাদির ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার হতে পারেনি। কিন্তু ১৯২০ দশকের গোড়াতেই ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রভাব, কমিউনিস্টদের আন্দোলন, কমিউনিস্ট উদ্যোগে সম্মেলনাদির অনুষ্ঠান ইত্যাদির ফলে বাংলা দেশে কৃষক এবং তার সঙ্গে সহানুভূতিশীল মধ্যবিত্তের মধ্যে উক্ত আন্দোলন অনুষ্ঠানাদির উদ্যোগীগণ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ উপরোক্ত খসড়া বিল দু'টির উদ্ভবের পরোক্ষ কারণও তাই। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রমুখের বার বার গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী হওয়ার ফলে এবং কমিউনিস্ট সক্রিয়তার সাম্রাজ্য-বাদের এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সঞ্চারিত আলোড়নকে কাজে লাগাবার সুযোগ সহজেই উপরোক্ত মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা দলের নামে নির্বাচিত হয়ে এসেও এঁরা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, পুনর্নির্বাচনে না গিয়েই মুসলীম লীগ দলে যোগদান ক'রে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন।

এইরূপ শ্রেণীবিক্ষোভের রূপ যে সাম্প্রদায়িক রূপ নিতে পারলো এর প্রধান কারণ বাংলা দেশে কংগ্রেস ও স্বরাজদলের নেতৃবৃন্দের মুষ্টিমেয় জমীদার শ্রেণীর পক্ষপাতিত্বে এবং কৃষকের বিরুদ্ধে গৃহীত বিশেষ ভূমিকা। গান্ধীজীর অনুগামীরা এই গ্লানি থেকে মুক্ত নয়। বরং এক হিসাবে বেশী দায়ী।

প্রসঙ্গতঃ দেশবন্ধু যে হিন্দু-মুসলিম চুক্তি জোর করে গিলিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে ঐ নেতৃবৃন্দ তাকেও কবর দিতে দেরী করেনি। ঐ চুক্তি অবশ্য বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে সীমিত। কিন্তু এও সত্য যে যদি কিছুকাল সাম্প্রদায়িক বিভেদের অপচেষ্টা প্রতিহত করা যেতো তাহলে ইতিমধ্যে শ্রেণী-সচেতনতা প্রসারের অবসরের সুযোগ হতো। বাংলা দেশের সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের প্রসার ও ব্যাপ্তির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদ চেষ্টার সার্থক প্রতিরোধ করার একটা সুযোগ থাকতেও পারতো। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রবল আক্রমণ ও সুচতুর ভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা অন্যদিকে

এই ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর সহায়তা ঐ শুভ অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। বস্তুতঃ বাংলা দেশের কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছাও ছিল তাই। দেশভাগের সময় বাংলাদেশকে যুক্ত ও স্বতন্ত্র রাখার শেষ চেষ্টার বিফল পরিণতির কথা ঐ ব্যাপারে পরিষ্কার করে দেয়। প্রভাব সম্পন্ন একটি সংখ্যালঘু কংগ্রেস দল এবং অনুরূপ সংখ্যালঘু মুসলীম লীগ দল এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল। গান্ধীজী শুধু সম্মতি নয়, আশীর্বাদও দিয়েছিলেন। মুসলীম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরোধিতাতো ছিলই। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বাংলা দেশের কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, যার মধ্যে গান্ধীজীর খাস অনুগামীদেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। যাঁরা সেদিন নেহরু-শ্যামাপ্রসাদ-লিয়াকত আলীর সঙ্গে এক হয়ে বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার বিশেষ আগ্রহ দেখালেন এবং আজও পশ্চিমবাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারের বলি করতে চান এঁরা কোন্ মুখে পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন নিয়ে লাফালাফি করেন? বুর্জোয়া ভণ্ডামির সীমা নেই। বলা বাহুল্য আমি এখানে যুক্তির কথা বলছি। নচেৎ বাঙলা দেশের সংগ্রামে তাঁদের সমর্থনকে স্বাগত জানানোরই কথা।

সমসাময়িক অবস্থায় গান্ধীবাদ

গান্ধীবাদের প্রভাব এখনও যে যথেষ্ট বজায় রয়েছে কংগ্রেসের খণ্ডিত দুই দলের নির্বাচনের প্রতীক চিহ্নই তা দেখিয়ে দিচ্ছে। একদলের প্রতীক চিহ্ন চরখা, অন্যদলের গরুবাছুর। তা ছাড়া গান্ধীবাদের প্রধান মর্মই তো হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা এবং শ্রেণী সহযোগিতা। সুতরাং তত্ত্ব হিসাবে সমাজের চিন্তাধারার উপরকাঠামো (সুপার ষ্ট্রাকচার) হিসাবে গান্ধীবাদ যখন একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে নিয়েছে তখন বুর্জোয়া জমীদার শ্রেণীর মুখপাত্ররা তার সুযোগ গ্রহণ করে যাবেই। গান্ধীজীর নাম ক'বার নেওয়া হয় সেটা বড় কথা নয়। বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, আচরন, কমিউনিস্ট বিরোধী বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা—এ সবের মধ্যেই দেখা যাবে গান্ধীজীর এক কিংবা আর এক তত্ত্বের অভিব্যক্তি। তাঁদের সম্প্রতিতম সহযোগী, যাঁরা উগ্রপন্থী বলে পরিচিত তাঁদের আচরণেও একই প্রভাব লক্ষিত হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের উপর তাদের আক্রমণ। এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন, সংস্কৃতির উপর শোষক শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণের মধ্যে তার বিস্তার করতে

হবে। অন্যদিকে গান্ধীজী বলেছিলেন অক্ষর পরিচয় করিয়ে কি হবে? বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে কি হবে? তাঁরই কথা প্রতিধ্বনিত করে এখন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গরীব মধ্যবিত্ত, কৃষক শ্রমিকের ছেলে মেয়ে যাতে সংস্কৃতির জগতে আর প্রবেশ করতে না পারে এ হলো তারই সক্রিয় উদ্যোগ।

সুতরাং আজও গান্ধীবাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এখনও তার মূল গাঁথুনী (শ্রেণী সহযোগিতা) ভেঙ্গে শেষ করতে বাকী আছে। এই শ্রেণী-সহযোগিতার অন্যতম প্রধান ধারক হয়েছে আজ দক্ষিণপন্থী জাল কমিউনিস্টরা। তাতেই তাদের কণ্ঠে গান্ধীবাদের উচ্ছ্বাস এত বেশী। শাসকশ্রেণীর অনুগ্রহের আসরে সামান্য একটু ঠাঁই সংগ্রহের কী ব্যাকুল আগ্রহ! তাই তাদের গান্ধীবাদের সঙ্কীর্তন এত সরব। অনুগ্রহদাতাদের স্মিত হাস্য এদের পুরস্কার।

শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তারা পাচ্ছে তাদের যা প্রাপ্য—স্বতঃ উত্থিত ঘৃণা ও অবজ্ঞা।

দেশহিতৈষী, ছাত্র-সংগ্রাম ও পর্য্যবেক্ষক পত্রিকার সম্পাদক এবং নন্দন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী ও পরিচালকগণ তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

পাঠকগণের কিছু কাজে আসে এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য যদি আংশিক ভাবেও সার্থই হয় তা হলে কৃতার্থ বোধ করব। এর বেশী বলার কিছু নেই।

অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুলত্রুটি ঘটে থাকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

গান্ধীজী ও তাঁর অহিংসা

"প্রশ্ন—স্কুলের ছেলেদের চাবুক মারার ব্যাপারে আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সব বড় ছয়জন বালককে চাবকাতে হবে ?

উত্তর—হ্যাঁ, সাধারণভাবে বলতে গেলে তাই।

প্রশ্ন—তা হ'লে তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ শুধু এই যে তারা সব চেয়ে বয়সে বড় ?

উত্তর—অবশ্যই।

প্রশ্ন—যেহেতু তারা বড় শুধু সেই জন্যই চাবুক খেতে হলো ?

উত্তর—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—আপনি কি মনে করেন এরূপ করা ন্যায়সঙ্গত ?

উত্তর—পরিস্থিতি যা ছিল তাই মনে করেছিলাম এবং এখনও তাই মনে করি.... ."

এই হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পর নৃশংস ও হৃদয়হীন উৎপীড়নের ব্যাপারে তদন্তের সময় সেই উৎপীড়নের একজন প্রধান পরিচালক ইউরোপিয়ান মিলিটারি অফিসারের নিজের সাক্ষ্য।

[উপরের উদ্ধৃতি হাণ্টার কমিটির কার্যবিবরণী থেকে নেওয়া। হাণ্টার কমিটি সরকারের নিযুক্ত কমিটি—যা পাঞ্জাবে ইংরাজের কীর্তিকলাপকে তদন্তের নামে ঢাকা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল।]

১লা মে, ১৯১৯ সালে ২৪ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত কাসুর শহরের সমস্ত নাগরিক, প্রতিটি নারী-পুরুষ-শিশুকে রেল স্টেশনে হাজির করা হয়েছিল টি, আই, প্যারেডের জন্য। তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো মাথা নত রাখতে হবে, পুরুষদের পাগড়ি বা মেয়েদের দোপাট্টাও মাথায় দেওয়া চলবে না। পাঞ্জাবের মতো গরম জায়গায় বৈশাখের খর রৌদ্রে এই অবস্থায় এই বিপুল সংখ্যক আবালবৃদ্ধবনিতাকে বেলা ৪টা পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল; খাওয়া তো দূরের কথা, তৃষ্ণাকাতর মানুষদের ও ছোট ছোট শিশুদেরও জল পর্যন্ত পান করতে দেওয়া হয়নি। একজন মূক সহ দু'জন মানুষকে কেবল খেলার মতো গুলি করে মারা হয়। উপরোক্ত ছেলেদের চাবকানোর ঘটনায় স্কুলের হেডমাস্টারকে প্রথমে বলা হয় ছয়জন ছেলে দিতে। যে ছেলেদের দেওয়া হলো তারা খুবই রোগা। মিলিটারির চাবুক বেশিক্ষণ খেতে পারবে না মনে হলো। তাই নিম্নতম অফিসার মার্সডেনকে বলা হলো তাগড়া তাগড়া বড় বড় ছেলে বেছে আনতে—যাতে অনেকক্ষণ ধরে চাবকানো যায়, আর চাবকানোর মতো বড় পিঠ ও দেহ পাওয়া যায়। এই চাবকানোর পর সেই নিরীহ বালকদের প্রায় মৃত অবস্থায় ফেরৎ দেওয়া হয়। তলবের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি হাজির হলেন না তিনি যেই হোন না কেন শহরে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পুড়িয়ে শেষ ক'রে দেওয়া হলো, বিচার আরম্ভ হবার আগেই ফাঁসির মঞ্চ তৈরী হলো। এইভাবে পাঞ্জাবে তখন ১৮ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আরও হতো—কেবল দেশজোড়া আন্দোলনে ভীত ইংরেজ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবে তখন ঐ রকম এবং ওর চেয়েও নিদারুন অত্যাচার সর্বত্র। কাসুরের উল্লেখ করলাম যে বিশেষ কারণে তা পরে বলবো। গুজরানওয়ালা মহারাজ রণজিৎ সিংজীর জন্মভূমি। এই শহরের উপর বিমান থেকে বোমা বর্ষণ (bombing) করা হলো। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যখন ছুটে চলেছে সে সময় তাদের উপর মেসিনগান থেকে গুলি বর্ষণ করা হলো। গুজরানওয়ালার হিন্দু-মুসলমান নাগরিকের এই বেশি অপরাধ ছিল যে, গুপ্তচর মাধ্যমে এক জায়গায় একটা বাছুর মেরে টাঙানো হয়েছিল এবং আর এক জায়গায় এক মসজিদে শূকর কেটে রাখা হয়েছিল। মতলব ছিল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার। হলো বিপরীত। হিন্দু-মুসলমান নাগরিকরা এই কুৎসিত ষড়যন্ত্র ধরতে পারলো এবং এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রকাশে সমবেত হলো। বোমা আর মেসিনগানের গুলি তারই

শাস্তি! নিজামাবাদে এমনই অত্যাচারের এক নমুনা পাওয়া যায় নীচের বিবরণ থেকে :

মুহম্মদ রমজান বলে একটা ছেলেকে গুলি ক'রে মারলো ব্রিটিশ সৈন্যরা। কারণ, সৈন্যদের তাঁবু যে ময়দানে অবস্থিত এবং তারা নিজেরা যা তাদের সীমানা বলে সিদ্ধান্ত করেছিলো, ছাগল চরাতে চরাতে অজানিতভাবে রমজান তার মধ্যে এসে পড়েছিল। সীমানা তারের বেড়া বা কোনও ইট দ্বারাও চিহ্নিত ছিল না।

আরও কত অত্যাচার চলেছে; যা লিখিত পাওয়া যায় তা এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যা ঘটেছে তার সামান্যই লিখিত বিবরণে আছে. কারণ, গান্ধীজীর চাপে অনেক বিবরণকেই বাদ দিতে হয়েছিল।

জনসাধারণের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর রায়

অথচ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলার জন্য কাসুরের জনসাধারণকে অপরাধী বলে রেকর্ড করতে গান্ধীজী উঠে পড়ে লাগলেন। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ যখন রেল স্টেশনে আসে তখনও দু'জন ইউরোপীয়ানকে নিরাপদে অন্যত্র যেতে দেয়। কিন্তু এক সময় উদ্ধত দু'জন ব্রিটিশ সৈন্য তাদের উপর গুলি চালালে স্বভাবতই ঐ দুজনের উপর প্রতি-আক্রমণ হয় এবং তারা মারা যায়।

কংগ্রেস তদন্ত কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত অন্যান্যেরা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় কমিটির রিপোর্ট লেখার ভার প্রধানতঃ গান্ধীজী ও জয়াকরের উপরে পড়ে। রিপোর্টে ঐ অংশে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের বিরুদ্ধে গান্ধীজী যা লেখেন জয়াকরের তাতে আপত্তি ছিল। জয়াকর সেই মতো আবেদন করলে গান্ধীজী জয়াকরের ঐ "tone down" করার বা নরম করার অনুরোধকে উল্লেখ ক'রে এবং তার বিরোধিতা ক'রে বললেন: "Every word I have written is justified." অর্থাৎ আমি যা লিখেছি তার প্রতি শব্দ ন্যায়সঙ্গত। [জয়াকরের লেখা পত্র, ৩০শে মে, ১৯২০]। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর চাপে কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে লেখা হলো : we cannot too strongly condemn excess, Drunk with blood of their

innocent victims, these rioters proceeded to the revenue offices and burnt them." জালিয়ানওয়ালাবাগে যারা হত্যা করলো, এই স্থানেই যারা নিহত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলো—গান্ধীজীর মতে তারাই হলো নির্দোষ। আর যত অপরাধ জনসাধারণের।

জনসাধারণের ক্রোধ এই রেভিনিউ অফিসগুলির উপর কেন? খাজনা ও বাজে আদায়-অনাচার ছাড়া এই রেভিনিউ অফিসগুলির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহতি পূর্বে বৃটিশ প্রতাপ রক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা হতো। তাও কি স্বেচ্ছায় যোগদানের ভিত্তিতে? মোটেই নয়। ইংরাজের রূঢ় অত্যাচার ও ঔদ্ধত্যের উপর কোমল আবরণ ও মোহ সৃষ্টির ভার ছিল কংগ্রেসের বুর্জোয়া জমিদার নেতাদের উপর। অহিংসার প্রচারক গান্ধীজী তখন ইংরাজের পক্ষে কামানের খোরাক হবার জন্য এবং জার্মানি, তুর্কী প্রভৃতি অন্য দেশের সাধারণ মানুষের বুকে গুলি বসাবার জন্য ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ প্রচারে নিযুক্ত। [ট্রেণ্ডুলকারও তাঁর গান্ধী গ্রন্থাবলীতে এই অংশের শিরোনামা দিয়েছেন: "রিক্রুটিং সার্জেন্ট"]। মিসেস বেসান্তের পত্রিকায় সৈন্য সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু না থাকায় ব্যথিত হয়ে গান্ধীজী লিখছেন, "আপনার পত্রিকায় সৈন্য সংগ্রহে রিক্রুট হবার আবেদন বৃথাই খুঁজছি।" জিন্না প্রথমে এই ব্যাপারে যোগ দেননি, পরে অন্যান্য নেতাদের চাপে যোগ দেন। [জওহরলালকে লেখা বি, জি, হর্নিম্যানের ১৯১৭ সালের ১লা জুলাইয়ের পত্র—'এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স', জ. নেহরু দ্রষ্টব্য]। তাঁকে গান্ধীজী লিখলেন "What I ask for is an emphatic declaration, not a halting one." অর্থাৎ আমি যা চাচ্ছি তা হলো সজোর কণ্ঠের ঘোষণা। কোনও আধো আধো বলা আমি চাচ্ছি না। [প্রসঙ্গতঃ হর্নিমান লিখছেন, জিন্নাকে পরে আবার অসহযোগ আন্দোলনের সময় বয়কট করানোতে রাজী করা যাচ্ছিল না]। গুজরাটের খেদা জেলায় গান্ধীজী আবেদন করলেন, গ্রাম পিছু ২০ জন ক'রে রিক্রুট করতে হবে। যখন লেনিন বলছেন, এক দেশের শ্রমিক-কৃষক আর এক দেশের শ্রমিক-কৃষকের বুকে গুলি করবে না, তখন গান্ধীজী ইংরাজের স্বার্থে প্রতিপক্ষের কামানের খোরাক হওয়ার জন্য ও ভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষকে হত্যা করার জন্য ভারতীয় শ্রমিক-কৃষকের ছেলেকে যুদ্ধের মুখে পাঠাতে উঠে পড়ে আন্দোলন শুরু করলেন। ভারতীয় বুর্জোয়াদের আশা ছিল, তারা সদয় ইংরাজের অনুগ্রহ

শান্ত করবে। স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদানের ভিত্তিতে সৈন্য সংগ্রহের পাতলা পর্দাও ছিন্ন হয়ে গেল যখন ১৯১৮ সালের ৪ঠা মে দিল্লীতে এক সভায় পাঞ্জাবের লাট মাইকেল ও ডায়ার এবং কর্ণেল পপহাম ইয়ং এক প্রকাশ্য বক্তৃতায় স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক সংগ্রহের ভান সম্পূর্ণভাবে পরিহার করলেন। নেতারা কিন্তু তখনও রিক্রুটের বক্তৃতা করে চলেছেন এবং মাইকেল ও ডায়ার কর্তৃক অত্যাচার ও নিপীড়নে বাধ্য ক'রে সৈন্য সংগ্রহ ব্যবস্থার আবরণ বজায় রেখে যাচ্ছিলেন।

ফলে পাঞ্জাবে অবাধভাবে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চললো। গান্ধীজী সহ অন্যান্য নেতাদের বক্তৃতা ও আবেদন ঐ অত্যাচার ও নিপীড়ন আরও সহজ ক'রে দিয়েছিল। আর গান্ধীজীই এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী উদ্যোগ ও অধ্যাবসায় নিয়েছেন। জোর ক'রে বাধ্য ক'রে পাঞ্জাবের গ্রাম গ্রামান্তর থেকে কৃষকের ছেলেকে সৈন্য ক'রে পাঠাচ্ছিলো উপরোক্ত পাঞ্জাবের লাট মাইকেল ও ডায়ার। তার কিছু বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক।

স্মরণে রাখতে হবে ইংরাজের তখন অবস্থা কাহিল। তুর্কি প্রায় ঘায়েল হলেও এবং প্যালেস্টাইন ইত্যাদি ইংরাজের দখলে এলেও ইংরাজকে তারা ভালো ক'রে জখম করতে সমর্থ হয়েছিল। এখানে ইংরাজ শুধু রক্ষা পেয়েছিল প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার কৌশলে। তুর্কি সাম্রাজ্যের দখল থেকে আরবরা স্বাধীন হবে এবং ইংরাজরা তাদের সাহায্যের প্রতিদানে তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করবে—এই প্রতারণার চুক্তি দিয়ে ইংরাজরা আরবদের সাহায্য পেল তুর্কি বাহিনীকে পরাস্ত করতে। তা ছাড়া শত্রুপক্ষের কামানের খোরাক হিসাবে বিরতিহীনভাবে তারা ঔপনিবেশিক সৈন্য, বিশেষ ক'রে ভারতীয় সৈন্য পরিবেশন করলো। কিন্তু আসল জায়গায়, ফ্ল্যাণ্ডার্স ও ফ্রান্সে তখন ইংরাজের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। ১৯১৮-র মার্চের শেষে Le Fere এবং Vimyতে জার্মানরা ব্রিটিশ ফার্স্ট লাইন পরাজিত করে সম্পূর্ণ ঘিরে নিলো ও তাদের বন্দী করলো এবং ব্রিটিশ পক্ষে চললো বিরাট পশ্চাদপসরণ। ওদিকে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর তুর্কি-ইরান সীমান্ত ঘিরে ইংরাজের যেমন তৎপরতা তেমনি আতঙ্ক। সমস্ত ফ্রণ্টেই, যেমন জার্মানী আর তার মিত্রদল, তেমনই ইংরাজ, ফরাসী আর তাদের মিত্রদল, উভয় পক্ষের সমস্ত জাতির সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে রুশ বিপ্লবের উদ্দীপিত চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হয়েছে। উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের হয়ে, ধনীদের হয়ে কেন

আমরা লড়বো—কমিউনিস্টদের এই বাণী ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরাজের আতঙ্ক কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরাজ জানতো, ভারতেই তার দুর্বলতা সব চেয়ে বেশী, আর বুর্জোয়া নেতা গান্ধী-জিন্না-মালবির প্রমুখের সাহায্যে ভারতেই সৈন্য সংগ্রহের সম্ভাবনা বেশী। শত্রুপক্ষের উপর্যুপরি আঘাতে বিরাট ক্ষয় ক্ষতির দরুণ সৈন্যের প্রয়োজনও আবার বেশি। ওদিকে রুশ বিপ্লবের ফলে চাঞ্চল্য ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। তাই ভারতে ঐরূপ বিপ্লবের কোনও সংস্করণ যাতে না হয় তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে ইংরাজ ভারতের বুকে সামান্যতম অসন্তোষের বিরুদ্ধে নিষ্পেষণের রোলার চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং রুশ বিপ্লবের মাসাধিক কালের মধ্যেই, ১৯১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তদন্তের জন্য কমিটি নিয়োগ করলো। সে কমিটির নাম রাওলাট কমিটি।

সঙ্গে সঙ্গে চললো পাঞ্জাবে সৈন্য সংগ্রহের স্টীমরোলার। এদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াকে শাসন সংস্কারের লোভ দেখিয়ে দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজে লাগানো হলো। [মণ্টেগুর ঘোষণা, ২০শে আগস্ট, ১৯১৭]। কেমন ক'রে 'অহিংস' নেতাদের সৈন্য সংগ্রহের আবেদনের আড়ালে সৈন্য সংগ্রহ হচ্ছিলো তার কিছু বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক। গুজরানওয়ালার কথা উপরে বলা হয়েছে, সেখানকারই দৃষ্টান্ত ধরা যাক। মাইকেল ও ডায়ারের নিজের হিসাবেই দেখা গেল যে-আগস্টে মণ্টেগু-র ঘোষণা বের হলো তার থেকে এক বৎসরের মধ্যে, প্রারম্ভে যেখানে প্রতি জেলার মোট জনসংখ্যার প্রতি ১৫০ জন পুরুষে ১ জন ক'রে রিক্রুট ছিল, বৎসর শেষে সেটা দাঁড়ালো প্রতি ৪৪ জন পুরুষে ১ জন। মাইকেল ও ডায়ারের ভাষায় A triumph of organisation—সংগঠন শক্তির চরম জয়। সংগঠনটি কি রকম? তহশিলদার (রেভিনিউ অফিসের কর্মচারী) রাত্রে গ্রামে ঘোষণা করলো সবাইকে সকালে গ্রামের কেন্দ্রে জমা হতে হবে। সময়টা ফসল কাটা-ঝাড়া-তোলার সময়। তা ছাড়া বাধ্যতামূলক রিক্রুট করার ভয় ছিল। জমা হলো কম লোক। ৬০-৭০ জনকে ১৬শ' টাকা জরিমানা হলো। পরদিন ১৮ মাইল দূরে সকলকে হাজির হতে বাধ্য করা হলো এবং সেখানে জোর করে রিক্রুট বেছে নেওয়া হলো (পরে কংগ্রেস তদন্ত কমিটির কাছে ব্যারিস্টার লাভ সিং এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)। লাম্বারদারদের বলা হলো, রিক্রুট না দিলে তাদের লাম্বারদারি অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। পুলিশ জোর করে শান্তিভঙ্গের

অজুহাতে মানুষকে গ্রেপ্তার করে এবং ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দেয় শুধু রিক্রুট হলে। (উপরোক্ত কমিটিতে লায়ালপুরের উকিল শান্ত সিং এর সাক্ষ্য)। মুজফফরগড় জেলায় ব্রিটিশ জেলা জজও নিপীড়নমূলক রিক্রুট করার বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে বাধ্য হন। সাহাপুর জেলার নাদির হোসেন তহশিলদারের নির্যাতন অসহনীয় হলে উৎপীড়িত কৃষকেরা তহশীলদারকে হত্যা করে। এই তহশীলদারের বিরুদ্ধে রিক্রুট সংগ্রহের জন্য নারী নির্যাতন, মেয়েদের সামনে উলঙ্গ ক'রে পুরুষদের অপমান করা, মানুষকে কাঁটা দিয়ে চেপে বাঁধা, ফসলের মাঠে গরু মোষ নামিয়ে খাইয়ে দেওয়া—এই রকম নানারূপ নিদারুণ নিপীড়নের কাহিনী খুনের মামলায় প্রকাশ হয়।

কংগ্রেস তদন্ত কমিটির আবার এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ঘোষণা আছে। We have collected some evidence of a direct nature which being of a serious character we have refrained from publishing, Mr. Gandhi who is responsible for that collection has placed himself in communication with the Punjab Govt." সোজা কোথায় গান্ধীজীর কাছে জনসাধারণ কর্তৃক সমর্পিত সাক্ষ্য তিনি তদন্ত কমিটিকে প্রকাশ করতে দিলেন না কারণ সেগুলি সিরিয়াস। কাসুরে জনসাধারণের বিরুদ্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ গান্ধীজী তদন্ত কমিটিকে লিপিবদ্ধ করতে চাপ দিয়েছিলেন। এর উল্লেখ পূর্বে করেছি। তার তুলনায় এখানে গান্ধীজীর ইংরাজের প্রতি সদয় আচরণ উল্লেখযোগ্য।

এখানে এই সূত্রে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা উচিত। গান্ধীজী জয়াকরকে এক পত্রে (তারিখ ১১ই মার্চ, ১৯২০) জানান, একটি 'তথ্যের' পক্ষে প্রাইমাফেসি সাক্ষ্য তাঁর সন্তোষজনক নয় বলে তিনি কংগ্রেসের তদন্ত রিপোর্টে তা দিতে চান না। গান্ধীজীর এই আপত্তি সম্বন্ধে জয়াকর লিখে গেছেন: "ডায়ার জনসাধারণকে উচিত মতো সাজা দিবে এই উদ্দেশ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে তাদের ঢোকানোর জন্য ফাঁদ পেতেছিল—এরূপ বলার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে কিনা—গান্ধীজীর উক্তি ঐ প্রশ্নের সম্পর্কে। মতিলাল (নেহরু), চিত্তরঞ্জন (দাস) এবং আমার মত ছিল যে রিপোর্টে এই বিষয় উল্লেখ করার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। গান্ধীজী অত্যন্ত সজোরে (violenty) আমাদের মতের বিরোধিতা করলেন।" ("দি স্টোরি অব মাই লাইফ"—এম. আর. জয়াকর, ১ম ভলিউম, পৃষ্ঠা ৩৩২)।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সবাই দেশবন্ধু, মতিলাল নেহরু ও জয়াকরের সঙ্গে যে একমত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। এতেও দেখা গেল ইংরাজের বিরুদ্ধে আসল সত্য ঘটনা প্রকাশিত না হওয়ার জন্য গান্ধীজীর কেমন আগ্রহ।

গান্ধীজীর এই আগ্রহের কারণও তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন। কারণ হচ্ছে to check hatred—ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতির ঘৃণা ও অসন্তোষকে চেক করা। এই জন্য তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারে অন্য কর্মপন্থা না নিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে মনোযোগ দিতে বলেছিলেন। তিনি বললেন:

"The best way of checking hatred, therefore, is to teach the nation to isolate the memory of the dead which is a sacred trust, from the 'frightfulness' which should be forgiven even if it cannot be forgotten" (The Bombay Chronicle, 12-4-1920)

মর্মার্থ:—ঘৃণাকে চেক করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো মৃতের স্মৃতি বা পবিত্রতাকে ঐ দৃশ্যের বীভৎসতা থেকে আলাদা করে। শেষোক্তকে যদি ভোলা নাও যায় অন্ততঃ ক্ষমা করতে হবে।

এইরূপে বিষয়ান্তরে দেশের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মনে আঘাত দিয়েছিল। তিনি লিখলেন: "পীড়ন যতই কঠিন হউক সহিব, কিন্তু অবমাননা কিছুতেই সহিব না, পাঞ্জাবে এইরূপ পৌরুষের বাণী শুনিব আশা করিয়াছিলাম।" (পাঞ্জাবে অবশ্য সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও প্রত্যাগত সৈনিকের অনেক বীরত্বের কাহিনী ছিল। বুর্জোয়া নেতারা তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তখন তা সব অবহিত ছিলেন না। তিনি নেতাদের ক্রিয়াকাণ্ড উল্লেখ করেছেন)। "কিন্তু যখন তাহা শুনিলাম না তখন সর্বাগ্রে আপনাদিগকেই ধিক্কার দিতে হইবে। এই কারণেই আমরা বলি, কোনো চিহ্নের দ্বারা পাঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নয়। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, কাপুরুষতা নৈব নৈব চ। নিরস্ত্র, নিঃসহায়ের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষতা, সেই অত্যাচার দীনভাবে গ্রহণ করাও কাপুরুষতা, কেন না কর্তব্যের গৌরবে বুক পাতিয়া অস্ত্র গ্রহণ করায়, মাথা তুলিয়া দুঃখ স্বীকার করায় পরাভব নাই। যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনও পক্ষেই বীর্যের পরিচয় নাই,

সেখানে কোন্ কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিব?" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৭; এপ্রিল-মে, ১৯২০)

সত্যের প্রতি আগ্রহই যদি গান্ধীজীর প্রধান নীতি হবে তাহলে বৃটিশ গর্ভনমেণ্টের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রকাশ করা এবং বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের নিন্দাবাদ ক'রে মত প্রকাশ করা—দুই ক্ষেত্রে দুই বিপরীত বিচার কেন? গান্ধীজীর ভক্ত শিষ্যরা এর অনেক রহস্যময় অর্থ করতে পারেন। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণ অর্থই বুঝবো। এর পর গান্ধীজী মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু এবং অন্যান্যদের বিলাতে পাঞ্জাবের ব্যাপার নিয়ে ডেপুটেশনে পাঠাতে কেন রাজি ছিলেন না তা সহজেই বোধ্য। যদিও বা বুঝতে কিছু বাকি থাকতো, তাঁর নিম্নের উদ্ধৃতিতে তা আরও পরিষ্কার হয়:

"I am totally against a spectacular display in the shape of sending a big deputation, it can only irritate the authorities. [আমি একটা হৈ-চৈ করা ডেপুটেশন চাই না—এতে কর্তৃপক্ষের বিরক্তি উৎপাদন করবে]"। এই উক্তির মধ্যে বড় রহস্যের স্থান কোথায়? কর্তৃপক্ষের সুনজরের আশায় প্রতীক্ষমান ভীতি-কাতর যে কোনও অনুগ্রহ প্রার্থীও তো এইরূপ বিচক্ষণতা ও সতর্কতার দ্বারাই চালিত হয়। পার্থক্যটা কোথায়? গান্ধীজীর বক্তব্যগুলি ও আচরণ [যেমন মালবিয়জী ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎ] সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে মতিলাল নেহরু পুত্র জওহরলালকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২০তে লিখেছিলেন, "কর্তৃপক্ষের কিংবা নরমপন্থীদের সঙ্গে সমঝওতা করা কোনরূপ প্রচেষ্টা যে পক্ষই করুক তার উপর ভয়াবহ ফল বর্তাবে। বর্তমান পরিস্থিতির আমার এই রকমই বিশ্লেষণ।" [এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স—জওহরলাল নেহরু, পৃষ্ঠা ৬]। বলা বাহুল্য, মতিলাল বা দেশবন্ধু যে গান্ধী অপেক্ষা বেশী বিপ্লবী ছিলেন তা নয়; তাঁরা তো শুধু গঠনতান্ত্রিক বিরোধিতার পক্ষে ছিলেন।

উপাধি-বর্জন ও গান্ধীজী

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উপাধি-বর্জন সম্বন্ধে গান্ধীজী ও মতিলালসহ অন্যান্য নেতাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে শ্রীঅমল হোম উপাধি-বর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথের

প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রে এক প্রস্তাব পাশ করানোর চেষ্টা করেন। তাঁর সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রস্তাব উত্থাপিত হতেই দেওয়া হয়নি। (শ্রীঅমল হোমের 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য)। একি সূত্রহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা? মোটেই নয়। অনেক দিন পর্যন্ত গান্ধীজী নিজের লেখা ও ভাষণে ঐ উপাধি বর্জনকে স্বীকৃতি দেননি। বারবার বলেছেন, "স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" ১৯১৯ সালের ২রা জুন রবীন্দ্রনাথের উপাধি-বর্জন ও বড়লাটকে লিখিত তৎসংক্রান্ত পত্র প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯২০ সালেও 'নবজীবন' পত্রিকায় ১৮ই এপ্রিল এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে ১৭ই মার্চ ও ২৮শে এপ্রিল দেখা যাচ্ছে তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্যার রবীন্দ্রনাথ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯২৫-এও তাঁকে এইভাবে "স্যার রবীন্দ্রনাথ" লিখতে দেখা যায়। অবশ্য ইতোমধ্যে তিনি "দি পোয়েট' বলতে শুরু করেছিলেন। এর পর এই সূত্রে যদি গান্ধীজীর লিখিত উপরে উল্লেখিত পত্রের উদ্ধৃত অংশ "it can only irritate the authorities" পুনরায় স্মরণ করা হয়, তাতে কি দোষ হয়? ১৭ই মার্চ যিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় লেখেন, "স্যার রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর উপাধি বর্জন করেন তা সত্যাগ্রহী হিসাবে করেননি"—এ কথা বলার কারণ একমাত্র হতে পারে এই যে, তিনি ঐ উপাধি-বর্জন অনুমোদন করেননি। ১৯৪৪ সালে গান্ধীজীর ৭৫ বৎসর বয়সের জন্মদিবস পালন উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থের ক্রনোলজী তথা বর্ষপঞ্জীতে আগস্ট ১৯২০ তারিখে উল্লেখ ক'রে বলা হয়, গান্ধীজী ১লা আগস্ট ১৯২০-তে যুদ্ধের ইংরাজকে সাহায্য করার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে প্রদত্ত কায়সার-ই-হিন্দ গোল্ড মেডাল ও বোয়ার যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুরূপ সাহায্যের জন্য প্রদত্ত মেডাল ফেরৎ দেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপাধি ফেরৎ দেন। শ্রীঅমল হোম তার 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন: "অর্থাৎ কিনা গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ একই দিনে তাঁদের সরকারী শিরোপা ত্যাগ করেছিলেন— ১৯২০, ১লা আগস্ট, ইতিহাসের বিকৃতি এমনি ক'রেই হয়।" তাঁর মন্তব্য সমর্থন করে তাঁর এবং সহৃদয় পাঠকগণের আর একটি অনুরূপ উদ্ধৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: "On June 3, 1915 in the king Emperor's birthday honours list two great names figured, Tagore was knighted and Gandhi got the kaisar-i-hind goldmedal for his services to the British Empire. Both decorations happily for.

Indian selfrespect were later returned, [Gandhiji, a study, by Hiren Mukherjee, page 35-36] শেষোক্ত এই উক্তির উপরও কি অমল হোমের উপরোক্ত মন্তব্য আরোপ করা যায় না? বরং বেশী কিছু বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের উপাধি প্রাপ্তির কারণ ইংরাজের সেবা করার জন্য নয়, দেশের মানুষকে ইংরাজের স্বার্থে ভিন্ন দেশের মানুষকে হত্যা করায় প্ররোচিত করার জন্যও নয়। তাছাড়া পাঞ্জাবে ও জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহত দেশবাসী এবং হননকারী ইংরাজের তুলনায় তাঁর উপাধি-বর্জনপত্রে দেশবাসী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তাহারা কিরূপ 'নিজস্ব ও নিঃসম্বল' অন্তদিকে হননকারীদের 'লোকহনন ব্যবস্থা' কিরূপ নৈপুণ্যশালী"। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে ১৩ মাস পরে তাঁর মেডাল ফেরৎ দেওয়া পত্রে দেশবাসীর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "No doubt the mob excesses were unpardonable"— কোনও সন্দেহ নাই, 'মবের' বাড়াবাড়ি ছিল অমার্জনীয়।

অথচ তাঁর এই 'সত্যের' প্রতি আগ্রহ তত্ত্বটিও ধোপে টেকা মুস্কিল হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কের সময় একবার সি. এফ. এণ্ড্রুজকে লিখিত এক পত্রে (তারিখ ২রা মার্চ, ১৯২১) গান্ধীজী অমৃতসর কংগ্রেসে (১৯১২) পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর 'hearty association'-এর উল্লেখ করে বলেন:

"Nor was there a spirit of bargaining behind it. I did what I held was right without bargaining for reward."

এটা কি সত্য কথা? এর অনেকদিন পর উক্ত কালে গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং রিক্রুট সংগ্রহ অভিযানে লিপ্ত হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন দুইটি কারণ। প্রথম কারণ ইংরাজের প্রতি "Some hearty expression of love" প্রকাশ করা। (ইংরাজের নির্দেশে অন্য দেশের মানুষের বুক গুলিবিদ্ধ ক'রে তার অহিংস প্রকাশ?) আর দ্বিতীয় কারণে তিনি পরিষ্কার ঐ bargaining-টাই স্বীকার করেন। তিনি বলেন: "The other motive was to qualify for Swraj through the good offices of the statesmen of the empire."

(দ্রষ্টব্য: টেণ্ডুলকার, মহাত্মা, ১ম ভলিউম, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৮৫)

আন্দোলন পরিচালনায় গান্ধীজী

গান্ধীজী কিভাবে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তার নিদর্শন হিসাবে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন। মৌলানা মোহম্মদ আলি, শওকত আলি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ায় খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম দুই কারণে: প্রথমত, খিলাফত অন্যায়ের প্রতিকার; দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস নেতৃত্বের দেশের জন্য যা দাবিদাওয়া। ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা ধর্মের নিরিখে এঁরা অপরিহার্য নীতি হিসেবে অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর খিলাফত আন্দোলনের পক্ষ সমর্থনের বদলে আলী ভ্রাতাদের কাছ হতে অহিংসার অপরিহার্যতার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়ে নিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির ভিত্তিতেই খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের মিলিত আন্দোলন। আন্দোলন চলাকালে এক সময় পণ্ডিত মদন মোহন মালবিয় (যাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর সহযোগিতা সম্পর্কে মতিলাল নেহরু পুত্রকে এক পত্রে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—একথা উপরে উল্লিখিত) গান্ধীজীকে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। "বড়লাট এবং গান্ধীজীর মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটলো বড়লাট এবং মালবিয়জীর মধ্যে এক কথোপকথনের ফলে। বিষয় ছিল, ভারতে যে পরিস্থিতি চলছে তার সম্বন্ধে আলোচনা। বড়লাট জানালেন মৌলানা শওকত আলির বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ শুরু হবে, কারণ তিনি হিংসার প্ররোচনাত্মক বক্তৃতা দিয়েছেন। এর থেকে কিরূপ বিশৃঙ্খলাদি ঘটতে পারে, তারও আলোচনা হয়। গান্ধীজীর যদি হিজ একসেলেন্সি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় তা হলে ভালো হয়, মালবিয়জী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪ঠা আগস্ট ১৯২১)। বড়লাট তাতে সম্মতি দেন। মালবিয়জীর সংবাদ পেয়ে গান্ধীজী দেখা করেন। "১৪ই মে (১৯২১) সিমলায় এক সাক্ষাৎকারে বড়লাট আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তৃতার কয়েকটি আপত্তিকর অংশের উপর মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং এমনও ইশারা দিলেন যে, গভর্নমেন্ট তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা (প্রসিকিউশন) শুরু করতে পারেন। গান্ধীজী বড়লাটকে এ বিষয়ে অ্যাকশন কিছু দিন স্থগিত রাখতে বলেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা

(অ্যাপলজি) প্রকাশ (ইস্যু) করিয়ে দেবেন। গান্ধীজী আরও বললেন, বড়লাটকে ঐ ক্ষমা প্রার্থনার খসড়া আগেভাগে দেখিয়ে নেবেন। তাই করা হলো এবং বড়লাট কর্তৃক প্রস্তাবিত কয়েকটি পরিবর্তন করা হলো। বিবৃতিটি অবশেষে আলি ভ্রাতা কর্তৃক ২৯শে মে প্রকাশিত (ইস্যু করা) হলো।" (কলেক্‌টেড ওয়ার্কস্‌ অব এম. কে. গান্ধী, বিংশতিতম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩)। এই বিবৃতি "বোম্বে ক্রনিক্‌ল" পত্রিকায় ৩০শে মে ১৯২৫-এ প্রকাশিত হয়।

মতিলাল নেহরু এ সময় অসুস্থ থাকায় আলমোড়ায় ছিলেন। তিনি এ সব ঘটনার সংবাদ সংবাদপত্রে দেখেন ও গান্ধীজীকে ৩রা জুন, ১৯২১-এ এক পত্র দেন। এই পত্রে গান্ধীজীর নতি স্বীকার এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্ষমা প্রার্থনা সরবরাহ করার সমালোচনা আছে বলে এর বিস্তৃত অংশ এখানে অনুবাদ করছি :

"আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবৃতি আলাদা করে দেখলে এবং পূর্বে যা ঘটছে তার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে যথেষ্ট পৌরুষের (ম্যানলি) বিবৃতি। যদি কোনো মুহূর্তের উত্তাপে তাঁরা এমন কিছু বলে থাকেন যা এখন তাঁরা দেখছেন ন্যায্যতই হিংসার প্ররোচক, তাঁরা দুঃখ প্রকাশ ক'রে তাঁদের পোজিশানের সাধারণের কাজে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের পক্ষে যা সম্মানজনক তাই করেছেন। তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও যে আণ্ডারটেকিং দিয়েছেন তাও সমর্থন করতে আমিও প্রস্তুত থাকতাম যদি তা তাঁদের সেই সহকর্মীদের নিকট দেওয়া হতো যাঁদের সঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্য এবং যারা নীতি হিসাবেই হিংসাতে বিশ্বাস করেন না এবং কোনো সময়েই হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু "পাবলিক অ্যাসিওরেন্স এবং সমস্ত মানুষ, যাদের এই প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন হতে পারে তাদের উদ্দেশ্য"—এই শব্দ কয়টি পত্রের শিরোনামায় থাকায় আলোচ্য পরিস্থিতিতে এ কাউকেও এ সন্দেহ থাকতে দেয় না, আসলে কোন্‌ পার্টি এই 'আসিওরেন্স' এবং প্রতিশ্রুতি চেয়েছে এবং কার নির্দেশে এটি দেওয়া হয়েছে, এটা বড়লাটের বক্তৃতা এখন আরও সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছে।"

"আমাদের সামনে এখন একটি ঊল্লেখনীয় ঘটনা এই যে অসহযোগ আন্দোলনের যিনি নেতা তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন। [হ্যাজ বিন ইন ট্রিটি উইথ দি গভর্নমেণ্ট] এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে

ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আণ্ডার টেকিং দিতে ইনডিউস করিয়ে প্রসিকিউশন হতে অব্যহতি আদায় করেছেন।…;…বাস্তবিকই আমার মনে হচ্ছে, অসহযোগের সমস্ত নীতিই এতে বিসর্জিত হয়েছে।"

মতিলাল নেহরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন একদিকে মডারেটবিরোধী, আবার অন্য দিকে স্বস্বীকৃতভাবেই গঠনতান্ত্রিক মনোভাবের। তাঁরা ছিলেন গঠনতান্ত্রিক বিরোধিতার পক্ষপাতি! সে হিসাবে আমি তো তাদের মধ্যে নই। কিন্তু সেটল্‌মেণ্ট যদি হতে হয় তা তো হবে নীতির উপর। তিনি লিখছেন:

"আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের চেয়ে অনেক কম উত্তেজিত ভাষা ব্যবহার ক'রেও আমাদের অনেক বন্ধু জেলে গেছেন। এঁদের মধ্যে অনেককে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে বাঁচিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু এরূপ পরামর্শ দেবার কথা কারও মনে হয়নি। বরং নেতারা ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক সংবাদপত্রগোষ্ঠী বাহবা দিয়েছে। যার কথা সজোরে এই মুহূর্তে আমার মনে এসে পড়ছে সে হচ্ছে এলাহাবাদের হামিদ আহমদ। হামিদ আহমদের দণ্ড হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষটাকে আমি জানি…সে খুব একটা বুদ্ধিমান নয়, তেমন বক্তাও নয়। অন্যদের বক্তৃতা সে শুনেছে ও পড়েছে এবং নিজে যেমন পেরেছে তেমনই তার অনুকরণ করেছে। এমন হতে পারে যে সে হয়তো এই করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম ক'রে ফেলেছে।…এই ব্যক্তিকে কেন রক্ষা করা হবে না, তার কি কোনো কারণ আছে?"

লক্ষণীয় যে, গান্ধীজী যেমন সাধারণ মানুষকে দায়ী করছেন, মতিলাল তা করছেন না। তিনি নেতাদেরই দায়ী করছেন। এই ভাবে বলে তিনি বলছেন, খেলা যদি শেষই হয়ে থাকে, সকলের জন্যই হোক। ব্যক্তিগতভাবে সীমাবদ্ধ রেখে আর লাভ কি? তাঁর ঐ পত্র হতে নিম্নের উদ্ধৃতির অর্থই তাই দাঁড়ায়। "আমি এ কথা বলছি না যে, এই অবস্থায় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনাই হতে পারে না—যদিও সে রকম কথা না বলার দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষেও যথেষ্ট বলার আছে।"

"যখন দেখা গেলো খেলাটা কোনো মতে শেষ করতে হবে তখন আপনার ও লর্ড রিডিং-এর মতো দুই সম্মানীয় বিরোধী প্রতিপক্ষের পক্ষে খেলার আইন-কানুন সম্বন্ধে চুক্তি ক'রে ফেলা ন্যায্য। তাতে কোনও

'ফাউল' ঘটতে পারে না। কিন্তু তা হলে খেলার এই আইন-কানুনটা সকলের জন্যে প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন, শুধু কয়েকজন অনুগৃহীত ব্যক্তির জন্য নয়।" মতিলাল নেহরুর বক্তব্যে যে শ্লেষ আছে তা সহজেই বোধ্য। [মতিলাল নেহরুর পত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: "এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স্", জওহরলাল নেহরু, পৃষ্ঠা ২০-২২]।

মতিলাল বৎসরাধিককাল আগেই পত্রকে এক পত্রে বলেছিলেন: "গান্ধীজীর অনুরোধ রক্ষা করা সম্বন্ধে তোমার যা সেন্টিমেণ্ট সে সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। এ এক ধরনের সেন্টিমেণ্ট। আমার নিজের মনের গঠনের যা চরিত্র তাতে এসব প্রবেশ করে না। কিন্তু প্রশ্নটির শুধু মেরিটের উপর (গুণের উপর) বিচার ক'রে আমি বলবো, এমন কি গান্ধীজীও তাঁর এই কর্মসূচীতে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকবেন বলে আমি সুনিশ্চিত নই" [উপরে উদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা, ১৭, ১৯২০ সালের ৭ই জুলাই-এর পত্র]।

শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্‌মদ মীরাট মামলায় তাঁর বিবৃতিতে একস্থানে বলেছেন, "অহিংসার প্রতি তাঁর (গান্ধীর) অন্ধ বিশ্বাস একটি অন্তঃসারশূন্য বুলি মাত্র, অপারণত ভারতীয় বুর্জোয়াদের কাপুরুষতার প্রতীক।" উপরে যা বর্ণিত হয়েছে ঐ উক্তির ন্যায্যতা প্রমাণ করছে এবং সেই কাপুরুষতারই সাক্ষ্য বহন করছে।

বিপ্লবের ব্যাহত সম্ভাবনা

এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবৃতির সে-কথাও উল্লেখযোগ্য যে "১৯১৯-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলন উভয়ের মধ্যেই বিপ্লবের উপাদান এবং সম্ভাবনা ছিল যদিও প্রতিবন্ধকতার দরুন বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারেনি।" যে পাঞ্জাবের কথা উপরে বলা হয়েছে, সেই পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার মাস দুই আগে লাহোরের পথের এক দৃশ্য শ্রীঅমল হোম [তৎকালে স্থানীয় সংবাদপত্র ট্রিবিউনের সহকারী সম্পাদক] পরে স্মরণ করেছেন: "পুরানো শহর মোচিদরওয়াজার ধারে মশালের আলোয় চলছে এক সভা. একটা মোষের গাড়ীর উপর একটা টুল চাপিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে এক পাঠান যুবা:

'ইয়ে আপলোগ সোচিয়ে, ইয়ে নয়া কানুন [রাউলাট আইন] যা তৈয়ারী হো রহা হ্যায়, ইসমে না আদালত, না উকিল, না আপিল। সরকারকো এক হাতমে জহর কা পিয়ালা, ঔর দুসরা মে তলোয়ার—সরকার হামলোগো কো তলোয়ার কা জোরসে জহরকা পিয়ালা পিলানা চাহতা হ্যায়। সরকারকো হাথসে জহরকা পিয়ালা ছিনকে তোড়ো জমিনপর—সরকারকো হাথসে তলোয়ার ছিনকে চালাও দুশমন পর।'

"সাবাস! সাবাস! মশালের আলোয় রাঙা আকাশ ভেঙে পড়লো বক্তার জয়ধ্বনিতে। শ্রোতারা সব দোকানী, পশারী-টাঙাওয়ালা, ফেরিওয়ালা।"

[পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩]

সারা ভারত জুড়ে তখন শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গী মনোভাব। ১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাসেই দুই শতের উপর স্ট্রাইক হয়েছে যাতে ১৫ লক্ষের উপর শ্রমিক সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

কৃষকের মধ্যে বিক্ষোভ ও জঙ্গী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন ও খাজনা বন্ধ আন্দোলনে। [কমিউনিস্টস চ্যালেঞ্জ: ইম্পিরিয়ালিজম্ ফ্রম দি ডক, পৃষ্ঠা ১৬৯]

উপরে আমরা পাঞ্জাবের কৃষক শ্রমিকের বিক্ষোভ দেখেছি। সেই সব জেলাতেই বেশি বিক্ষোভের ও সরকারী নিপীড়নের পরিচয় পাওয়া যায়—যেখান থেকে কৃষকের ছেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিংবা সেচ্ছায় সৈন্য হয়ে গিয়েছিল। সারা ভারতে সংগৃহীত সৈন্যবাহিনীর অর্ধেকের বেশি, ৩ লক্ষ ৬০ হাজার গিয়েছিল পাঞ্জাব থেকে। যুদ্ধ-অভিজ্ঞতালব্ধ, যুদ্ধ প্রত্যাগত সচেতন সৈনিক কৃষকের ছেলে। পাঞ্জাবে গণ আন্দোলনের এক বিশেষ সম্পদ—বিক্ষুব্ধ শ্রমিক, বিক্ষুব্ধ কৃষক এবং ঐ যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈনিক। ব্রিটিশ আধিপত্যে মন্দের ভালো হিসাবে মার্কস যা সব দেখেছিলেন তার একটি হলো দেশীয় সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি। মার্কস বলেছিলেন: "ব্রিটিশ ড্রিল সারজেন্টের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় সৈন্য বাহিনী ভারতের স্বাধীনতা। অর্জনের উপাদান।" পশ্চিমে ফ্রান্স ও ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে শুরু করে পূর্বে ইরান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর মধ্যেই ছিল এই ভারতীয় সৈন্য। রুশ বিপ্লবের যে কম্পন সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তা তাদেরকেও নাড়া দিতে ছাড়েনি।

চতুর্দিকে এই আবহাওয়া। ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স দপ্তর সজাগ ছিল।

তাই রুশ বিপ্লবের মাসাধিককালের মধ্যেই ইংরাজ রাউলাট কমিটি নিয়োগ করে। শ্রীঅমল হোম লিখেছেন, হোম মেম্বর ভিনসেন্ট এসোসিয়েটেড প্রেসের কর্তা কে. সি. রায়কে বলেছিলেন: "I smell powder in the air of India." [ভারতের হাওয়ায় বারুদের গন্ধ পাচ্ছি—পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ—পৃষ্ঠা ৬১]

কিন্তু প্রয়োজনীয় বেশ কিছু উপাদান থাকা সত্বেও আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারল না।

পাঞ্জাব সংক্রান্ত কংগ্রেস তদন্ত কমিটি বলেছেন সত্যাগ্রহের কথা লোকের মধ্যে না গেলে ফল আরও ভয়ঙ্কর হতো, disastrous হতো ঠিক কথা। কিন্তু কার জন্য ? সাম্রাজ্যবাদের জন্য ? জমিদারের জন্য। হয়তো বুর্জোয়াদের জন্যও ? তাতে দেশের কি ! দেশের তো মঙ্গল। ঐ তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বুর্জোয়া কাপুরুষতায় প্রভাবিত এই সদম্ভ উক্তি রয়েছে যে, তাঁদের সত্যাগ্রহের প্রচারের ফলেই পাঞ্জাবের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের মানুষকে একযাত্রায় যোগ দিতে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। (পাঞ্জাবের সঙ্গে এইরূপ যোগাযোগ যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যেই তো ইংরাজ পাঞ্জাবে তাদের অত্যাচারের সংবাদ বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি।) তা ছাড়া তাঁরা তাদের রিপোর্টে বললেন,—"the influence of the satyagraha was powerful enough to control the anger of the people against the government." ঠিকই তো। বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতার বুর্জোয়া সার্টিফিকেট। আমরা শুধু influence শব্দের পরিবর্তে বসাবো deceipt and trap (প্রতারণা এবং ফাঁদ), powerful এর বদলে বসাবো misleading (বিভ্রান্তিকর) এবং control এর বদলে বসাবো frustrate. বুর্জোয়া প্রতারণা ও ফাঁদ এত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছিল যে জনসাধারণের ক্রোধ ও ঘৃণাকে তখনকার মতো বিফল করতে সমর্থ হয়েছিল।

গান্ধীজী ও চরখার তাৎপর্য

১৯৩৮ সালে গান্ধীবাদের মূল পুস্তক গান্ধীজীর 'হিন্দ স্বরাজ' সম্বন্ধে জনৈক ভক্তজন স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সডিকে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সদ্য ভারত থেকে তিনি ফিরেছেন, সেখানে এমন কিছু তিনি দেখেননি যাতে বোঝা যাবে ঐ পুস্তকে বর্ণিত তত্ত্ব বিশেষ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। এতে আছে, ইংরাজীতে যাকে বলে "ইউফেমিজ্‌ম্" শক্ত কথা যথাসম্ভব নরম করে বলার চেষ্টা। আজকে হলে নরম করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হতো না।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করতেন, গান্ধীবাদের যাঁরা প্রধান অনুগামী বলে পরিচিত, গান্ধীজীর যাঁরা প্রধান শিষ্য, তাঁরা বিশ দশক বা ত্রিশ দশকের মতো চরখা ও আশ্রম নিয়ে ব্রত নয়। গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের প্রচারকরা তখন খোদ বুর্জোয়া-কেন্দ্রীকরণ রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন। কল্যাণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতাই হন বা অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাই হন—সব শিয়ালের এক রা। গদির উপরেই হোক আর বাইরেই হোক, প্রফুল্ল—তা সে সেনই হন বা ঘোষই হন—যন্ত্রশিল্পের মালিকদের তাঁরাই বিশ্বস্ত। শেষোক্তরা জানেন, যেমন পূর্বেও জানতেন, এই 'চরখা কাটা' আশ্রমের লোকেরাই তাঁদের আসল লোক। চার্লি চ্যাপলিনের একটি ছবিতে একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি রাত্রে নেশায় মাতাল অবস্থায় নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে আর চ্যাপলিনের সেই প্রসিদ্ধ সহায়সম্বলহীন ভবঘুরে চরিত্রটি তাকে নদী থেকে তুলে বোঝাচ্ছে পৃথিবী কত সুন্দর, কত মনোরম। দেশহিতৈষী অধ্যবসায়ী দরিদ্র অর্থনীতির অধ্যাপক যখন পরিশ্রম ক'রে গান্ধীবাদী নেতাদের চরখার বদলে শিল্পপতিদের শিল্প তৈরীর সুযোগ দানে উৎসাহিত করার চেষ্টা করতেন তখন অনুরূপ কৌতুকজনক পরিস্থিতি হতো।

'যন্ত্র বনাম চরখা' যাঁদের বুলি তাঁদের এই ভূমিকা অভিনব কিছু নয়। সমতুল ক্ষেত্রে এই পরিণতি মার্কস বহু পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন। এটা যে অভিনব কিছু নয় মার্কস অবলম্বন করে পুরানো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই তা দেখা যায়। বরং গান্ধী সাহিত্যের কৌতূহলী পাঠকের কাছে সরস অনুশীলনও হতে পারে।

পটভূমিকাটা দেখে নিতে হয়। অর্থনীতিতে উনবিংশ শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ড 'ফ্রী ট্রেড' ও 'লে সে ফেয়ারের' দুর্গ হয়েছিল। এর সূচনা আরম্ভ হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের তোড় এসে পড়ে। 'ফ্রী ট্রেড' বলতে সোজা কথায় বোঝায়—আমদানী রপ্তানীতে কোনও শুল্কও কিছু থাকবে না, 'প্রোটেকশান' বা সংরক্ষণ শুল্কও কিছু থাকবে না। 'লে সে ফেয়ারের' অর্থ সরকারের কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে না। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের নতুন শিল্পপতিদের দুইটিই প্রিয়। 'লে সে ফেয়ার' তাঁদের প্রয়োজন—মজুরদের অবাধ ও নির্দয় শোষণের জন্য আর সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাদির উচ্ছেদের জন্য। ফ্রী ট্রেডের প্রয়োজন সস্তায় খাদ্য ও শিল্পের কাঁচা মাল আমদানীর জন্য। যেহেতু ইংল্যাণ্ডেই আধুনিক শিল্পের প্রথম উদ্ভব ও যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এমন কি ইউরোপ ও আমেরিকা খুবই পশ্চাৎপদ তখন ইংল্যাণ্ডের রপ্তানীর স্বার্থে ভারত প্রভৃতি উপনিবেশসমূহ এবং অন্যান্য দেশে ব্রিটিশ রপ্তানীর উপর যাতে শুল্ক না হয় এবং সে সব দেশে অবাধ রপ্তানীর সুযোগ থাকে তাই এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ আরও বেশী। সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল অন্য দেশের শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের প্রতিবোধের উদ্দেশ্য। পরে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের সূচনা ও আধুনিক শিল্পের পত্তন থেকে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনের বিক্রয়ের তাগিদ হলো বেশী। সেই উদ্দেশ্যে নীতিরও পরিবর্তন ঘটল। নীতি হলো বিপরীত। কাঁচামাল ও খাদ্যের অবাধ আমদানীর ও প্রয়োজন হলো। ফলে অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কাল ধরে যত নামকরা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ সকলেই 'ফ্রী ট্রেডের' সমর্থক।

কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন দেশ যেমন জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নতুন শিল্প গড়ে উঠছিল এবং ইংল্যাণ্ডের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। সুতরাং এদের মধ্যে 'প্রোটেকশান, বা সংরক্ষণ নীতির প্রবক্তা ও সমর্থক অর্থনীতিবিদ ও প্রচারক দেখা দিল। তারা নতুন শিল্প রক্ষা করা এবং

গড়ে তোলার জন্য কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করল, বহির্দেশের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলল এবং সেই উদ্দেশ্যে আমদানীতে উঁচু শুল্ক প্রয়োগ দাবী করল। এর মধ্যে সুপরিচিত হচ্ছেন জার্মানীর ফ্রিড্রিক লিস্ট (১৭৮৯-১৮৪৬)। অবশ্য দেশের অভ্যন্তরেও অনেক সময় দ্বন্দ্ব থেকেছে। চলতি-ব্যবসায়ী স্বার্থ, যা অনেক সময় দেশের কাঁচামাল রপ্তানী ও বিদেশের শিল্পজাত পণ্যের আমদানীর সঙ্গে যুক্ত আর অন্যদিকে সদ্য উত্থিত বা নির্মীয়মান শিল্পের স্বার্থ—উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেছে। ফ্রান্সের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বাসটিয়াট চাইতেন 'ফ্রী ট্রেড' কিন্তু শিল্প স্বার্থ তাঁর 'ফ্রী ট্রেড'কে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রিটেনে সপ্তদশ শতাব্দী ও পরবর্তী কিছুকাল 'ফ্রী ট্রেডের' বিপরীত হাওয়া ছিল। যাই হোক, ১৯শ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রে একজন অর্থনীতিবিদের কিছু নাম হয়। তাঁর নাম হেনরী চার্লস্ কেরী (১৭৯৩-১৮৭৯)। ভারতের মানুষের কাছে এঁর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। কারণটা উল্লেখ করছি।

এঁর বক্তব্যের সঙ্গে গান্ধীবাদের বক্তব্যের এক বিষয় মূলগত মিল আছে। হুবহু প্রতিটি শব্দে মিল থাকার কথা নয়। তবে ফারাক অল্পই। অবশ্য গান্ধীজীর কোনও বিষয়েই সামগ্রিক ক্ষেত্রকে সামনে রেখে বলার দায়দায়িত্ব ছিল না। ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের সময়, সাইসমোলজি বা ভূমিকম্প সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ধার ধারলেন না। সোজা বলে দিলেন পাপের জন্য ঘটেছে। তা ছাড়া তিনি ঘোষিতভাবেই কনসিস্টেন্ট থাকার দায়িত্ব অস্বীকার করতেন। কেরী পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ। তিনি যতই ওলট-পালট লিখুন তাঁকে তখনকার ইউরোপের বুর্জোয়া অর্থনীতির ধ্যান-ধারণাকে সামনে রেখে লিখতে হয়েছে। অনেক কথা তুলতে হয়েছে, বা আলোচনা করতে হয়েছে যা গান্ধীজীর প্রয়োজন হয়নি। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে ধর্ম, অহিংসা প্রভৃতি আলোচনার সব কিছু ধুইয়ে যেত। বস্তুতঃ উদ্দেশ্য যাই হোক, বাস্তব ক্ষেত্রে বিরোধীকে যুক্তির পরিবর্তে এই ধোঁয়ার প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। যাই হোক, যা বলছিলাম, বুর্জোয়া অর্থনীতির ইতিহাসে কেরী দিগ্বিজয়ী কেউ না হলেও তাঁর লেখা ইত্যাদি সংশ্লিষ্টতার কারণে আমাদের কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

আর এক কারণেও সহজেই আমাদের এই লেখক সম্বন্ধে কৌতূহল হতে পারে। ১৮৫৩ সালের ৭ই মে নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রাইবিউনে প্রকাশিত এঙ্গেলসের প্রবন্ধ সম্বন্ধে মার্কস বলছেন "এটি কেরীর মুখে চপেটাঘাত"।

এই কথা বলে উপরোক্ত পত্রিকায় আর কয়েকদিন পরে প্রকাশিত তাঁর নিজের প্রসিদ্ধ "ভারতে ব্রিটিশশাসন" প্রবন্ধটিকে উল্লেখ করে বলছেন, "আমি ভারত সম্বন্ধে একটি প্রথম প্রবন্ধে এই গোপন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। এই প্রবন্ধ ইংল্যাণ্ড কর্তৃক দেশীয় শিল্প (অর্থাৎ গ্রামের কুটির শিল্প 'লাঙলের সঙ্গে যুক্ত তাঁত'—লেখক) ধ্বংসকরণকে বৈপ্লবিক বলে বর্ণিত করেছি। এটা ওদের (অর্থাৎ কেরীদের—লেখক) কাছে 'শকিং' হবে। এ ছাড়া ভারতে ব্রিটেনের সমগ্র শাসনব্যবস্থা 'সোওয়াইনিশ' (শূয়রের বাচ্চার কাজ) এবং এখনও তাই আছে।" (এঙ্গেল্‌সকে লিখিত মার্কসের পত্র, ১৪ই জুন, ১৮৫৩)। ১৮৫৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার রিনিউ করা উপলক্ষে ভারত সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আলোচনা হয়। এই উপলক্ষে মার্কসের এই প্রবন্ধ। কিন্তু তা ছাড়াও আমেরিকার গ্রাম্য কুটির শিল্পের ভক্তদের আক্রমণ করাও মার্কসের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে মার্কস তাই বলেছেন। আমাদের মনে করতে ইচ্ছা হয় তৎকালীন শিল্পে পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান আমেরিকার নবোদিত বুর্জোয়া সমাজের চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি ৬০।৭০ বৎসর পর যে ভারতের মতো শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশের বুর্জোয়া নীতিবাচকের মধ্যে দেখা দেবে এ যেন ইতিহাস তাঁকে ইশারা দিয়েছিল।

কেরীর বক্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা যায় না। করার প্রয়োজনও নেই। কিছু কিছু নমুনা রাখা যেতে পারে। যেমন:

"...যা কিছু বিকেন্দ্রীয়করণ প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে, তা স্থানীয় ভাবে কাজ সরবরাহ করে, জমির মূল্য বৃদ্ধি করে, জমির বণ্টনে সাহায্য করে, পিতামাতা ও সন্তানদের নিকটতর ও ঘনিষ্ঠতরভাবে থাকা সম্ভব করে। সমাজে পরিবারের সভ্যদের মধ্যে বন্ধন যত বেশী শক্ত হবে ততই তারা নিজেদের অক্ষের চারিধারে ঘুরবে...যা কিছু স্থানীয় কাজ কমিয়ে দেয়, তা জমি পুঞ্জীভূত হতে সাহায্য করে। পরিবারগুলিকে ভেঙে দেয়, বড় সহর তৈরী ক'রে গ্রামগুলির ক্ষতি করে...যেমন আমরা ইতালী আয়ারল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, ব্রিটেনে হতে দেখলাম...।"

মোটমাট তাঁর লেখায় পাতার পর পাতা গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির প্রশস্তি। গ্রামেই উৎপন্ন ফসল আর গ্রামের কুটির শিল্পে তৈরী পণ্যের আদানপ্রদান—এই সুখের জগতকে তিনি রক্ষা করতে চাইলেন। তিনি শ্রেণীসমন্বয়ের মাধুর্যে মুগ্ধ এবং ইউরোপের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের উপর রুষ্ট, কারণ, তাঁর মতে

শেষোক্তরা তাঁদের লেখায় শ্রেণীস্বার্থগুলিকে সুস্পষ্ট ক'রে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করেছেন। "তিনি আবিষ্কার করেছেন, রিকার্ডো এবং অন্যদের মতবাদ, যার মধ্যে বর্তমান সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতাগুলি বিবৃত আছে, তা বাস্তব অর্থনৈতিক আন্দোলনের আদর্শ ফল নয়। বরং বিপরীত। ইংল্যাণ্ড এবং অন্যত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তব দ্বন্দ্বগুলি রিকার্ডো দিগরের মতবাদের ফল......" (মার্কস, ক্যাপিট্যাল, প্রথম ভলিউম, সোভিয়েত প্রকাশন, পৃষ্ঠা ৫৬৩)।

"...কেরী শুধু রিকার্ডোকে নয়, ইউরোপের ম্যালথাস্, মিল, সে, টরেন্স, ওয়েকফিল্ড ম্যাককুলক, সিনিয়র, হোয়েটলি, আর জোনস্ এবং অন্যান্য চিন্তানায়ক অর্থনীতিবিদদের ভৎসনা করেছেন—তাঁরা সমাজকে বিভেদে ছিন্ন ভিন্ন করেছেন এবং গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কারণ তাঁরা দেখিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলি আবিশ্যিকভাবেই তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা সৃষ্টি করবে।" (মার্কস, ওয়েদেমেয়ারকে লেখা চিঠি, ৫ই মার্চ, ১৮৫৫)। ঐ বৎসরই জুন মাসে (১৪ই জুন) 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' প্রবন্ধটি লেখার পর এঙ্গেলসকে এক পত্রে মার্কস লিখেছেন: "পূর্বে একপত্রে লিখেছি এই লোকটি (কেরী) তার পূর্ব প্রকাশিত পুস্তকে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মধুর সম্পর্কের কথা লিখেছিল এবং রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের কারণেই সব ক্ষতি এই ছিল তার অভিমত। রাষ্ট্রই তার বিভীষিকা। এখন সে অন্য সঙ্গীত শুরু করেছে। সব মন্দের গোড়া হচ্ছে আধুনিক শিল্পের কেন্দ্রীয়করণ। এই কেন্দ্রীয়করণের দোষ হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের দোষ, কারণ সে নিজেকে জগতের কারখানায় পরিণত করতে পেরেছে এবং অন্যান্য দেশকে পুনরায় শিল্পশূণ্য হয়ে শিল্প হতে বিচ্ছিন্ন রূঢ় কৃষিকাজে থাকতে বাধ্য করছে।" মার্কস ঐ পত্রেই আবার লিখছেন: "ট্রাইবিউন (আমেরিকান পত্রিকা যাতে মার্কস লিখতেন—লেখক) অবশ্য কেরীর বইএর বিজ্ঞাপনে যত শক্তি নিয়ে ঢাক পেটাচ্ছে। উভয়েরই এই এক জিনিসে সমভাব আছে। **উভয়েই সিসমণ্ডিয়ান-ফিলানথ পিক-সোশালিস্টিক শিল্প-বিরোধিতার আচ্ছাদনে প্রোটেকশানিস্টদের তথা আমেরিকার শিল্পপতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে।"**

অর্থনীতির চিন্তাধারার ইতিহাসের আধুনিক লেখকগণও একই মত পোষণ

করেছেন। যাঁরা কেরীর কৃষিভিত্তিক ও গ্রামভিত্তিক প্রচারের আবরণকে স্বীকৃতি দেন তাঁরাও তাঁকে শেষ পর্যন্ত 'প্রোটেকশানিস্ট' স্বার্থের প্রবক্তাই বলেছেন। "তাঁর প্রোটেকশান মতবাদে কৃষির উপরেই ঝোঁক ছিল, শিল্পের উপর ছিল না,...তৎসত্ত্বেও বলতে হবে মার্কিন প্রাটেকশানিস্ট চিন্তাধারার উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল।" (চেম্বার্স এনসাইক্লো, ১৯১০)। বাকী বেশী সংখ্যক বিশেষজ্ঞই তাঁর উপরোক্ত গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির প্রচারের মূল্য না দিয়ে তাঁকে সোজাসুজি প্রেটেকশানিস্ট বা সংরক্ষণ শুল্কের প্রচারক বলেছেন। (এনসাইক্লো ব্রিটানিকা, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য)।

ইংল্যাণ্ড প্রত্যেক দেশকে কৃষিতেই আবদ্ধ রাখতে চাইছে এবং গ্রাম্য শিল্পের যা ভিত্তি—লাঙ্গলের সঙ্গে তাঁতের যোগ আর নিড়েনির সঙ্গে হাতুড়ির —তাকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে, কেরীর এই অভিযোগের ন্যায্যতা মার্কস সমর্থন করে বলছেন: "কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা এই, ঐ বিচ্ছেদকে (অর্থাৎ লাঙ্গলের সঙ্গে তাঁতের বিচ্ছেদকে (রুখতে গিয়ে তিনি দাবী করছেন প্রোটেকশান, যা আসলে তাকে আরও ত্বরান্বিত করছে।" (ক্যাপিটেল, পাদটিকা, ১ম ভলিউম, পৃ: ৭৪৯, সোভিয়েত সংস্করণ)।

কেরীর প্রোটেকশানের দাবীর জন্য তাঁর শেষ সময়ের লেখা বই প্রিনসিপল্‌স্ অব সোশাল সায়েন্স" দেখা যেতে পারে (পৃষ্ঠা ৪২৫, ৩য় খণ্ড, কেলার সংস্করণ, '৬৩)। এই পুস্তকে ভারতের অতীত গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির প্রশংসায় কেরী গোটা একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন।

গান্ধীজীর লেখা ও ভাষণে যন্ত্রসভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ সুবিদিত। ১৯০৮ সালে গান্ধীবাদের মূলগ্রন্থ 'হিন্দ স্বরাজে' তিনি লিখেছিলেন: "এ আমার ডেলিবারেট অভিমত যে ভারত ইংরাজের বুটের তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে না, নিষ্পেষিত হচ্ছে আধুনিক সভ্যতায়।" (৮ম পরিচ্ছেদ)। বিদেশী আমদানীর প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ নয়—ক্ষোভ সেখানকার যন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাই তিনি বলেন: "যন্ত্রই ভারতকে দরিদ্র করছে। ম্যাঞ্চেস্টার আমাদের যা ক্ষতি করেছে তার হিসাব করা কঠিন।" (১৯শ পরিচ্ছেদ)। অতঃপর স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার প্রচলনের জন্য বাংলা দেশের প্রশংসা করে বলছেন: "এটা সত্য যে বাংলা দেশ বোম্বাইয়ের মিল শিল্পকে সাহায্য করছে। বাংলা দেশ যদি সব যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র বয়কট করতে পারত ভাল হতো।" (১৯শ পরিচ্ছেদ)। পরে ১৯২০ সালে ঠিক তেমনই পাঞ্জাবে শ্রীমতী সরলা দেবী

চৌধুরানীর বিদেশী বস্ত্র বয়কট প্রচার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন, "সরলা দেবী যখন আমাদের লিখলেন বোম্বে থেকে কিছু মালের তাঁর প্রয়োজন হতে পারে আমি আহত বোধ করলাম।..." (দ্রষ্টব্য, ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭ই জুলাই, ১৯২০)। বস্তুতঃ এ কথা তিনি অনেকবারই বলেছেন যে তিনি শুধু বিদেশী বস্ত্র বয়কটে সন্তুষ্ট নন। সম্পূর্ণ চরখায় ফিরে যাওয়াই তাঁর ইচ্ছা।

এ সবে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মিল বস্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা অনমনীয়। কিন্তু সেই 'হিন্দ স্বরাজ' পুস্তিকাতেই "দেশের মিলগুলিকে কি তাহলে তুলে দিতে হবে?"—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছিলেনঃ "এ কঠিন। একটা জিনিস প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে তোলা সোজা নয়। আমরা বলি আরম্ভ না করাটাই উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। **আমরা মিল কারখানার মালিকদের নিন্দা করতে পারি না**···করুণা করতে পারি। তাঁদের অনুরোধ করতে পারি তাঁরা যেন আর না বাড়ান। (১৯শ পরিচ্ছেদ 'হিন্দ স্বরাজ')। পরে কিন্তু তিনি ঘোষণা করেছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খাদি মিলের সঙ্গে অশোভন প্রতিযোগিতা না করে দাঁড়াতে পারবে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৮শে আগস্ট, ১৯২৪)। "অশোভন" শব্দটি এবং মিলবস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ এড়ানোর ইচ্ছাটি লক্ষ্যণীয়। খাদি প্রচারের ফলে মিল যে বাড়বে এ বিষয়ে তিনি বহু পূর্বেই যে সচেতন ছিলেন তা তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়ঃ "কেউ কেউ আশ্চর্য হতে পারেন; ভাবতে পারেন যদি সুতার সরবরাহটাই প্রশ্ন হয়, মেয়েদের সুতো কাটতে বলার বদলে দশ বিশটা মিল করলেই তো হয়। আমি 'নবজীবনে' এর উত্তর পূর্বেই দিয়েছি। নতুন মিল সহজে গড়া যায় না। কাউকে তার জন্য বিশেষ করে চেষ্টাও করতে হয় না। ধনীরা নিজেরাই চেষ্টা করে এবং সংখ্যা বাড়িয়ে যায়।" (নবজীবন জুলাই ১১, ১৯২০)। বরং "স্বদেশী প্রচারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে দাম চড়ানোটা হয়েছে বেশী।" (নবজীবন, সেপ্টেম্বর ৮,১৯২৩)। পরে এক সভায় তিনি বলেছেন "এমন কি এখনও কলকাতা এবং অন্যত্র থেকে অভিযোগ এসেই চলেছে যে ভারতীয় মিলগুলি ম্যাঞ্চেস্টারের চেয়ে বেশী চার্জ করছে—যদিচ তাদের কাপড় আরও খারাপ।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ফেব্রুয়ারী ২, ১৯২১)। তবু তাঁর মনে হয় একদিকে মিল মালিকের আর ধনীদের উৎপাদনবৃদ্ধিতে শ্লথগতি এবং অন্যদিকে মুনাফাবাজি—এই আচরণের কৈফিয়ত প্রয়োজন। "ব্যাঙের ছাতার মতো মিল গজায় না। বাইরে থেকে যন্ত্রপাতি আনতে হয়। তাছাড়া শ্রমিক যোগাড়ের সমস্যাও

আছে।" (নবজীবন, সেপ্টেম্বর ৮,১৯২৬)। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি সুনিশ্চিত যে অধিকন্তু দাবি মেটাবার জন্য মিল গজাবেই "ঠিক যেমন, ঘরে রান্না সত্ত্বেও রেস্তরাঁ বেড়েই যাচ্ছে।" (ঐ)। তা ছাড়া তিনি আগেই বলেছিলেন "মিল কাপড়ের স্থায়ী জাতীয় বয়কটের কোনও প্রশ্নই উঠে না।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, মে ২২, ১৯২৪)। মিল মালিকদের সম্বন্ধে তিনি বললেন: "তারা খোলাখুলিভাবেই স্বার্থপর। তারা যদি যুগের ইঙ্গিত বুঝতে পারে, তাদের কাপড় সস্তা করে বিদেশী বস্ত্র বয়কটে সাহায্য করতে পারে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, মে ২২, ১৯২৪)। লক্ষ্য করা উচিত, বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় দামের ব্যাপারটায় ক্রমোত্তর জোর আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বস্ত্র বয়কট করতে হলে মিলের প্রয়োজনের কথাটা আসছে। দামের ফারাক রাখতে গেলে, শিল্পপতিরা বলেন, সংরক্ষণ শুল্ক চাই।

কাজেই তাঁর সাহায্যকারী আম্বালাল সারাভাই বা বিড়লা বা অন্য মিল-মালিকরা কেন ক্ষুণ্ন নন সহজেই বোধ্য। তিনি নিজেই বলছেন: "মিল সব খাদি প্রচারে রুষ্ট নয়। বরং তার বিপরীত। অনেক মিল এজেণ্ট আমাকে নিশ্চয় করে জানিয়েছে যে তারা খাদি প্রচারে উপকৃত হয়েছে। কারণ এই প্রচার বিদেশীবস্ত্র-বিরোধী আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। এতে তারা তাদের অপেক্ষাকৃত মোটাকাপড় বিক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছে।..." (ইয়ং ইণ্ডিয়া, মে ১০, ১৯২৮)। কিন্তু এই বিক্রীর একটা দিকে মিল মালিকদের অদম্য লালসার নোংরা চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। তাই তিনি অসন্তুষ্ট। তিনি মিলে জাল খদ্দর উৎপাদনের পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন মিলে প্রস্তুত জাল খদ্দর হু হু করে বেড়ে চলেছে। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, মে ১০, ১৯২৮)।

কেরীর ক্ষেত্রে গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি ইত্যাদি কথার আ রণে আমেরিকার নবউদ্যোগে উদীয়মান ও প্রসারমান যন্ত্রশিল্প কলকারখানা স্থাপনের সমর্থন এবং তার জন্য প্রোটেকশান দাবি—এইটিই কেরীর মোদ্দা কথা বলে মার্কস মন্তব্য করেছেন।

গান্ধীজীকেও বলতে দেখি: "বিদেশী বস্ত্র ভারতীয় বাজার থেকে সম্পূর্ণ দূর করতে হবে, ভারত যদি অর্থনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে চায়।....তার প্রধান শিল্পের সংরক্ষণ (প্রোটেকশান্) তার জন্মগত অধিকার। যদিচ বর্তমানের মতো এর ফলে গরীবদের উপর অর্থদণ্ড বর্তাবে তথাপি আমি বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভারতীয় মিলের সংরক্ষণ (প্রোটেকশান) চাই। গরীবের নিকট হতে এরূপ অর্থদণ্ড উসুল ঘটতে পারে যদি মিল মালিকরা

এমন দেশবিরোধী হন যে প্রোটেকশনের (সংরক্ষণ শুল্কের) ফলে একচেটিয়া কারবারের সুযোগে তাঁরা দাম বাড়ান। সুতরাং বস্ত্রের উপর অভ্যন্তরীণ শুল্কের উচ্ছেদ এবং বিদেশ হতে বস্ত্র আমদানী সম্পূর্ণ নিরোধ করে এমন আমদানী শুল্কের প্রয়োগ সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবেই দাবি করব"। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, আগস্ট ২৮ ১৯২৮)। "মিল মালিকরা যদি দেশবিরোধী হন ইত্যাদি" ঘুরিয়ে বলার অর্থ কি? শুধু স্বদেশী প্রচারের ফলে তারা বেশী দাম চার্জ করে সাধারণ মানুষের দেশহিতৈষণার (ও স্বদেশে উৎপন্ন পণ্যের প্রতি অনুরাগের) উপর জরিমানা আদায় করে, এমন কি জাল খদ্দর তৈরী ক'রে সাধারণকে প্রবঞ্চিত করে— এই চলতি পরিস্থিতি তাঁকে নিজেকেই স্বীকার করতে হয়েছিল। গত চার দশকে কি ঘটেছে এবং শেষ পরিণতি কি হয়েছে, দেশের মানুষ দেখেছেন।

কোনও শিল্প ও ব্যবসা একচেটিয়া হওয়ার অর্থ অন্য প্রতিযোগী শিল্প ও ব্যবসার গুরুত্ব আর কিছু থাকে না। সুতরাং মিল শিল্প একচেটিয়া হলে চরখার স্থান বিশেষ কিছু থাকে না। লক্ষ্য করার বিষয় 'প্রোটেকশানের' এইরূপ পরিণতি অর্থাৎ মিল শিল্প একচেটিয়া হওয়া তার অজানা ছিল না। আমরা উপরে কেন্নীর ক্ষেত্রে দেখেছি, মার্কস বলেছেন এরা গ্রাম অর্থনীতি ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রচার করে সেই প্রোটেকশনেরই দাবি ঘটায়, কেন্দ্রীয়করণ করে এবং এইভাবে কুটিরশিল্পের অবলুপ্তি আরও ত্বরান্বিত করে।

বিদেশীবস্ত্র বয়কট ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সংরক্ষণ শুল্ক (প্রোটেকটিভ ট্যারিফ) বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে মিল উৎপাদনের বৃদ্ধির বিস্তৃত ইতিহাস এখানে আলোচনা করছি না। ১৯২৯-৩০ এর থেকে ১৯৩৬-৩৭ এর মধ্যে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় (জ্যাথার বেরী, ৮ম সংস্করণ, ম ভলিউম, পৃঃ ৪২৪)। ইতিবাচক ভাবে অভ্যন্তরীণ শুল্কের বিলোপ শুল্ক হিসাবে ধরলে ১৯১৭-১৮ থেকে ত্রিশ দশকে সংরক্ষণ শুল্কও দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রসঙ্গতঃ এও উল্লেখ করতে হয় যে গান্ধীজী গ্রাম উদ্যোগের যে সংগঠনগুলি করলেন (কাটুনি সংঘ প্রভৃতি) তারাও ধনতান্ত্রিক চরিত্রের সংগঠনে পরিণত হলো। বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে হলো ধনতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ। যারা তৈরী করে তারা পরার জন্য তৈরী করে না, পরেও না—শুধু বিক্রয় করে। এ কথা বারবার কাটুনিসংঘের রিপোর্টে এবং গান্ধীজীর লেখায় বিবৃত হয়েছে। সহরে যাঁরা কেনেন তাঁরা গান্ধীজীর স্বীকৃতিতে "শুধু পাপস্খলনার্থ কৃচ্ছসাধন

ক্রয় করেন, ফাউ লাভ করেন দেশভক্তের আখ্যা"। (হরিজন, জুলাই ২১,১৯৩৬)। যাঁরা সুতা কাটেন মজুরিতে ঠকেন। মজুরি যথাসম্ভব কমানো হয়। (হরিজন, জুলাই ১৩,১৯৩৫)। "যাঁরা খাদি কাজে নিযুক্ত তারা যথার্থ মজুরি পান না।" (জাকুজী, সেক্রেটারী, অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশান, অক্টোবর ১১,১৯৪৪) ধনতান্ত্রিক রীতিতে ছাঁটাইএরও প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত হলো। (হরিজন, আগস্ট ১০, ১৯৩৫)। ধনতান্ত্রিক চরিত্র সম্বন্ধে গান্ধীজী নিজেই স্বীকার করছেন: "আমরা এখন যা করি ব্যাঙ্কারদের মতো টাকার থলে নিয়ে গ্রামে যাই এবং সুতা কাটার জন্য সিকি বা সিকি দেড়েক প্রতিশ্রুতি দিই।" (অক্টোবর ১৩, ১৯৪৪)।

বস্তুতঃ চরখা একটা যন্ত্র মাত্র, শুধু আজকের যন্ত্রের তুলনায় পশ্চাৎপদ এইটুকু যা। সুতরাং শোষণ বিশিষ্ট সমাজে এ যন্ত্রও শোষণের মাধ্যম হতে পারে এ কথা তিনিও স্বীকার করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সময় বাদশারা বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বারা চরখার সুতা কাটিয়ে নিতেন এ কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য একদিকে প্রগতিশীল বিরোধী প্রচার ও অন্যদিকে ঘটলো জনসাধারণের নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি। এ সবের ফলে চরখার রহস্য হলো উন্মোচিত, ধর্মের আবরণও টিকলো না। ফলে ব্যর্থতার মুখে তাঁকে এসব কথা বলতে হয়েছে। তবু তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করার মতো। পুরাকালে চরখার দ্বারা শোষণের কথা তুলে তিনি বলছেন: কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে ঐরূপ বাধ্যতামুলক শ্রমের কথা উল্লেখ করেছেন। যুগ যুগ ধরে চরখা হিংসার; শক্তিমানের শক্তি প্রয়োগ ও জোর করে বাধ্যকরণের প্রতীক থেকেছে।" (সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৪৪)। সারা জীবন ধরে যিনি চরখাকে 'অহিংসার প্রতীক' বলে ঘোষণা করলেন জীবনের শেষে তাঁর কাছে বিপরীত এই স্বীকৃতি আদায় জনমতের কম সাফল্য নয়। পরে জনসাধারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছেন প্রফুল্ল ঘোষ এবং প্রফুল্ল সেন যখন রাইটার্স বিল্ডিং যান তখন এই হিংসার প্রতীককেই বুকে ধরে যান।

তাঁর চরখা প্রচার মিল প্রচারের বিকল্প নয়, আসলে সমাজতন্ত্র প্রচারের বিকল্প এ কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। প্রথমোক্ত উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে। শেষোক্ত নিম্নের উদ্ধৃতি লক্ষ্যণীয়। তিনি বলছেন: "যদি মিলগুলির জাতীয়করণ করা হয়, বস্ত্রের মূল্য নামতে পারে, জনগণও শোষিত হবে না এবং যথেষ্ট মজুরিও পাবে।" (অক্টোবর ১০, ১৯৪৪) তবে বিকল্প

চরখা প্রচার কেন? তাঁর প্রকল্পিত ধর্মও মোক্ষসাধনের জন্য! শেষোক্ত সার্থক হোক না হোক ইতোমধ্যে জাতীয়করণ প্রতিরোধ করার কাজটা হচ্ছে।

যাই হোক, এ বিষয়ে আর বিস্তৃত আলোচনা এখানে করছি না। কুটির শিল্প, গ্রাম-উদ্যোগ, প্রাচীন গ্রাম সমাজের পুনপ্রবর্তন ইত্যাদি প্রচার অনেক কিছুর খোলস হয়। সাধারণভাবে এটাও সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন ও জানেন। এ প্রবন্ধের বক্তব্য শুধু এই যে ভারতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধির এই প্রচারেও কিছু অভিনবত্ব নেই। কেরীর ক্ষেত্রে মার্কস দেখিয়েছেন, শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশের বুর্জোয়ার প্রবক্তা এই রকম পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন ও করছেন। একদিন মিলশিল্প প্রবর্তন ও প্রসারে উদ্যত মার্কিন বুর্জোয়ার প্রতিনিধি যা বলেছেন বিংশ শতাব্দীতে ঐরূপ উদ্যোগে ব্যাপৃত ভারতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধিও সেইরকমই বলবেন যে, তাতে আশ্চর্য কি? কেরী সম্বন্ধে আলোচনায় মার্কসের যে সাধারণ সূত্র বেরিয়ে আসে— গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত তার একটি নিদর্শন মাত্র।

চরখা বা যে কোনও পশ্চাৎপদ যন্ত্রের আজকেও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও মূল্য হ'তে পারে না এ কথা কেউ বলে না। ধরুন, কোনও দেশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালে মিলে উৎপন্ন পণ্য থেকে যদি সাময়িক কাল বঞ্চিত হয়, তা হলে সেই দেশ কি পশ্চাৎপদ যন্ত্রে সাধ্যমত উৎপাদন করে শত্রুর বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ গড়ে' তুলবে না? সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখিয়ে দিয়েছে উন্নততর যন্ত্রের উৎপাদনের চেষ্টায় রত থেকে ও রত থাকার কালে দেশের উন্নত অনুন্নত সব সম্পদকেই কাজে লাগিয়ে সেই চেষ্টাকে আরও সার্থক করা যায়। কিন্তু গান্ধীবাদের প্রচার ঐরূপ থাকেনি।

বস্তুতঃ 'অহিংসা' 'ধর্ম' প্রভৃতি আলোচনার ধোঁয়ার মধ্যে স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী বয়কটকে সংকুচিত ও আড়ষ্ট করার ফলে প্রকৃত স্বদেশী প্রচার বরং বিঘ্নিত হয়েছিল। গান্ধীজী ১৯০৮ সালে হিন্দ স্বরাজে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য লেখায় সারা ভারতের মধ্যে বাংলা দেশে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার ও বিদেশী বস্ত্র বয়কটের বিশেষ সাফল্যের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। অথচ বাংলা দেশেই উপরোক্ত ধরনের প্রচার ও গান্ধীবাদের প্রভাব সবচেয়ে সীমিত ছিল এবং আছে। রাজনৈতিক প্রচারের সঙ্গে এখানে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" মিলিত হয়ে যে সার্থকতা নিয়ে এসেছিল, অন্য

প্রদেশে খাঁটি গান্ধীবাদ তা করতে পারেনি। বরং, ধর্ম ও অহিংসার আবরণ তাকে বিঘ্নিত করেছিল।

গান্ধীবাদের বিধিমতে যেভাবে চরখা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রচার চালিত হয়েছে, তাতে গ্রামের সমস্ত শোষণকে আচ্ছাদন করেছে। গ্রাম উন্নয়নের অলীক কল্পনা দিয়ে, শ্রেণীসমন্বয়ের প্রচার ক'রে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর সহজ ও স্বাভাবিক প্রবাহ, গ্রাম ও শহরের উৎপীড়িতের মিলিত আন্দোলনে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

জীবনের শেষে কাটুনীসংঘেরই ব্যাপার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ব্যথিত হয়ে বলেছেন: "আজ গান্ধীবাদ নিন্দার শব্দ (এ ওয়ার্ড অব রিপ্রোচ)। এ আর পুণ্যবান বা প্রশংসনীয় কিছুর সূচক নয়।" (সেপ্টেম্বর ১, ১৯৪৪)। তাঁর নিজের এরূপ উক্তির পর এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হয় না।*

---

* শেষে এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা শুধু তুলতে হচ্ছে।

অসুবিধাজনক ব্যাপার বুঝলেই যার এড়াবার মতলব ও সুযোগ আছে সে সেটা বাদ দেয়। কোনও সংস্করণে যদি দেখা যায়, প্রকাশক বিশেষ বিশেষ অংশ বাদ দিয়েছেন, মনে প্রশ্ন ওঠে, উদ্দেশ্যটা কি? উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির কালে এঙ্গেলস পরে অনুকুল অবস্থায় প্রস্তুতির পর সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের আস্থা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু তৎকালীন সংশোধনবাদীরা তাদের মুদ্রণে ও প্রকাশনে এঙ্গেলসের এ উক্তি কাটান ছাটান করে বাদ দিয়েছিলেন; কারণ ওটা থাকলে বুর্জোয়াজীর কাছে তাঁদের আত্মসমর্পণ বিঘ্নিত হবে। তা ছাড়া মার্কসের লেখার পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁরা তো নিয়মিতভাবেই তাকে নানাভাবে ফিকে করার চেষ্টা করেছেন। সোভিয়েটের মার্কসিজম-লেনিনিজম ইন্সিটিটিউট এক সময় লিখেছিলেন:

"মার্কসের পাণ্ডুলিপি 'সম্পাদন করতে কাউটস্কি মার্কস কর্তৃক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মতামতের সম্পূর্ণ বিনাশ ক'রে এমন তীব্র সমালোচনাকে নরম করে দিত। বুর্জোয়াজীর পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থক ('এপলজিস্ট ফর দি বুর্জোয়াজী') এবং পক্ষসমর্থনকারীদের দয়াহীন সমালোচনায় মার্কস যেসব ক্রুদ্ধ, আবেগময়, শ্লেষাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন তার পরিবর্তে সাজানো গোছানো মসৃণ ভাষা বসিয়ে দিত।" (থিওরিজ অব সারপ্লাস ভ্যালুর ভূমিকা)।

সব সময় সমান গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এ রকম কাটান ছাটান এখন বেশ

নজরে পড়ছে। শতবার্ষিকীয় সময় ম্যাক্সিম গর্কির চিঠিপত্রের একখানি ক্ষুদ্র চটি সংস্করণ এবার মস্কো থেকে বেরিয়েছিল। পরিমাণগত ও গুণগত দুই বিচারেই বোঝা যায় যে, বাছতে গিয়ে নির্মম হস্ত ব্যবহৃত হয়েছে। মিতব্যয়িতার জন্য নিশ্চয় নয়। একদিকে বৃহত্তর উন্নততর সংস্করণের খরিদদারের অভাব হতো না, অন্যদিকে সোভিয়েট সংশোধনবাদীদের বিনামূল্যে বিতরিত এবং অপঠিত লক্ষ লক্ষ টন পুস্তিকায় ব্যবহৃত কাগজ কালির একটা সামান্য অংশ এরূপ গ্রন্থে ব্যয়িত হলেই চলত। তাছাড়া সোভিয়েট ভাণ্ডারের দরজা ম্যাক্সিম গর্কির জন্য আর একটু উন্মোচিত হলে এমন কিছু ক্ষতি হতো না।

এখানে অনুরূপ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল বলে শেষে এই কথার অবতারণা করলাম।

ভারতে প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলস্ পত্রাবলীর একটি সংস্করণে (পিপলস্ পাবলিশিং হাউসকৃত) কেরীর উল্লেখে মার্কসের পত্রগুলি বর্জিত হয়েছে —যদিচ যে সোভিয়েত বা বিলাতী সংস্করণ অবলম্বনে তা করা হয়েছিল তাতে এই পত্রগুলি ছিল এবং আছে। গান্ধীবাদের সমালোচনার উপর আলোকপাত করতে পারে এমন পত্র বর্জনের কারণ কি ?

এ পত্রগুলি থাকলে ক্ষতি কার ছিল ?

পাঠকই বিচার করবেন।

পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লেনিন

ভূমিকা হিসাবে দেশের একটা কথা উদ্ধৃত করে আলোচনা শুরু করব। এই শতব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশের একটা ছবি এ ভাবে বর্ণিত হয়েছিল। ..."এমন সময় এক জন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটি বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নূতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, ধুতির উপর একটি জামা, দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয়, ভদ্রলোকের ছেলে—কিন্তু মুটে মজুরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুই জনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিড়ার যথোচিত পরিমাণ ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশী কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে।..." এত উদ্যোগ এত অধ্যবসায় দেশপ্রেমের এইরূপ নিষ্ঠার একটা পরিণতি—রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ "পণরক্ষা" গল্পেরই আর এক অংশে দিয়েছেন: "তাঁতের স্কুলটি গোড়ায় যেমন হঠাৎ জলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাবুরা...... নানা দিগদেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে·· সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।"

কিন্তু এটা পরিণতির একটা দিক মাত্র। অন্যদিকও ছিল। "বাংলা দেশের হিম্মতের সংবাদ পড়ে আমি আনন্দিত হলাম।···ইহা সত্য যে বাংলাদেশ বোম্বাই-এর মিলগুলিকে উৎসাহিত করছে।" (হিন্দ স্বরাজ, ১৯০৮ গান্ধী)। এটা অবশ্য স্বাভাবিক এবং ইতিহাসে আবশ্যিক পরিণতি। কমিউনিস্ট ইস্তাহারেই মার্কস্ বলেছিলেন, "চীনের প্রাচীরের মতন সকল বাধা ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেয়, বুর্জোয়াদের পণ্যের সস্তা দাম এমনই শক্তিশালী অস্ত্র···

উৎপাদনের বুর্জোয়া পদ্ধতির আশ্রয় লইতে সকল জাতিকে ইহারা বাধ্য করে, অন্যথায় ভয় থাকে ধ্বংস হইয়া যাইবার।" বাংলার তাঁত শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারের ফলে যে-সাহায্যটুকু পাওয়া গেল তার ফলে বোম্বাই-এর সেই সময়কার স্বল্পোন্নত মিলগুলিও কিছুটা বিলাতের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গৃহে পরিচালিত তাঁত শিল্পেরও ধ্বংস সাধন ত্বরান্বিত করল।

মধ্যযুগীয় বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা যত শীঘ্র তার আবশ্যিক পরিণতিতে বুর্জোয়া কেন্দ্রীয়করণে উপস্থিত হয় ততই ভাল। করেন শেষোক্তের মধ্যেই ঘটে প্রলেতারিয়েতের শক্তিবৃদ্ধি এবং তার ফলে দ্রুত এগিয়ে দেয় বিপ্লবের সম্ভাবনা। বাংলাদেশে অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্পকে সাধারণভাবে মোক্ষ সাধনের উপায় হিসাবে নেওয়া হয়নি—যদিচ এরকম প্রচারেরও অভাব ছিল না। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বদেশী প্রচারকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মিলের প্রতিরোধে দেশী তাঁতকেই খাড়া করার চেষ্টা হয়েছিল। মিল্ তৈরীর আশু অক্ষমতার কারণে, এইরূপ উপায়কে অনন্য উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। মিল তৈরীর চেষ্টাও আরম্ভ হয়েছিল এবং কিছু চেষ্টা সার্থকও হয়েছিল। প্রধান লাভ হল অবশ্য তাঁদের যাঁরা আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় এগিয়ে ছিলেন অর্থাৎ বোম্বাই-এর মিলমালিকদের।

"এ পথ নয়"

রাশিয়ায় মার্কসবাদীদের আবির্ভাবের পূর্বে বৈপ্লবিক কাজ যাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁদের বলা হতো 'নারোদনিক'। "নারোদ" এর অর্থ জনগণ এবং তাঁরা নিজেদেরকে জনগণের বন্ধু বলে বর্ণনা করতেন। নারোদনিকেরা কয়েকটি ভ্রমাত্মক তত্ত্ব প্রচার করতেন। প্লেখানভ ও মার্কসবাদীদের তাঁদের সেই ভুল তত্ত্বের বিরুদ্ধেই প্রচার চালাতে হলো। এই তত্ত্বগুলি ছিল নিম্নরূপ—প্রথমতঃ তাঁরা ভাবতেন রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের আবির্ভাব একটা আকস্মিক (অ্যাকসিডেণ্টাল) ব্যাপার। এর আর উন্নয়ন হবে না। ফলে প্রোলেতারিয়েতেরও উন্নয়ন ও বৃদ্ধি হবে না। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবে সর্বাগ্রগামী শ্রেণী বলে মনে করতেন না। তাঁরা প্রোলে-তারিয়েতকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রে পৌছিবার কথা ভাবতেন। তাঁরা বুদ্ধি-

জীবীয় নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক সমাজকেই প্রধান বৈপ্লবিক শক্তি বলে বিবেচনা করতেন। মানব ইতিহাসের অতীত ও ভবিষ্যতের গতি সম্বন্ধেও তাঁদের ধারণা ভুল ছিল। তাঁদের মতে ইতিহাস শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা সৃষ্টি হতো না—ইতিহাস সৃষ্টি হতো কিছু ব্যক্তি বিশেষ মহামানব ও বীরপুরুষের দ্বারা। জনতার কাজ শুধু তাঁদের নেতৃত্ব অন্ধ ভাবে মেনে নেওয়া। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে এইসব ভুল তত্ত্বের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের প্রচার শুরু করতে হয়।

স্বভাবতই লেনিনকে মার্কসবাদী হিসাবে রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভেই পূর্বগামী বিপ্লবী ও তাঁদের অনুসরণকারীদের ভুল তত্ত্বের বিরুদ্ধে উক্ত প্রচারে অংশ গ্রহণ করতে হলো। তাঁর অগ্রজ আলেকজান্দার উলিয়ানভ ছিলেন মহৎ চরিত্রের যুবক। তিনি বিপ্লবের কাজে আত্মদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নারোদনায়া ভলয়া দলে যোগদান করেন। নারোদনিকরা প্রথমে জার শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের উত্তেজিত করতে কৃষকদের সাজ পরে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে যেতে আরম্ভ করেন। তাঁরা কৃষকদের আস্থা অর্জন করতে পারেন না। একদিকে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো, অন্যদিকে তারা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে এবং নির্বাসনে প্রেরিত হতে লাগলেন। তখন তাঁরা জনগণকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত একক হস্তে জার ও জারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত করলেন। তার অর্থ দাঁড়ালো ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ। "নারোদনায়া ভলয়া" দলের সভ্যরা জারকে হত্যা করার মন্ত্রণা করলেন এবং ১৮৮১ সালের ১লা মার্চ তারিখে জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে একটি বোমা দ্বারা হত্যা করতে সমর্থ হন। লেনিনের বয়স তখন ১১ বৎসর। লেনিনের দাদা উক্ত দলের প্রভাবে পড়েন। যদিচ তিনি মার্কসবাদ সম্বন্ধেও যথেষ্ট পড়াশুনা করতে আরম্ভ করেছিলেন তবু উপরোক্ত প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর স্বভাবই ছিল যে-কাজ তিনি আরম্ভ করতেন সিরিয়াসলি করতেন। যাই হোক, পরিণতিতে জার তৃতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তিনি ১৮৮৭ সালে গ্রেপ্তার হন এবং ঐ বৎসর মে মাসে তাঁর ফাঁসী হয়। অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লেনিন মনে প্রচণ্ড আঘাত পান। কিন্তু দিশাহারা হন না। বরং এই বেদনাদায়ক ঘটনা এবং আঘাত তাঁর চিন্তাধারাকে আরও পরিষ্কার করে দেয়।

ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, "তাঁর দাদার ভাগ্য নিঃসন্দেহে উলিয়ানভের (লেনিনের) মনের উপরে গভীর রেখাপাত করল। এর মধ্যে একটা বড় উপাদান ছিল তাঁর নিজের চিন্তা। এর মধ্যে তিনি বিপ্লবের সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বেশ কিছু চিন্তাভাবনা করেছিলেন। এ যদি না হতো তাঁর দাদার ভাগ্য তাঁকে গভীর ভাবে শোকাভিভূত করত। কিংবা তাঁকেও একই পথ অনুসরণ করতে প্ররোচিত করত। কিন্তু যা ঘটল তাতে দাঁড়াল এই যে তাঁর চিন্তাধারাকে এই ঘটনা আরও ক্ষুরধার করল। এর ফলে তাঁর এক ধীর এবং অপ্রমত্ত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠল। বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া এবং বাস্তবকে সঠিক ভাবে পরিমাপ করার অভ্যাস হলো। শব্দ ও বাক্যের মোহ, অলীক স্বপ্নের ধাঁধা প্রভৃতির দ্বারা বিপথে চালিত হওয়া থেকে সাবধান হওয়ার ক্ষমতা তিনি পেলেন। সমস্ত প্রশ্নে একটা অসাধারণ ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করার ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। দাদার মৃত্যুর পর লেনিনের মন্তব্য হলো তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত: 'না, আমরা এ পথ গ্রহণ করব না। এ পথ আমাদের চলার পথ নয়'।"

বহুদিন পর—বিপ্লব সার্থক হওয়ার পর ১৯০০ সালে—লেনিন সোশ্যাল রিভলিউশনারীদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমরা মার্কস-বাদীরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদকে দৃঢ়তার সঙ্গে বাতিল করতাম আর তারা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ও গুপ্তহত্যাকে মানতো বলে নিজেদেরকে বিশেষ ভাবে বিপ্লবী বা বামপন্থী বিবেচনা করত। আমরা অবশ্য কেবল উপযোগিতা ও সুবিধাজনকতা (এক্সপিডিয়েন্সি)—শুধু মাত্র এরই বিবেচনায় ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদকে বাতিল করতাম। অন্যথায়, প্লেখানভ যখন মার্কসবাদী ও বিপ্লবী ছিলেন তখন যারা মহান ফরাসী বিপ্লবের সন্ত্রাসের নীতি-হিসাবে নিন্দা করতো কিংবা চতুর্দিকে বিশ্বের বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অবরোধ পরিবেষ্টিত কোনও বিজয়ী বিপ্লবী পার্টির সন্ত্রাসের নিন্দা করতো, তাদের উপর তিনি বিদ্রূপের কষাঘাত করেছিলেন।..."

লেনিনের সমালোচনা

নারোদনিকেরা দেখাতেন ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা এক সময় যেন এক স্বর্গীয় শান্তির আবহাওয়ায় জীবন কাটাতেন। বড় কলকারখানার উদ্ভব হতেই এদের দুর্দশা আরম্ভ হলো। লেনিন দেখালেন, যখন থেকেই এই ক্ষুদ্র

উৎপাদনকারীদের উৎপাদন পণ্য হলো এবং ধনতন্ত্রের বাজারে কেনা-বেচার বস্তু হলো তখনই তো আর ধনতন্ত্রের বাইরে রইল না, ধনতন্ত্রের অধীন হয়ে গেল। বড় কলকারখানা হলে ধনতন্ত্র হলো এবং ছোট হস্তশিল্পের কাজ হলে তা হলো না এমন তো কথা নয়। লেনিন নারোদনিক রাজনীতিকের এই ধারণার বিরুদ্ধে বলছেন: "যে-শিল্পের পতন হচ্ছে আর যে-শিল্প বাড়ছে উভয়ই ধনতান্ত্রিক লাইনে সংগঠিত—এ কথা তিনি বেশ নিশ্চিন্তেই ভুলে যাচ্ছেন। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিক (যারা তাদের মাল খরিদ করার মাধ্যমে কজা করে সেই) ব্যবসায়ীদের নিকট দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তিনি পেটি-বুর্জোয়ার ছোট ছোট উন্নয়নের দাবীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেন—পুঁজির প্রভুত্বের উপর ঐগুলি যেন কোনও রূপ প্রভাব খাটাতে পারে।"

লেনিন বললেন "এ হচ্ছে সেই ভুল যা পেটিবুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা করে থাকেন। তাঁরা কলকারখানা-বিশিষ্ট শিল্পকেই (লার্জ্ স্কেল মেশিন ইণ্ডাস্ট্রীকে) ধনতন্ত্রের প্রারম্ভ হিসাবে নির্দ্ধারণ করেন। লক্ষ লক্ষ হস্তশিল্পের শ্রমিক, যাঁরা ব্যবসায়ীদের হয়ে তাদের সরবরাহিত উপাদান দিয়ে সাধারণ মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করেন তাঁরা কি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে নিযুক্ত নয়?"

তিনি দেখালেন, "যাঁরা বাজারের জন্য উৎপাদন করেন তাঁরা কেবল বাহ্যতই স্বাধীন। বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা (পাইকারী ব্যবসায়ী) খরিদদার পুঁজির কাছে কম দাসত্বের বাঁধনে বাঁধা নয়।"

এ দেশেও প্রথম বাইরের পুঁজির আক্রমণে ও শেষে দেশেরও বড় শিল্পের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যেটুকু কুটির-শিল্প স্বদেশী আন্দোলন বা তার পরেও টিকে ছিল তাদের অবস্থাও উপরে লেনিনের বর্ণিত রাশিয়ার হস্তশিল্পের মতোই। অর্দ্ধশতাব্দী ধরে গান্ধীজী চরখাকে পূজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারও অবস্থা ধনতান্ত্রিক সমাজে অন্য কিছু হবার ছিল না। পূর্বে এক প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি গান্ধীজীকেও স্বীকার করতে হয়েছে নিখিল ভারত কাটুনি সংঘের বা খাদি প্রচারকদের কাজ-কারবার ধনতন্ত্রের চরিত্রই গ্রহণ করেছিল।

লেনিন গ্রামজীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তুলনায় কৃষকের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে নারোদনিকদের বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আশ্চর্যের কথা তাদের এই বর্ণনার মধ্যে প্রতিটি গঞ্জ-বাজারে যে-সব ক্ষুদ্র উৎপীড়ক ব্যবসায়ী ছড়িয়ে আছে এবং তাদের যে-অত্যাচার অনাচার আছে তার কোনও

স্থান দেখা যায় না। লেনিনের ভাষায় রাশিয়ার তখনকার গ্রামের অবস্থা: "গ্রামের এই ক্ষুদ্র শোষকদের বিপুল সংখ্যা এক ভয়ঙ্কর শক্তির পরিচয় হিসাবে দেখা যায়। বিশেষভাবে ভয়ঙ্কর, কারণ, তারা বিচ্ছিন্ন এক একজন শ্রমজীবী মানুষকে নিপীড়ন করে। তারা ঐ মানুষকে নিজেদের শোষণের জালে বেঁধে ফেলে এবং মুক্তির সমস্ত আশা থেকে তাকে বঞ্চিত করে। আরও ভয়ঙ্কর এইজন্য যে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের উৎপাদনের নিম্নমানের জন্য ঐ বর্বর অবস্থায় থাকে তীব্র শোষণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার দৈন্যের জন্যও এইরূপ হয়। এতে শ্রমিকের উপর শুধু ডাকাতি হয় না। এশিয়ার স্বৈরাচারে মানুষের মানবীয় মর্যাদার যেরূপ লাঞ্ছনা ঘটে অবিচ্ছিন্নভাবে তাই দেখা যায়। এখন যদি গ্রামের এই বাস্তব অবস্থার সঙ্গে আমাদের পুঁজিতন্ত্রের তুলনা করা হয়, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা কেন পুঁজিতন্ত্রকে প্রগতি-শীল বলে তা বোঝা যাবে। এই পুঁজিতন্ত্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন বাজারগুলিকে টেনে যুক্ত করে জাতি-ব্যাপী বাজারে পরিণত করে। হাজার হাজার শুভার্থী রক্তপিপাসুদের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় পিতৃভূমির স্তম্ভ সৃষ্টি করে। শ্রমের সমাজিকী-করণ করে এবং তার উৎপাদন বৃদ্ধি করে। স্থানীয় রক্তপিপাসুদের নিকট শ্রমজীবী মানুষের অধীনতাকে ভেঙ্গে চুরে দেয় এবং তাকে লার্জ স্কেল ক্যাপিটাল তথা বড় পুঁজির অধীনস্থ করে। শ্রমজীবী মানুষের উপর অত্যাচারের ভীষণতা তাদের ক্রমাগত অবলুপ্ত, পাশবিক অবস্থায় নীত করা, নারীশিশুর দেহকে বিকল করে দেওয়া—এসব সত্ত্বেও তুলনায় শেষোক্ত অধীনতা প্রথমোক্ত অধীনতা অপেক্ষা প্রগতিশীল। কারণ, শ্রমিকের মনকে এ জাগরিত করে নির্বাক অসংলগ্ন অসন্তোষকে সচেতন প্রতিবাদে পরিণত করে। বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র, বুদ্ধিহীন বিদ্রোহগুলিকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত করে। এ একটা সংগ্রাম যার শক্তি লার্জ স্কেল ক্যাপিটা-লিইজমের (বড় পুঁজির) অস্তিত্বের অবস্থার মধ্যে থেকেই আসে। এবং সেই জন্য নিশ্চিত সাফল্যের প্রতিশ্রুতিও বহন করে।"

লেনিন মার্কস্ হতে এই উদ্ধৃতি পরিবেশন করেন: "(আমাদের) সমালোচনা যে-কাল্পনিক ফুল দিয়ে শিকল সাজানো ছিল তাই তুলে নিয়েছে—এই জন্য নয় যে মানুষ কাল্পনিক ভূষণে বঞ্চিত নগ্ন শৃঙ্খল পরিধান করুক। তুলে নিয়েছে এই জন্য যে সেই শৃঙ্খলকে ছুঁড়ে ফেলে মানুষ বাস্তব সজীব ফুলের জন্য হাত বাড়াবে।"

এই উক্তিটির উল্লেখ ক'রে লেনিন বললেন: "রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা আমাদের গ্রামদেশ থেকে কাল্পনিক ফুলের সাজ তুলে নিচ্ছে। কাল্পনিক স্বপ্নরচনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে........এজন্য নয় যে কৃষক জনগণ বর্তমানের নিপীড়ন, ক্রমোত্তর অবলুপ্তি এবং দাসত্বে নীত হওয়ার অবস্থার মধ্যে থেকে যাবে। এই জন্য করছে যাতে কী-ধরনের শৃঙ্খল সর্বত্র শ্রমজীবী মানুষকে বেঁধে রেখেছে এবং কেমন ক'রে সেই শৃঙ্খল তৈরী হয়েছে তা প্রলেতারিয়েত বুঝতে পারে ও তার বিরুদ্ধে জেগে উঠতে পারে এবং সেই শৃঙ্খল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাস্তব ফুলের জন্য হাত বাড়াতে পারে।"

পারিবারিক ভিটা

ধনতান্ত্রিক অবস্থায় গ্রামের পরিবেশকে স্বপ্নের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করার নানান চেষ্টার মধ্যে একটা ছিল শহরের শ্রমিকের "ছিন্নমূল" অবস্থার তুলনায় ভিটায় মরমী প্রেমিক গ্রামবাসীর সুখের জীবন দেখানো। এ দেশেও গান্ধী, পেটিবুর্জোয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি, সাহিত্যিক ও স্বদেশী আন্দোলনের নানান প্রচারকদের মধ্যে এইরূপ ধ্যান ধারণা এককালে খুবই প্রবল ছিল এবং বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে শ্রমজীবী মানুষের জ্ঞান উন্মেষের ফলে এখন তার শক্তি অনেক হ্রাস হলেও শ্রেণীশত্রুর বহুদিনের চর্চিত প্রচার-নিপুণতা ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বের ফলে এখনও তা অবলুপ্ত হয়নি।

এই প্রচারের এক অঙ্গ এই যে গ্রামে মানুষ সপরিবারে নিজের পারিবারিক ভিটায় বাস করত এবং ঘরে বসেই নানানরূপ উৎপাদন করত। শহরে হাজারে হাজারে জমায়েত হয়ে কদর্যভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

পূর্বে এক প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদের এই ধরনের তত্ত্ব সম্বন্ধে মার্কসের সমালোচনা আলোচনা করার সুযোগ লেখকের হয়েছিল। কুটির শিল্পের পক্ষে উক্ত মার্কিন লেখক বলেন, ঐ শিল্প—"পিতামাতা ও সন্তানদের নিকটতর ও ঘনিষ্ঠতর থাকা সম্ভব করে......আর বড় শিল্প পরিবারগুলিকে ভেঙে দিয়ে গ্রামগুলির ক্ষতি করে, বড় শহর তৈরী করে।"

লেনিন বলেছিলেন: "শহরের শ্রমিকদের 'দুর্নীতি (করাপশান্)' পেটিবুর্জোয়াকে ভীত করে। ঐ পেটিবুর্জোয়া পারিবারিক 'হেঁসেল' (তার

নীতিহীনতা এবং ষষ্টির নিষ্পেষণ শুদ্ধ ধরে নিয়েও)—তার প্রতিষ্ঠিত জীবন (নিষ্পেষণ, নিপীড়ন এবং বর্বরতা সত্ত্বেও)—পছন্দ করে।" একজন রুশ লেখক নিষ্পেষিত কৃষককে "বোঝা বওয়া পশু" আখ্যা দিয়েছিলেন। ঐ আখ্যায়ন উল্লেখ ক'রে লেনিন বলেন—"পেটিবুর্জোয়া 'বোঝা বওয়া পশুর মধ্যে' যে মানুষ সত্তাটি আছে তার জাগরণ মোটেই বুঝতে পারে না। এই জাগরণ এতই বৃহৎ এবং এতই তার যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য যে তার জন্ত সর্বপ্রকারের বড় ত্যাগ করা ন্যায্য। এইরূপ বিপুলত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে ধনতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে, বিশেষ করে রাশিয়ার অবস্থার মধ্যে ঐ জাগরণ ঝটিকাময় আবর্তের রূপে আবির্ভাব হয়।"

লেনিন এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের "হাউসিং কোশ্চেন (গৃহসমস্যা) পুস্তিকার উল্লেখ করেন। লেনিন উত্থাপিত বিষয়টি উত্থাপন করার পূর্ব বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বোঝার জন্য এঙ্গেলসকে কিছুটা অনুসরণ করা যাক্। এঙ্গেলস পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোবাদীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। উক্তিটি নিম্নরূপ :

"এই অতিপ্রশংসিত শতাব্দীর গোটা সংস্কৃতির উপর এর চেয়ে বড় ভয়ংকর বিদ্রূপ কিছু নাই যে এর বড় বড় শহরগুলিতে শতকরা ৯০ জন অধিবাসীর এমন কোনও জায়গা নাই যাকে তারা নিজেদের জায়গা বলতে পারে। এ কথা বলতে আমাদের দ্বিধা নাই। নৈতিক এবং পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হেঁসেল আর বাসঘর সামাজিক ঝড় উড়ে গেছে। এই বিষয়ে আমরা বর্বরদের চেয়ে নীচু। ট্রগলোডাইটের (গুহাবাসকারীর) ছিল গুহা, অষ্ট্রেলিয়ানের ছিল মাটির ঘর, ইণ্ডিয়ানের ছিল নিজের হেঁসেল; কিন্তু আধুনিক প্রলেতারিয়েত মধ্যাকাশে ঝুলে আছে।" এঙ্গেলস এই উক্তির উল্লেখ ক'রে বললেন : "এই শোকাবহ উপাখ্যানের মধ্যে প্রুধোবাদের গোটা প্রতিক্রিয়াশীল রূপটি পাচ্ছি। প্রলেতারিয়েত স্বরূপ আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণীকে সৃষ্টি করতে যে নাড়ির যোগে অতীতের শ্রমিককে জমির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল সেই নাড়ির যোগটি ছিন্ন করা একান্তই প্রয়োজন ছিল। হস্তচালিত তাঁতের তাঁতি, যার তাঁতসহ ছিল ছোট্ট একটা ঘর, বাগান আর জমি, যে শান্ত সন্তুষ্টচিত্ত মানুষ ছিল, সর্বপ্রকার দুর্দশা এবং রাজনৈতিক নিষ্পেষণ সত্ত্বেও সে ছিল 'ধর্মভীরু এবং সৎ।' ধনী, পুরোহিত এবং সরকারী আমলাদের কাছে সে মাথাটি ঝুঁকিয়ে টুপিটি খুলে নমস্কার করত এবং মনের ভিতরে ছিল সম্পূর্ণ দাস। নির্দিষ্ট ভাবে আধুনিক বড় শিল্পই পূর্বের ঐ জমিতে শিকল দিয়ে বাঁধা

শ্রমিককে সম্পূর্ণ সম্পত্তিহীন প্রোলেতারিয়ানে পরিণত করেছে, অতীতের সমস্ত বেড়ি থেকে মুক্ত করেছে—তাকে সামাজিক দিক দিয়ে সমাজের বিধি-নিষেধের আওতার বাইরে মুক্ত করে দিয়েছে। সঠিকভাবে এই অর্থনৈতিক বিপ্লবই সেই একমাত্র অবস্থা সৃষ্টি করেছে—যে-অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের সর্বশেষতম পর্যায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা যায়। আর এই সময় এসে উপস্থিত হলেন অশ্রু-সিক্ত প্রুধোবাদী। তিনি শ্রমিকদের হেঁসেল ও ঘর থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য এমন বিলাপ করতে লাগলেন যেন এটা তাদের বুদ্ধি ও মেধার মুক্তির পরিবর্তে পশ্চাৎ পদক্ষেপ হ'য়ে দাঁড়ালো।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যেমন ঘটেছিল (শ্রমিকশ্রেণীর হেঁসেল আর ঘর থেকে বিতাড়িত হওয়ার এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি) সাতাশ বৎসর পূর্বে আমার 'ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' পুস্তকে বিবৃত করেছিলাম। এই কাজে জমি এবং কারখানার মালিকেরা যে অপকর্ম ও অপযশের জন্য দায়ী এবং ঐ বহিষ্কারকরণ, শ্রমিকদের যা অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিসাধন করেছিল তার যথোচিত বর্ণনা আমি সেই পুস্তকে দিয়েছি। কিন্তু এই ঘটনা যা ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিতান্ত আবশ্যিক স্তর, তাকে বর্বরতার চেয়েও পশ্চাৎপদ পদক্ষেপ মনে করা—এ কথা কি আমার মাথায় ঢুকতে পারতো? অসম্ভব! ১৮৭২ সালের ইংলণ্ডের প্রোলেতারিয়ান ১৭৭১ সালের "হেঁসেল আর ঘরের" মালিক গ্রাম্য তাঁতীর চেয়ে অন্তহীন পরিমাপে উচ্চ স্তরের। এবং গুহাবাসী সেই ট্রগোলাইট, মাটির ঘরের সেই অস্ট্রেলিয়ান এবং হেঁসেলের অধিকারী সেই ইণ্ডিয়ান কি জুন অভ্যুত্থান কিংবা প্যারিস কমিউন অনুষ্ঠিত করতে পারবে?"

লেনিন বলছেন: "ঐ পুস্তকে এঙ্গেলস জার্মান শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পশ্চিম ইউরোপের অন্য কোনও দেশে এত সংখ্যায় শ্রমিকশ্রেণী নেই যাদের একটা বাগান কিংবা জমি আছে—যেমন জার্মানীতে আছে। এঙ্গেলসের ভাষায়—শাক-সব্জীর বাগানের সঙ্গে পরিচালিত গ্রামের কুটির শিল্প জার্মানীর নতুন লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রীর (বড় শিল্পের) প্রশস্ত ভিত্তি। জার্মানীর ছোট কৃষকের বর্তমান দৈন্যের সঙ্গে কুটিরশিল্প বাড়তে থাকে (যেমন রাশিয়াতেও হয়, আমরা যোগ দিতে পারি)। কিন্তু শিল্প ও কৃষির এই মিলন কুটিরশিল্পের উৎপাদকের সচ্ছলতার ভিত্তি হয় না, হয় অধিকতর দুর্দশার ভিত্তি। নিজের আবাস-স্থল অঞ্চলের

একাকার বন্ধনে বাঁধা থাকার কারণে সে যে কোনও মূল্য মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য পুঁজিপতিকে শুধু উদ্বৃত্ত মূল্য নয়, এমন কি মজুরীর এক বৃহৎ অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।"

ভারতবর্ষে বহুঘোষিত কুটিরশিল্পগুলি এবং তাতে একাধারে ধনীদের শোষণের ব্যবস্থা এবং অন্যাধারে মজুরীর স্বল্পতায় ঠিক উপরে বর্ণিত অবস্থার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সারা বিশ্বে পেটিবুর্জোয়ার প্রচলিত অতি পুরাতন কথাগুলি এখানে চর্বিত চর্বণ ভাবে গান্ধীজী কর্তৃক অর্ধশতাব্দী ধরে পরিবেশিত হওয়ায় সরকারের কিছু বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট দপ্তরের উদ্ভব হয়েছে। এতে প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জী, প্রফুল্ল ঘোষ, সুশীল ধাড়া প্রমুখ ব্যক্তিগণের বন্ধুবান্ধবদের কিছু সুরাহা হয়েছে। এই দপ্তরগুলি আবার দুর্নীতি পরায়ণ আমলা, ব্যবসায়ী ও কিছু গান্ধীবাদী রাজনীতিকেদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গান্ধীবাদ প্রচারকদের লালিত এই ধরনের বিশেষ দুর্নীতি অবশ্য এখানে প্রধান আলোচ্য নয়। তত্ত্বের দিক দিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন কর্তৃক উদ্ঘাটিত সে-সব অসঙ্গতিই এখানে আলোচ্য।

বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থাপিত করার সময় দেখা যায় নারী ও শিশুর দুর্দশার কাহিনী একটা সুবিধাজনক ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের সভ্যতাকে বিদ্রূপ করে গান্ধীজী বলছেন: "মেয়েরা যারা গার্হস্থ্য জীবনের রাণী হওয়া উচিত তারা রাস্তায় ঘুরছে কিংবা তারা কলকারখানায় দাসত্ব করছে। সামান্য মুষ্টিভিক্ষার জন্য পাঁচলক্ষ মেয়ে একমাত্র ইংলণ্ডেই কলকারখানা বা ঐ রকম প্রতিষ্ঠান সমূহে কষ্টকর অবস্থায় কাজকর্ম করছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দৈনিক বর্তমান মেয়েদের ভোটের অধিকার দাবীর আন্দোলনের অন্যতম কারণ।" (হিন্দ স্বরাজ, ১৯০৮)

পাঠক লক্ষ্য করবেন, গান্ধীজীর অভিযোগ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়। তাঁর অভিযোগ শ্রমজীবী নারীর উপর। প্রথম অভিযোগ ঘর ছেড়ে কাজে বের হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় অভিযোগ, রাজনৈতিক দাবী উচ্চারণ করার জন্য ভোটের অধিকার দাবী করার জন্য।

লেনিন শ্রমজীবী নারীদের সম্বন্ধে বলছেন: "বুর্জোয়ারা একচেটিয়া কারবার ট্রাস্ট প্রভৃতির গঠন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। তারা মেয়েদের ও শিশুদের কারখানায় ধাবিত করে, দুর্নীতি এবং দুর্দশায় নিক্ষেপ করে এবং তাদের উপর চূড়ান্ত দারিদ্র্যের দণ্ড আরোপ করে। আমরা এইরূপ

উন্নয়ন দাবী করি না, সমর্থনও করি না। আমরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আমরা ব্যাখ্যা করি ট্রাস্ট এবং মেয়েদের কারখানায় কাজে লাগানো উন্নতিশীল। আমরা কুটিরশিল্পে একচেটিয়া স্তরের পূর্বযুগের ধনতন্ত্রে মেয়েদের গার্হস্থ্য কঠোর পরিশ্রমে ফিরে যেতে চাই না। এগিয়ে চল—ট্রাস্ট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এবং তারও পরে সমাজতন্ত্রের দিকে!" ('প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের মিলিটারি প্রোগ্রাম'—লেনিন, সেপ্টেম্বর, ১৯.৬)

গ্রামশিল্পের প্রচার, শ্রমিকের পারিবারিক ভিটার প্রতি মমতার ভণিতা এবং নারী-শিশুর কল্যাণের অসার (এমন কি কপট) দরদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে মার্কসীয় নীতির ব্যাখ্যা লেনিনের উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত উক্তি পরিষ্কার করে দেয়।

তিন পর্যায়

নারোদনিকদের আন্দোলনের শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে যা তার পরিণতি হয়েছিল এ সম্বন্ধে লেনিন-স্তালিনের বিভিন্ন লেখায় আলোচনা আছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৭০-এর দিকে যে-আন্দোলন আরম্ভ হয়, সে সম্বন্ধে লেনিন মার্কসবাদীদের উপর আরোপিত অশ্রদ্ধার অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বরং অভিযোগ করেন যে, তাদের নাম নিয়ে শতাব্দীর শেষেও যারা সব প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করছে তারা প্রথমের ঐ যোদ্ধাদের নাম কলঙ্কিত করেছে।

প্রথম রুশ সোস্থালিস্টরা তাদের দেশের গ্রামগুলির ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনে কৃষকের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিল। এঁদের ধ্যান ধারণা পরিষ্কার ছিল না, কাব্যময় এক আদর্শে তাঁরা নিজেদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। "এই কাজ শত শত মানুষকে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনায় অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করেছিল।" অব্যবহিত পরের স্তরে যারা প্রাথমিক প্রয়াসে বিফল হয়ে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করলেন তাঁদেরও নীতি ভুল হলেও তাঁদের সংগ্রাম এবং সংগ্রামে আত্মদান প্রশংসিত হয়েছে। লেনিনের ভাষায়: "তাঁরা চূড়ান্ত আত্মত্যাগের নিদর্শন উপস্থিত করলেন এবং নিজেদের সন্ত্রাসবাদের পদ্ধতির দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত

করলেন। সন্দেহ নাই তাঁদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। কারণ, নিশ্চয়ই তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রুশ জনগণকে পরের দিকে বিপ্লবী গড়নে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তাঁরা তাঁদের আশু লক্ষ্য সাধনে—জনপ্রিয় বিপ্লবের জাগরণে সার্থক হননি।" পরের যুগে এঁদের নাম নিয়ে যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিরোধিতা করতেন—তাঁদের লেনিন জিজ্ঞাসা করেছেন: "তোমাদের সে বিশ্বাস কোথায় উবে গেছে?"

বস্তুতঃ প্রথমদিকেই তাঁদের গ্রাম সম্বন্ধে ধারণা ভুল ছিল। গ্রামকে অবলম্বন করে যে অলীক স্বপ্ন তাঁরা রচনা করেছিলেন, বাস্তব গ্রাম তা ছিল না। অত্যাচারী, নিপীড়নকারী—সবই ছিল। তবে তাঁরা এসব আকস্মিক মনে করেছিলেন। তাঁরা বলতেন এরা সব স্বার্থান্বেষী লোক, স্বার্থের সন্ধানে শোষণ প্রবৃত্তির দ্বারা ধাবিত হয়ে গ্রাম্য লোককে পরিণত হয়েছে। কল্পিত লক্ষ্য সাধনের পর এদের অপসারণ করা যাবে।

লেনিন দেখালেন—বিষয়টি মোটেই এইরূপ নয়। এই ধূর্তামি ও চালাকি করে যারা গুছিয়ে নেয় তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগালেই হয়। কিন্তু এ ধূর্তামী ও চালাকির ব্যাপার নয়। ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের পর ধনতন্ত্রে রূপায়নের গতিবৃদ্ধি হলো এবং গ্রামজীবনে শ্রেণীভেদ দেখা দিতে আরম্ভ করল। এ পুলিস দিয়ে দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন নয়। একটা শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর একটা শ্রেণীর প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের অগ্রগতি ও প্রলেতারিয়েতের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে হবে। প্রলিতারিয়েতই সেই আকাঙ্ক্ষিত শ্রেণী যারা বিপ্লব সাধন করবে।

শেষের দিকে যাঁরা গ্রামসমাজ ও কুটিরশিল্প নিয়ে মাতামাতি করতেন তাঁরা কুলাকের তথা ধনী কৃষকদের সেবকে পরিণত হয়েছিলেন। রাশিয়ার পশ্চাৎপদতার এঁরা স্তুতি করতেন এবং কাজের বেলায় ধনীচাষীদের সেবার জন্য সরকার কর্তৃক সার বীজ সরবরাহ, ঋণদান, সমবায় প্রভৃতি আন্দোলন, তাদেরই ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য কিছু বুদ্ধিজীবীদের সেবা-ধর্মে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি কাজের জয়গান করতেন। লেনিন এর আসল চরিত্র খুলে দিলেন। সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বললেন—সংস্কার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি চায় না তা নয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক হওয়া চাই। লেনিনের ভাষায়: "বুর্জোয়া উন্নয়নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারগুলিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এ নয়

যে আংশিক সংস্কার সম্পূর্ণ বাতিল করা। মার্কসবাদীরা এ কথা অস্বীকার করে না যে এইসব উপায়গুলি গৃহীত হলে কিছু (যদিচ খুবই অকিঞ্চিৎকর) উপকার হয়। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে কিছু (যদিচ খুবই অকিঞ্চিৎকর) উন্নতিও হয়। পুঁজির পশ্চাৎপদ চরিত্রগুলি যথা রক্তচোষা সুদখোরি, ঋণবন্ধনের দাসত্ব প্রভৃতির অবলুপ্তিকে এই সব সংস্কার ত্বরান্বিত করে। ঐগুলির আধুনিক এবং মানবোচিত ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রের পদ্ধতিতে রূপান্তর ত্বরান্বিত করে। এইজন্য মার্কসবাদীদের কেউ যদি ঐসব উপায়গুলি গৃহীত হওয়া উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করে, তাঁরা বলবেন নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই সব সংস্কারের দ্বারা উন্নতি হবে তার সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিয়ে বলবেন। সংস্কারের প্রশ্নে তাঁদের উপরোক্তভাবে সম্মতিদানের পিছনে যে উদ্দেশ্য তা তাঁরা বলবেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি—যাতে ত্বরান্বিত হবে তার পতন।"

স্তালিনের "সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে" প্লেখানভ ও লেনিন কর্তৃক মার্কসবাদীদের তরফ হতে নারোদনিকদের আন্দোলনের ক্ষতিকর ফলের বর্ণনা ও সমালোচনা আছে। "জারতন্ত্রকে লড়ার জন্য নারোদনিকরা যে পদ্ধতি নির্বাচন করেছিলেন অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষকে গোপনে হত্যা, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ তা ছিল ভুল এবং বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের ভিত ছিল এক ভ্রমাত্মক ধারণা যে একদিকে থাকবে সক্রিয় 'বীর' এবং অন্যদিকে 'নিষ্ক্রিয়' জনসাধারণ—শেষোক্তরা প্রথমোক্ত ঐ বীরদের বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রতীক্ষা করবে। এই ভিত্তিহীন মতবাদ এই ধারণা পোষণ করতে যে অসাধারণ ব্যক্তিরাই ইতিহাস সৃষ্টি করে। অন্যদিকে জনগণ, সাধারণ শ্রেণী যাদের নারোদনিক লেখকরা ঘৃণার সঙ্গে 'মব' বলতো—সচেতন সংগঠিত কাজে ঐ মতানুযায়ী ছিল অক্ষম। জনগণের কাজ হবে শুধু ঐ বীরদের অন্ধভাবে অনুসরণ। এইজন্য নারোদনিকরা কৃষকদের মধ্যে ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গণ-বিপ্লবের কাজ কর্ম ত্যাগ করলেন এবং ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করলেন। সে সময়কার একজন সর্বোচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন বিপ্লবী স্টিফান খাল্টুরিনকে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিপ্লবী ইউনিয়ন সংগঠনের কাজ পরিত্যাগ ক'রে সন্ত্রাসবাদের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে প্ররোচিত করতে সমর্থ হয়।

শোষকশ্রেণীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদের গোপন হত্যা—যে গোপন হত্যায় বিপ্লবের কোনও উপকার নাই—শ্রমিকশ্রেণীর মনোযোগ গোটা শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিক্ষিপ্ত করে। এই পথ শ্রমিক ও কৃষকের স্বতন্ত্র উদ্যোগ এবং সক্রিয়তার উন্মোচনে বাধা দেয়।

"নারোদনিকরা শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বিপ্লবে তাঁদের নেতৃত্বের ভূমিকা বুঝতে বাধা দেয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র নিজস্ব বিপ্লবী দল গঠনকে রুখতে থাকে।

"জারতন্ত্র নারোদনিকদের গোপন সংগঠন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল, তা হলেও বিপ্লবের মনোভাব বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকখানি পর্যন্ত নারোদনিক মতবাদ টিকে থাকে। যে নারোদনিকরা টিকেছিলেন তারা রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রসারকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিতে থাকলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন তৈরীর কাজকে বিঘ্নিত করতে লাগলেন।

"নারোদনায়া ভলয়া দলকে দমন করার পর তাদের অধিকাংশ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম বর্জন করে এবং তার সঙ্গে মিলন ও সমঝওতারনীতি প্রচার করতে আরম্ভ করে। ১৮৮০ দশক এবং ১৮৯০ দশকে তারা কুলাকদের স্বার্থের প্রচার করতে থাকে।"

কাজেই "রাশিয়ার মার্কসবাদকে কেবল নারোদবাদের সঙ্গে লড়াই করেই বৃদ্ধিলাভ ও শক্তিলাভ করতে হয়।"

সেই জন্যই প্রথমে প্লেখানভকে এবং লেনিনকে নারোদবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে হয়েছিল।

জনগণের প্রতি প্রীতি

যাঁরা এই ভাবে কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে প্রচার করেন—তাঁদের জন্য লেনিন বললেন—এঁরা রাশিয়ার ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীর স্বার্থের প্রতিনিধি। "জনগণের প্রতি ভালবাসা ও মানবতাবোধ—ক্ষুদ্র উৎপাদক নিজে যে-উৎপীড়ন ভোগ করে তা হতে উদ্ভূত। পশ্চিম ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি ও আধুনিক শিল্পের যন্ত্রবিদ্যা আমদানী হয়ে তার উৎপাদন ও ব্যবসাকে সঙ্কটাপন্ন করছে। এই জন্য তার আপত্তি। অন্যদিকে সম্পত্তিহীনের পর্যায়ে নেমে প্রোলেতারিয়েতে পরিণত হবে সেও সে চায় না। সেই জন্য সে নিজের অবস্থা আঁকড়ে থাকতে চায় আর তার নিজের ক্ষুদ্র সম্পত্তিকে রক্ষা করতে চায়, যা ইতিহাসের গতিতে শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়।

"কাজেই তার প্রতিনিধি যে বুদ্ধিজীবী সে সবদাই ভিন্ন একপথ খুঁজতে থাকে। মনে করে রাশিয়াতে চেষ্টা করলে ধনতন্ত্রকে এড়ানো সম্ভব হবে। এবং সেইজন্যই কুটির শিল্পের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে থাকে।"

লেনিন বলেছেন—"রুশ বুর্জোয়াজী এ সব বক্তৃতা শোনে কিন্তু উপকথার বিড়ালের মতো সে সব কাহিনী শুনে যায় এবং এদিকে যা খাবার তা খেয়েও যায়।"

আমাদের দেশেও এই অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখানে গান্ধীই হন আর যেই হন তাঁরা ক্ষুদ্র উৎপাদকের প্রতিনিধি নন। তাঁরা বড় বুর্জোয়ারই প্রতিনিধি-যদিচ তাঁদের ভাষা ও বক্তব্য ক্ষুদ্র উৎপাদকের বক্তব্য হিসাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়।

বস্তুতঃ গান্ধীজীর লেখা বক্তৃতাদিতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি বৃহৎ শিল্পেরই প্রতিনিধি থেকেছেন, যদিচ নানান কথার হেঁয়ালীর মধ্যে এই ভূমিকা অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। মার্কস্ দেখিয়েছিলেন, কুটির শিল্পের জন্য যারা বেশী করে বলে তাদের আসল বাসনা থাকে বৃহৎ শিল্পের জন্য সংরক্ষণ শুল্ক। এবং তার সাহায্যে ঘটে বৃহৎ শিল্পের প্রসার। ভারতের ক্ষেত্রে মার্কসের এই বক্তব্য কেমন সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাও ঐ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে। বলা বাহুল্য ভারতের শিল্পপতিরাও খাদিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টার অর্থ ঐ কথাই বুঝতেন। "আমরা খাদিকে জনপ্রিয় করতে পারি এবং সংরক্ষণ শুল্ক দ্বারা বৃটিশ পণ্যের বয়কটকে সুনিশ্চিত করতে পারি।" (ঘনশ্যামদাস বিড়লা কর্তৃক গান্ধীজীকে লিখিত পত্র, ১১ই জুন, ১৯২৪—বিড়লার পুস্তক "ইন দি শ্যাডো অব দি মহাত্মা")

উদ্ধৃত পুস্তকে দেখা যায় বিড়লা নথিপত্র দিয়ে দেখিয়েছেন তিনি গান্ধীজীর কাটুনি সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহায়ক ছিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছেন, বিড়লা যদিও গান্ধীজীর (উপরোক্তরূপ) অর্থনৈতিক কার্যসূচিগুলির সঙ্গে একমত ছিলেন না তা হলেও কোনও সঙ্কোচের ভাব না রেখে নিঃসঙ্কোচে গান্ধীজীর ঐ সব আশ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে গেছেন। আসলে অর্থনৈতিক কার্যসূচিতেও কোথায় পরোক্ষভাবে মিল থেকেছে তাও আমরা উপরে বিড়লার পত্র হতে উদ্ধৃত উক্তিতে দেখেছি। স্বদেশী প্রচারের ফলে বৃহৎ শিল্প কিরূপ উপকৃত হয়, এই প্রবন্ধের গোড়াতেই গান্ধীজীর স্বীকৃতির মধ্যেও আমরা তা দেখেছি। বাস্তব ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ

বৃহৎ শিল্পেরই সহায়ক। নারোদবাদও শেষে এই পর্যায়েই পৌঁছেছিল। কিন্তু গান্ধীবাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ঐ একই পর্যায়। ভারতে গান্ধীবাদের প্রভাবের ফলে কি ক্ষতি হয়েছে তা আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। কাজেই রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের তথা লেনিনকে কেন নারোদবাদের বিরুদ্ধে এত কঠোর ভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, আমরা সহজেই বুঝব।

আসলে গান্ধীজীর প্রোগ্রাম শ্রেণীসংগ্রামকে প্রতিহত করার প্রোগ্রাম এবং সে প্রোগ্রামে বিড়লার সঙ্গে গান্ধীজীর কোনও অমিল থাকার কথা নয়। গান্ধীজী সাক্ষাৎ ভাবে ঘোষণাই করে গেছেন যে তিনি শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী এবং ধনিক ও জমিদারদের উচ্ছেদ করার বিপক্ষে।

তাহলে তাঁর এই কুটির শিল্পের বক্তৃতার মূল্য কি? আমরা উপরে দেখছি নারোদনিকদের ঐ রকম বক্তৃতা এবং সেই বক্তৃতায় রুশ বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন—গল্পের বিড়ালের মতো রুশ বুর্জোয়া ঐ বক্তৃতা শোনে, অন্যদিকে তার যেটা কাজ সে করে যায় এবং যা খাবার তা খেয়ে যায়।

নারোদনিকদের জন্য লেনিন বলেছিলেন তারা পণ্য-বিশিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামো চায় ধনতন্ত্র বাদ দিয়ে—তারা অন্য কিছু চায় না, কেবল চায় সদয় মহানুভব জমিদার এবং উদার শাসকদের পক্ষপুটে শান্তিতে গাছপালার মতো পালিত হয়ে কাটিয়ে দেওয়া। গান্ধীজীর ট্রাস্টীশিপের বক্তব্যও তাই। ধনীরা এবং জমিদাররা ট্রাস্টি হয়ে থাকবে এবং শ্রমিক ও প্রজাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে যাবে। গান্ধীদের ভাবা ও বক্তব্যের বাস্তব ফল (এবং হেতুও) ছিল কৃষকসহ বিশাল সংখ্যার ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের বিপ্লবের সহায়তার পথ থেকে সরিয়ে বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত করা। শ্রমিকশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীর যে-অংশ শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু হওয়া সম্ভব তাদেরও বিভ্রান্ত এবং বিচলিত করা।

গান্ধীজী ঃ ১৯২০-২২ সালের আন্দোলনের পরিসমাপ্তি

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের 'বেণু' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন : "রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—The programme of the charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it. (মর্মার্থ, চরখার কার্য্যসূচী শিশুসুলভ ; অথচ সমস্ত দেশকে এতেই ভুলানো গেল দেখে হতাশ হতে হয়")

"সেদিন কেন যে কবি এত বড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই—প্রায় তেমনিই অক্ষয় হইয়া আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, খবরের কাজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়।"

অবশ্য শরৎচন্দ্র যখন এ কথা লিখেছেন, তখন তাঁর হয়তো গান্ধীজীর তত্ত্ব সম্বন্ধে মোহ মুক্তি ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের কাম্য সেই বুদ্ধি মুক্ত ঘটেছে। বরং বিশ্বাস করার কারণ আছে, তখন প্রাচীন বিভেদ ও সংকীর্ণতার প্রতিক্রিয়া তাঁকেও আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে। সে অবশ্য পৃথক আলোচ্য বিষয়।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর নিজেরই কি কম মোহ ছিল? ঐ সময় অর্থাৎ ৭ বৎসর পূর্বে ১৩২৯-এর বৈশাখে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর তিনি লিখলেন : "মহাত্মাজী আজ রাজার বন্দী। ভারতবাসীর পক্ষে এ সংবাদ যে কী সে কেবল ভারতবাসীই জানে। তবুও সমস্ত দেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দেশব্যাপী কঠোর হরতাল হইল না, শোকোন্মত্ত নরনারী পথে বাহির হইয়া পড়িল না, লক্ষ কোটি সভাসমিতিতে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতে কেহ আসিল না—যেন কোথাও কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই—যেমন কাল ছিল, আজও সমস্তই ঠিক তেমনি আছে, কোনও খানে একটি তিল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয় নাই—এমনি ভাবে আসমুদ্র হিমাচল নীরব হইয়া আছে।" (নারায়ণ—বৈশাখ, ১৩২৯)

এইরূপ বর্ণনা করেও এর কারণ নির্ণয় ক'রে তিনি ঘোষণা করলেন "যাইবার পূর্বাহ্নে মহাত্মাজী অনুরোধ করিয়া গেছেন তাঁহার জন্ম কোথাও কোনও হরতাল, কোনরূপ প্রতিবাদ সভা, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমাত্র আক্ষেপ যেন উত্থিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন আদেশ। কিন্তু সমস্ত দেশ তাঁহার সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে।" (উদ্ধৃত প্রবন্ধ)

মোহগ্রস্ত শিশু ব্যতীত অন্তের কাছে কথাটা কি ঠিক? দেশব্যাপী এই নীরবতা কি গান্ধীজীর নির্দেশের জন্ম? তাই যদি হয় তবে, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার কাল ১৯১৯ এর এপ্রিলে তো সেরূপ হয়নি। তখনও তো গান্ধীজীর অনুরূপ নির্দেশই ছিল।

রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ১৯১৯এর ৩০শে মার্চ দিল্লীতে পুলিশের অনাচারের প্রতিবাদে জনসাধারণ বিক্ষোভ দেখায়। তখন পুলিশ জনসাধারণের ওপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলীতে দিল্লী রেল স্টেশনে পাঁচজন শহীদ হন। আরও অনেকে আহত হন। গান্ধীজী এই সম্বন্ধে ৩রা এপ্রিল কে. আর. আয়েঙ্গারকে এক পত্রে "জনসাধারণের এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। বললেন নিজেদের আমন্ত্রিত আঘাতের বিরুদ্ধে চীৎকার করার কোনও অধিকার আমাদের নাই।" রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং উত্তেজনা তখন সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। দিল্লীর উপরোক্ত ঘটনার পর গান্ধীজী ৮ই এপ্রিল দিল্লী রওয়ানা হলেন। তার পূর্বেই কর্মীদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে নিষেধ করে তিনি বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন: "ন্যায্যভাবে বা অন্যায্যভাবে যেভাবেই লোকে গ্রেপ্তার হোক, সত্যাগ্রহীরা তাদের জোর করে মুক্তি আদায়ের দাবী করতে পারেন না। সত্যাগ্রহীদের কর্তব্য হচ্ছে কোনও রকম নড়চড় না করে ম্যাজিস্ট্রেটদের হুকুম মান্ত করা...আশা করি পরের রবিবার (৬ই এপ্রিল, ১৯১৯-এ নির্ধারিত রাউলাট বিল বিরোধী প্রতিবাদ দিবস—প্রবন্ধ লেখক) সব বক্তৃতা, উত্তেজনা, ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ থেকে মুক্ত থাকবে।" (বোম্বে ক্রনিক্‌ল, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৯)

নিজে গ্রেপ্তার হবার প্রাক্‌কালে তিনি আর এক বিবৃতি দিলেন। ৯ই এপ্রিল তা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হলো। বললেন: "এখন আমরা যে কোনও মুহূর্তে গ্রেপ্তার হতে পারি। সুতরাং স্মরণ রাখা দরকার কেউ যদি গ্রেপ্তার হন, কোনও রূপ অসুবিধা সৃষ্টি না করে তিনি যেন নিজেকে গ্রেপ্তার হতে দেন আর যদি কোর্টে হাজিরা দিতে হয়, তিনি তা করবেন। বাকী যাঁরা থাকলেন

তাঁরা ঐ গ্রেপ্তার আর বন্দী করে রাখায় যেন কোনরূপ বিক্ষোভ প্রকাশ না করেন।" (বোম্বে ক্রনিকল, এপ্রিল ৯, ১৯১৯)। আগেই বলছি গান্ধীজী ৮ই এপ্রিল দিল্লীর পথে রওনা হয়েছিলেন। "পথে তাঁর উপর এক অর্ডার সার্ভ করা হলো। পাঞ্জাব কিংবা দিল্লী প্রবেশ করতে নিষেধ করা হলো। তিনি ঐ অর্ডার মানতে অস্বীকার করায়, পালভেল নামক পথ মধ্যবর্তী এক স্টেশনে গ্রেপ্তার ক'রে এক স্পেশ্যাল ট্রেনে তাঁকে বোম্বাইএ ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এই গ্রেপ্তারের সংবাদে আহমদাবাদে গোলযোগ হলো। কয়েকজন ইংরাজ এবং ভারতীয় অফিসার নিহত হলো। ১২ই এপ্রিল বিরামগ্রাম ও নাদিয়াদেও কিছু গোলমালের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হলো। তেমনই কলকাতায় গণ্ডগোলের ফলে পুলিশের গুলিতে পাঁচ ছয়জন নিহত হলেন এবং বারোজন আহত হলেন।......" (পট্টভি সীতারামায়ার : কংগ্রেসের ইতিহাস, ১৯৩৫ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭৮)। ঐ সময় অবশ্য গান্ধীজীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার হবার অব্যবহিত পর মুহূর্তে মহাদেব দেশাইকে ডিকটেট করে তিনি এক বিবৃতি দেন এবং তাঁর নিজের গ্রেপ্তারে যেন দেশবাসী কোনরূপ বিক্ষোভ প্রকাশ না করেন, ঐ অনুরোধ করেন। (হিন্দু এপ্রিল ১০, ১৯১৯)। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চতুর্দিকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১০ই এপ্রিল অমৃতসরে ডাঃ সায়ফুদ্দিন কিচলু এবং ডাঃ সত্য পালকে গ্রেপ্তারের পর পাঞ্জাবে জনসাধারণের বিক্ষোভ তীব্রতা ও ব্যাপ্তিতে কিরূপ স্তরে উঠে পড়ে, তৎকালীন পাঞ্জাব ও জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রভৃতির মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর বিবরণে তা সুপরিচিত।

সুতরাং গান্ধীজীর নির্দেশেই গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে দেশব্যাপী এই নীরবতা—এ তথ্য সঠিক নয়।

অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করার পরও গান্ধীজী এবং তৎসহ অন্যান্য বুর্জোয়া নেতারা রাস টেনে যাচ্ছিলেন এবং বিরতিহীনভাবে একদিকে জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে নিন্দা ক'রে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সমঝওতার চেষ্টায় ভালভাবেই সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। এইরূপে কলকাতায় ১৯২১ এর ডিসেম্বরে পর্দার আড়ালে বড়লাটের সঙ্গে হিন্দুমহাসভার নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের মাধ্যমে আলাপ আলোচনা চলে। জানুয়ারীর মধ্যভাগে বোম্বাই-এ অনুরূপ উদ্দেশ্যে স্যার শঙ্করণ নায়ার, স্যার বিশ্বেশ্বরায়া প্রমুখের উদ্যোগে তিন শতাধিক মডারেট ও অন্যান্য মতবাদের রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলন হয়। গান্ধীজীও এই সম্মেলনে নিজে

সাক্ষাৎ অংশ গ্রহণ করেন এবং কিভাবে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটানো যায় তার প্রস্তাব দেন। সংগ্রামকে প্রশমিত ও বিধ্বস্ত করার জন্য বুর্জোয়া প্রয়াস তখন সফল হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ তখন বুর্জোয়া নেতৃত্বের দৌড় বুঝে নিয়েছে এবং আশাহত জনসাধারণের মধ্যে তাদের নেতৃত্বের দুর্বলতাও ধরে ফেলেছে। সুতরাং বুর্জোয়াজী মুখরক্ষার গরজও তখন সাম্রাজ্যবাদের নাই। তাই 'মুখরক্ষার' জন্য আনুষ্ঠানিক কিছু ঘোষণা সাম্রাজ্যবাদের নিকট হতে পাওয়া গেল না। (অবশ্য পরে বিদেশী বস্ত্রের পর শুল্ক ইত্যাদি এবং অন্যান্য কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বুর্জোয়াজীকে কিছু রুটির টুকরো সাম্রাজ্যবাদ ছুড়ে দিয়ে সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট করেছিল।)

ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনে অসহযোগ আন্দোলনকে প্রসারিত করার জন্য দেশবাসীর দাবী গান্ধীজী (নিজের পরিচালনায় সামান্য একটি স্থানের ছাড়া) সর্বত্র অস্বীকার করলেন।

ইতোমধ্যে ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২-এ উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরায় জনসাধারণ নির্যাতনকারী পুলিশকে আক্রমণ করল, থানায় আগুন ধরিয়ে দিল এবং কয়েকজন পুলিশ নিহত হলো।

ব্যস, আর যায় কোথায়! বুর্জোয়াজীর পশ্চাদপসরণের রাস্তা খোলসা হয়ে গেল। জনসাধারণের উপর হিংসার অভিযোগ চাপিয়ে আন্দোলনে প্রত্যাহৃত হলো। গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারমূলক ঘোষণা বজ্রাঘাতের মতো সমস্ত দেশের সংগ্রামী মানুষের মাথায় বর্ষিত হলো। যতটুকু বা সংগঠিত শক্তি তখনও জেগে ছিল তা এই আঘাতে আর টিকতে পারল না। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এবং পরে ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারমূলক ঘোষণা অনুমোদিত হলো।

এর পর আসছে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার। গান্ধীজীর একান্ত ভক্ত গান্ধীবাদী নেতা ডাঃ পট্টভি সীতারামায়ার লেখনী প্রসূত বিবরণই ভাল: "ঘুঁটির দান ফেলা হ'য়ে গিয়েছিল। এবার গভর্নমেন্টের পালা। তাঁরা গান্ধীর উপর থাবা মারল। কোনও শাসন ব্যবস্থাই দেশের কোনও নেতার জনপ্রিয়তার উচ্চতম পর্যায়ের মুহূর্তকে তাঁকে আক্রমণ করার যথার্থ সময় হিসাবে বিবেচনা করেনা। তা যথার্থ সময়ের জন্য ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করে। যখন এক সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে তখনই শত্রু নেকড়ে বাঘ ঝাঁপিয়ে

পড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০ই মার্চ, ১৯২২-এ গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন…।" (পট্টভি সীতারামায়া: কংগ্রেসের ইতিহাস, ১৯৩৫ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪১)

কাজেই গান্ধীজীর এইবারের গ্রেপ্তারের পর দেশবাসীর নীরবতার প্রকৃত কারণ উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে, শরৎচন্দ্রের বক্তব্যে নয়।

এর সাত বছর পর আলোচিত আশাহত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধের একাংশ উদ্ধৃত করে শুরু করেছিলাম। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তাঁর ঐ প্রবন্ধ লেখা। অতীতে বার বার বুর্জোয়াজী কিভাবে দেশকে আশাহত করে দেশপ্রেমিকের বুকে ব্যথা দিয়েছে এবং কিভাবে শেষোক্তের বুক থেকে সেই ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে তার নিদর্শন হিসাবে শরৎচন্দ্রের উপরোক্ত প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটি পুনরাবৃত্তি করছি।

শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন: "শুনিয়াছি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে এবার নেহরু রিপোর্ট পাশ হইয়াছে। বহুবিধ ছলচাতুরি পূর্বক সেই আরজি অবশেষে বিলাতী পার্লামেন্ট পেশ করা হইয়াছে। আশা তো ছিলই না, তবে সে দেশের পার্লামেন্ট নাকি এবার মেয়েদের হুকুমে তৈরী; সুতরাং এখন তাহারাই এক-প্রকার ভারতের ভাগ্যাবধাতা। প্রবাদ, মেয়েরা দয়াময়ী, এবার তারা যদি এদেশের দুর্ভাগা পুরুষদের কিছু দয়া করে। আমেন! ইতি……"

গান্ধীজী ঃ কিছু তত্ত্বের আলোচনা

অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বের একজন কংগ্রেস নেতা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, একদিন একসঙ্গে থাকার সময় কথা কইতে কইতে গান্ধীজী তাঁকে বলেছিলেন, জাতকের একটি কাহিনী তাঁর খুব ভাল লাগে। এতে দেখা যায় বুদ্ধ এক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের নিকট নিজেকে খাদ্য হিসাবে অর্পণ করছেন। গান্ধী বললেন, তাঁর মনের একান্ত সাধ এইরূপ আত্মদান। একটি প্রাণী তাঁর হাড়গোড়, মাংস তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য চিবিয়ে খাচ্ছে, রসাস্বাদন করছে, এ ভাবতেই নাকি তিনি বিশেষ আনন্দ পান। (ভাবতে গেলে মন শিউরে ওঠে, দক্ষিণ রায়কে এইরূপ 'রসাস্বাদন' প্রসাদ দেওয়া যদি নিজের ক্ষেত্রে ঐরূপ সানন্দে সম্ভব হয়, অপরকে তার গ্রাসের মধ্যে দেখলে বিকার তো নাও হতে পারে। যাই হোক সে-কথা পরে।) উপরের বর্ণনায় গান্ধীজীর স্বকৃত নিজের এক পরিচয় পাই। এটা তাঁর একটা 'আমি'।

অন্য আর এক ক্ষেত্রে তাঁর নিজেরই বর্ণিত নিজের চরিত্রের আর এক পরিচয় পাই নিম্নের উদ্ধৃতি দু'টিতে।

১৯২০ সালের ১৮ই মে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে লিখিত এক পত্রে 'হোমরুল লীগের' নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের সংগঠনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণের উল্লেখ করে তিনি বললেন: "I have told them···I could only join an organization to affect its policy and not be affected by it. (আমি শুধু কোনও সংগঠনের নীতিকে প্রভাবান্বিত করার জন্যই তাতে যোগদান করতে পারি, ঐ সংগঠনের দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত করার জন্য নয়)।" অর্থাৎ আমি নিজে কোনও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা চর্বিত হব না; এমন কি অন্যদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ব, তাও নয়। আমি শুধু অন্য প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করতে পারব। এই সর্তেই কোনও প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারি। এর পূর্বেই ১৯১৮ সালে ২৫শে আগস্ট তিলককে যে পত্র লিখেছিলেন তাতেই এ কথা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি লিখেছিলেন: "আমি কংগ্রেস কিংবা মডারেটদের সম্মেলন—কোনওটাতেই উপস্থিত থাকা

মনস্থ করছি না। দেখছি, উভয়তেই আমার মত পার্থক্য। আমার মত হচ্ছে যে যদি আমরা সকলে এক সঙ্গে যুদ্ধের সেনাবাহিনী রিক্রুট করার কাজে নেমে পড়ি এবং লক্ষ লক্ষ রিক্রুট সংগ্রহ করি, দেশকে একটা বড় সেবা করব। আমি জানি, মিসেস্ বেসাণ্ট এবং আপনি এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে একমত নন। মডারেটগণও এ কাজ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবেন না। এই একটা কথা। আমার দ্বিতীয় কথা, আসুন আমরা মণ্টেগুচেম্স্ফোর্ড সংস্কারের প্রস্তাবের সারবস্তু গ্রহণ করি, যেটুকু উন্নতি চাই তা বুঝিয়ে দিই এবং সেই উন্নতি আদায় করার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করি। মডারেটরা যে এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না তা সুনিশ্চিত। আপনি এবং মিসেস বেসাণ্ট এ প্রস্তাব মেনে নিলেও আমি যে ভাবে সংগ্রাম করব তা আপনারা করবেন না।" (ইংরাজের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করতে কেউ তাঁকে দেখেননি। প্রতিবারের সেরূপ ঘোষণা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণের মধ্যেই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।)

শেষের অর্থাৎ উপরোক্ত উদ্ধৃতি দু'টিতে গান্ধীজীর যে 'আমি'র পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আত্মদানের ইচ্ছার চেয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত সকলের উপর প্রতিষ্ঠা করার জেদটাই বড় হয়ে দেখা গেল। পরিষ্কার ঘোষণা ক'রেই বলা হলো যে তাঁর শেষোক্ত 'আমির' কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেই তাঁর সহযোগী হওয়া সম্ভব এবং অন্য কোনও উপায়ে নয়। এই 'আমি' কী রূঢ় মাত্রায় পৌঁছতে পারে তা তাঁর রোম্যা রোলাঁর পুস্তক "মহাত্মা গান্ধী" সম্বন্ধে পরিচিত উক্তিতে সুস্পষ্ট হয়। "I know nothing about our good friend before he imposed upon himself the task of becoming my self chosen advertiser." ঐ 'আমি'-র তখনকার দাবী ছিল—ইংরাজের কাজে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মবলিদান। গান্ধীজীর এই 'আমি'-র অর্থের বিভ্রান্তি বার বার বুর্জোয়াজীর কাজে লেগেছে। তাঁর 'আত্মদানের' মহিমায় আত্মসমর্পণের কাহিনী আচ্ছাদিত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া নেতৃত্বের অপদার্থতা এবং শ্রেণীস্বার্থে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে গত অর্ধ 'শতাব্দী' ধরে দেশের ব্যথা বেদনার কাহিনীকেও আচ্ছাদন করতে সাহায্য করে।

'সারা জীবন ধরে' গান্ধীজী তাঁর 'আমি'কে যে-ভাবে বিকশিত করেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা এ ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য নয়। অংশত সেই উদ্দেশ্যে তাঁর কিছু তত্ত্ব এখানে আলোচনা করব।

গান্ধীজী ও তলস্তয়

গান্ধীজীর কথা আলোচিত হলেই তলস্তয়ের কথা এসে পড়ে। গান্ধীজী নিজেও তাঁর শিষ্যত্ব দাবি করেছেন। একাধিক সুপরিচিত লেখকও উভয়ের নাম জড়িত করে পুস্তক রচনা করেছেন। গান্ধীজী তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজে' নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা করেন। চোরকে ঘর ছেড়ে দাও। নির্বিঘ্নে জিনিসপত্র সরাতে দাও। তোমার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সে সৎ পথে আসবে। এই অপ্রতিরোধের দৃষ্টান্তই তিনি সর্বত্র প্রচারিত করেছেন। তলস্তয়ের মতবাদও এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু তলস্তয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর দু'টি পার্থক্য না লক্ষ্য ক'রে পারা যায় না। প্রথমটাই এখানে উল্লেখ করছি। তলস্তয় প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতেন না। গান্ধীজী তা করতেন। এবং কি ভাবে তাঁর নিজস্ব মত ও সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, সরল কথায় একচ্ছত্র নেতৃত্ব দাবি করতেন, তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তলস্তয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব না করলেও, রাজনীতিতে তাঁর মতবাদের প্রভাব, তার দোষ গুণ সবেরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বিশেষ ক'রে এই মতবাদই তো তখনকার রাশিয়ার পশ্চাৎপদতার এক প্রতিফলন।

লেনিন তলস্তয়ের সমালোচনায় বলেছেন: "তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করার লেখক, আবেগময় অভিযোগকারী এবং মহৎ সমালোচক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অক্ষমতার পরিচয়ও দিয়েছেন। রাশিয়ার আসন্ন সঙ্কট আর তার কারণ ও তার উদ্ধারের উপায় তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর এই অক্ষমতা প্যাট্রিয়ারক্যাল আনাড়ি কৃষকের অক্ষমতা, একজন ইউরোপীয়ান শিক্ষায় শিক্ষিত লেখকের নয়। সামন্ততান্ত্রিক পুলিশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম রাজনীতি পরিহারের সংগ্রামে পরিণত হলো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধের নীতিতে পৌঁছাল এবং ১৯০৫-৭ এর জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতায় পর্য্যবসিত হলো। সরকারী গির্জার বিরুদ্ধে তিনি এক নূতন শুদ্ধিকৃত ধর্ম প্রচার করলেন অর্থাৎ উৎপীড়িত জনসাধারণের জন্য এক নূতন মার্জিত ও সূক্ষ্ম বিষয়ের ব্যবস্থা করলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা জমিদারী সামন্ততন্ত্র ও তার রাজনৈতিক অস্ত্র রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলো না, শুধু স্বপ্নময়, ভাসাভাসা, শক্তিহীন বিলাপে পরিণত

হলো। জনগণের উপর ধনতন্ত্র যে ঘোরতর বিপদ ও আঘাত বর্ষণ করে তা অনাবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে থাকলো তাঁর আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালিত মুক্তি সংগ্রাম সম্বন্ধে চরম ঔদাসিন্য।

তলস্তয়ের মতবাদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত মতের মধ্যেই অন্তর্নিহিত নয়। চরম জটিল বিরোধিতায় পূর্ণ অবস্থাদি, সামাজিক প্রভাবাদি এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসমূহ যা সংস্কারের পর ও বিপ্লবের পূর্বে রুশ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মানসচরিত্র নির্দ্ধারণ করত তার প্রতিফলন ছিল তলস্তয়ের মতবাদের ঐ চরিত্র।"

বলাবাহুল্য পরাধীন ভারতে ভিন্নসমাজে গান্ধীজীর আচরণের সঙ্গে তার হুবহু মিল থাকার কথা নয়। কিন্তু অপ্রতিরোধের মূল পরিচয় এখানেও সুস্পষ্ট। মূল কারণও একই। তাছাড়া গান্ধীজীর রাজনীতিতে সাক্ষাৎ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের কারণে তাঁর মতবাদের দোষগুণের ফল অনেক প্রত্যক্ষ আকারে ও বিস্তারিত ভাবে দেখা দিয়েছে। লেনিন একজায়গায় বলেছিলেন: "সাধারণ সৈনিক কৃষকের লক্ষ্য সে সহানুভূতির সঙ্গেই দেখত। জমির নামে তার চোখ জলজ্বল করে উঠত। একাধিক ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে যে সশস্ত্র বাহিনীর কর্তৃত্ব সাধারণ র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইলের হাতে পড়েছে কিন্তু স্থিরসঙ্কল্প নিয়ে তার ব্যবহার করা হয়নি। সৈন্যরা দোদুল্যমান হয়েছে। দুদিন পরে, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা পরেই, কোনও ঘৃণ্য অফিসারকে হত্যা ক'রে বাকী ক'টাকে তারা ছেড়ে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছে এবং তারপর দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে গুলির সম্মুখীন হয়েছে কিংবা চাবুকের জন্য পিঠ নগ্ন করে দিয়েছে। এইভাবে তারা জোয়াল আবার ঘাড়ে নিয়েছে। একেবারে তলস্তয়ের মতোই আচরণ!" গান্ধীজীর নেতৃত্বের ফলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেও অনুরূপ ঘটনা অপরিচিত নয়।

কিন্তু তলস্তয়ের এইরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও শিল্পী হিসাবে তাঁর বিরাট দানের কথা কমরেড লেনিন বিশেষ ক'রে স্মরণ করেছেন এবং অত্যাচার অনাচারকে তিনি যেরূপ সজীবভাবে চিত্রিত করেছেন তার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। লেনিনের ভাষায় তাঁর লেখায় আছে: "ধনতান্ত্রিক শোষণের নির্মম সমালোচনা, সরকারী স্বৈরাচারের আবরণ উন্মোচন, বিচারালয় ও শাসনব্যবস্থার প্রহসন, একদিকে ধনের বিপুল স্ফীতি এবং অন্যদিকে সমতুল

দারিদ্র-বৃদ্ধি, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে অবনতি ও দুর্দশা প্রভৃতির সার্থক বিবরণ।"

বস্তুতঃ তলস্তয়ের লেখায় ধনীদের চোর, ডাকাত, পরধন লুণ্ঠনকারী—এইভাবে বর্ণনাও করা হয়েছে। শ্রমিকদের উপর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী (একনাগাড়ে ৩৭ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রমের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত প্রভৃতি) তাঁর অমর লেখনীতে বর্ণিত হয়েছে।

গান্ধীজীর লেখা ও ভাষণে ধনবৈষম্যের উপর ও ধনীদের উপর এরূপ কষাঘাত আশা করাই বৃথা। অথচ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধনীদের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি অচেতন ছিলেন না। ১৯০৯ সালেই তিনি লিখেছিলেন: "I fear we will have to admit that moneyed men support British rule; their interest is bound up with its stability—স্বীকার করতে হবে ধনবান ব্যক্তিরাই বৃটিশ শাসন সমর্থন করে, তাদের স্বার্থ বৃটিশ শাসনের স্থায়ীত্বের সঙ্গেই জড়িত।" (সঠিকতার স্বার্থে বক্তব্য এত সরল হলে পূর্ণ হয় না। ধনীদের প্রকৃত ভূমিকা বর্ণনায় আরও কিছু বলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে কথা ভিন্ন।)

রোম্যা রোলাঁ তলস্তয় এবং গান্ধীর মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি দেখেছিলেন গান্ধীজীর "সকল সংগ্রামই ধর্মীয় প্রশান্তির উদ্ভাবান্বিত। অপর পক্ষে তলস্তয়ের ক্ষেত্রে সব জিনিষই হলো দম্ভের বিরুদ্ধে দাম্ভিক বিদ্রোহ, ঘৃণার বিরুদ্ধে ঘৃণা, প্রবল আবেগের বিরুদ্ধে প্রবল আবেগ। তলস্তয়ের সব কিছুই সহিংস, এমন কি তাঁর অহিংসার নীতিও।" (ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্তের অনুবাদ)। রোম্যা রোলাঁ যাই বলুন, এই ধর্মীয় প্রশান্তির উদ্ভাবণ কি ভাবে ভারতে ধনী জমিদার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ আচ্ছাদন করেছে এবং বিপ্লবী সংগ্রামকে ব্যাহত করেছে তা আজকের মানুষ মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন।

ধর্মের প্রশ্ন

গান্ধীজীর ক্ষেত্রে ধর্মের উদ্ভাবন কিরূপে দাঁড়িয়েছিল, তাও লক্ষ্য করা উচিত। তলস্তয়ের ক্ষেত্রে লেনিন বলেছিলেন: "On the one hand, the most sober realism, the tearing away of all and sundry

masks ; on the other, the preaching of···religion, the striving to replace officially appointed priests by priests who will serve from moral conviction i. e. to cultivate the most refined and therefore particularly disgusting clericalism." (মর্মার্থ—একদিকে অপ্রমত্ত বাস্তবতা প্রভৃতি যত কিছু মুখোসকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া, অন্যদিকে ধর্মের প্রচার, সরকারী পুরোহিত শ্রেণীর বদলে এক ধরনের পুরোহিত যারা হবে আরও মার্জিত এবং সেই জন্যই আরও বিরক্তিকর।)

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধর্ম সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতার সংগ্রামী ও সামাজিক বিপ্লবের সংগ্রামী—সকলের কাছেই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ, যত কিছু ভেদ বিভেদের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক ভিত্তি এই ধর্ম এবং তার বাস্তব ভিত্তি হলো (অর্থনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য কারণাদি ছাড়াও) এই ধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি। এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন : The East fell to the West because of segregation of man from man—মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতার দরুনই পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের পতন হয়। এই segregation-এর বিচ্ছিন্নতার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে religious rituals অর্থাৎ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান।

রাজনৈতিক আন্দোলন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে শুরু করতেই হবে এমন কথা বলছি না। কিন্তু ভারতবর্ষে ভেদ-বিভেদ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে গণ-আন্দোলন প্রসারিত হতে গেলে ধর্মের গোঁড়ামির ও আচারাদির দৃঢ় বন্ধনগুলি শিথিল হওয়ার প্রয়োজন ঘটেই পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই ঘটেও থাকে। কিন্তু চাকা যদি উল্টো দিকে ঘুরানোর চেষ্টা হয় তা যে উদ্দেশ্যেই করা হোক, শেষ ফল ভাল হয় না।

নিতান্ত রাষ্ট্রের টিকে থাকার প্রয়োজনে এবং সামাজিক প্রয়োজনেও মধ্যযুগেই ভারতে আচারাদির শিথিলতার দাবিতে ধর্মীয় সাহিত্য ও সম্প্রদায় গড়ে উঠছিল, যা লোকসমর্থন পাচ্ছিল এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শাসককুলেরও বিশেষ বিশেষ অংশের সমর্থন পাচ্ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে এর সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক। সামন্ততন্ত্রে, বিশেষ ক'রে গ্রামের বিচ্ছিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় ভারতের প্রতিটি অংশে ধর্ম ও সামাজিক আচারাদি বন্ধন দৃঢ়ভাবেই থেকে যাবে এটা স্বাভাবিক।

ইংরাজ যখন সেই গ্রামভিত্তিক সমাজকে ভেঙে দিল স্বভাবতই শিথিলতার

অবকাশ এল এবং আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনগুলি দেখতে পেলাম। নবউন্মেষের বিরুদ্ধে ইংরাজেরও আঘাত এল। ১৮৪২ সালে লর্ড এলেনবরা বললেন, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লাগাতে হবে (Hindus must be pitted against Mussalmans)। আবার উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হঠাৎ তাঁরা মুসলমানের সতীর্থ হলেন। দুয়েরই প্রতিফলন দেখা গেল সাহিত্যে। সংবাদ প্রভাকর পড়লেই ঈশ্বর গুপ্ত এবং তাঁর শিষ্যদের সাংস্কৃতিক বিভেদ অনুশীলনের ধারা দেখা যাবে। স্যার সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর প্রভাবান্বিত উর্দু সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব দেখা যাবে। মুসলমানদের মধ্যে যে ধারা বরাবর ইংরাজের বিরোধিতা ক'রে যাচ্ছিলেন তাঁরাও বিচ্ছিন্নতার আবেগ কাটিয়ে উঠতে পারেননি এবং প্যান ইসলামিজের বন্ধনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন।

ভারতের জাগরণের উপাদান আলোচনায় অন্যান্য উপাদান সহ একটি উপাদান হিসাবে মার্কস বলেছিলেন: "ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে, ইংরাজদের তত্বাবধানে ও পরিচালনায়, তাদের খুব বাঞ্ছিত না হলেও, এক ধরনের শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা ইউরোপের বিজ্ঞানে আলোক প্রাপ্ত এবং শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজন মেটাতে পারে।" (এই বিজ্ঞানের অন্যতম আলোক প্রাপ্তের প্রধানত রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রমুখের প্রথম হলেন রামমোহন। এ কথাটা যে বিশেষ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলাম তা পরে বলছি।) রজনীপাম দত্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: "সামাজিক রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া দেয় এবং অগ্রগতির পথে বিশৃঙ্খলা ঘটায়। লুটপাটের কাহিনী ঢাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদ যেমন সাধু সঙ্কল্পের রূপকথা প্রচার করে, তেমনই আবার অপর দিকেও অন্য এক ধরণের রূপকথা, মনগড়া ব্যাখ্যা ইত্যাদি প্রচার হইতে পারে। সেদিক দিয়াও আমাদের হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।...অতীতের যেসব প্রতিক্রিয়াশীল নিদর্শন আজও ভারতে টিকিয়া আছে, অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া আছে, জনসাধারণের চেতনাকে দাবাইয়া রাখিতেছে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতেছে না, ঐতিহাসিক কারণ দেখাইয়া শুধু পূর্বোক্ত লোকেরা করিতেছে না, বরং তাহাদের উপর আবার গৌরবের রংও চড়াইতেছে, বলিতেছে—ঐসব জিনিসইতো আদর্শ স্থানীয়। প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা জাতীয় চেতনা গড়িয়া তুলিতে চাহে। এইভাবে

তাহারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সাধারণভাবে 'পাশ্চাত্য সভ্যতার' বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করিতে চাহিয়াছে। তাহারা সম্মুখ পানে না তাকাইয়া পিছনের দিকে তাকাইয়া আছে। ইহাতে কিন্তু জাতীয় ফ্রন্টকে শক্তিশালী করা হয় না, দুর্বল করাই হয়।"

গান্ধীজীর 'হিন্দ স্বরাজ' পুস্তকটি সমগ্রভাবেই আধুনিক সভ্যতা তথা 'পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধ-সংগ্রামে।' এই যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম যুক্তিই হচ্ছে—"ভারতের কারও কাছে কিছু শেখার নাই।" (হিন্দ স্বরাজ)। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমাদের সমগ্র হৃদয়মনকে পাশ্চাত্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবার এই যে বর্তমান সংগ্রাম ইহা একটা আধ্যাত্মিক আত্মঘাতের (সুইসাইডের) চেষ্টা মাত্র। আমাদের দম্ভের মোহে আমরা আমাদের গৃহচূড়া হইতে যদি চিৎকার করিয়া বলিতে থাকি যে মানুষের জন্য অসীম মূল্যবান কোনো কিছুই পশ্চিম উৎপন্ন করিতে পারে নাই, তবে প্রাচ্যমনের যাহা কিছু দান তাহার মূল্য সম্বন্ধেও সন্দেহের বিশেষ কারণ ঘটাইয়া তুলিব।" (এন্‌ড্রুজকে লেখা পত্র, রবীন্দ্র জীবনী, পৃষ্ঠা ২৮৫ হইতে, ডাঃ দাশগুপ্ত অনুদিত)। ইংরাজী শিক্ষার অপরাধে রামমোহন, তিলক প্রমুখ যারা মার্কসের ভাষায় ইউরোপীয়ান বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত তাঁরা তাঁর কাছে হলেন 'পিগমী'। গান্ধীজী নিজে ও তাঁর শিষ্যরা বলেছেন, এঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করতেন না। গান্ধীজী সেজন্যই ও কথা বলেছেন। রামমোহনের এতগুলি বাংলা লেখা সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে এ অভিযোগ কি করে ওঠে তার কোনও সদুত্তর কেউ দেননি। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "I strongly protest against Mahatma Gandhiji depreciation of such great personalities of modern India as Rammohan Roy in his zeal for declaiming against our modern education."

ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর ব্যক্তিগত অর্থভঙ্গির কারণে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির কামনায় তাঁর উদার নীতি ব্যাহত হত—এ তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন না কেন তাই বোঝা যায় না। 'হিন্দ স্বরাজে' তিনি বলিষ্ঠ ভাষাতেই বলেছিলেন, যা জাতীয় আন্দোলনের সুস্থ ধ্যান-ধারণা। যেমন "যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ এ দেশে বাস করে সেইহেতু ভারত একজাতি থাকবে না এ হতে পারে না। বহিরাগতের আগমনই জাতিকে ধ্বংস করতে পারে না। তারা জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেই দেশই জাতি যার

এ রকম অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিভা আছে। ভারত বরাবরই সেইরকম দেশ। বাস্তবত যত মানুষ তত ধর্ম—কিন্তু যারা জাতিসত্তা সম্বন্ধে সচেতন তারা পরস্পরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না। যদি হিন্দুরা মনে করে তাহলে তাদের এক জাতির পরিচয় থাকে না। যদি হিন্দুরা মনে করে ভারতে কেবল হিন্দুরাই থাকবে তাহলে তারা স্বপ্ন জগতে বাস করছে। হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খ্রীষ্টান—যারা ভারতকে তাদের স্বদেশ হিসাবে জানে তাদের নিজেদের স্বার্থেই তাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। পৃথিবীর কোনও অংশেই জাতি এবং ধর্ম একার্থবোধক নয়। ভারতেও তা কোনও দিন থাকেনি।"

কিন্তু তিনি এবং তাঁর হিন্দু-মুসলমান সহকর্মীরা রাজনীতিতে প্রবল ধর্মের আবেগ নিয়ে এলেন। রজনী পাম দত্তের ভাষায় 'সম্মুখ পানে না তাকাইয়া পিছনের দিকে তাকাইলেন'।

গান্ধীজী রাম রাজত্বের কথা বলছেন আর মৌলানা আজাদ বলছেন হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত মোহম্মদের কথা। মৌলানা বলছেন: "আমি আমার বাঞ্ছিত পথে যেতে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মুহম্মদের সঙ্গে হাত যুক্ত করার জন্য ব্যাকুল ছিলাম, গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনি বা গ্লাডস্টোন ও পার্নেল হওয়ার আসক্তি আমার ছিল না।" (সারা বাংলা খিলাফত সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ—ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯২০)। স্বয়ং গান্ধীজীও বলছেন: "যদি হজরত মোহম্মদের শিষ্যদের মধ্যে তাঁর বিশ্বাসের অর্ধেকও থাকে তা হলে বাধাবিপত্তি তাঁদের শক্তির সমান পর্যায়ে নেমে যাবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের শক্তি তুর্কীর উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া—জুন ৩০, ১৯২০)। হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সহনশীল হবার উপদেশ তিনি দিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উভয়কেই তাদের ধর্মে আরও দৃঢ় হতে বললেন। বললেন, এইরূপ ধর্মে দৃঢ় বা গোঁড়া হলেই ঐক্য ত্বরান্বিত হবে। (গান্ধীজীর এইরূপ উক্তি বা বক্তব্য অনেক স্থানেই আছে। নমুনা হিসাবে ফেব্রুয়ারী ২৫,১৯২০ তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়া দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ গণ আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামই ঐক্য এনেছে। গান্ধীজীর অবস্কিউর‍্যানটিজম্ (জ্ঞানালোকের পরিবর্তে তার প্রতিরোধ) এবং ধর্মোন্মাদনা ব্যবধানের রচয়িতাদেরই সাহায্য করেছে।

যাঁরা গান্ধীজীর তত্ত্বাদির সমালোচনা থেকে গণআন্দোলনেরও সমালোচনায় পৌঁছেছিলেন তাঁদেরও শেষোক্তের (অর্থাৎ গণ-আন্দোলনের) নানান

সার্থকতাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। কেমন ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের এক ধাক্কায় শান্তিনিকেতনে পংক্তিভোজনের উচ্ছেদ হল শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনীতে তা বিবৃত করেছেন। তাঁর উল্লেখ করা উচিত ছিল, গান্ধীজী খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে মিলেমিশে খাওয়া-দাওয়ার প্রচারের বিরোধী ছিলেন—সে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই হোক, বা বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন থাকের মধ্যেই হোক। (নবজীবন মে ৩০, ১৯২০ এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে লেখা পত্র, মার্চ ১৮, ১৯২০)। সুতরাং শান্তিনিকেতনে বা অন্যত্র পংক্তি উচ্ছেদের কৃতিত্ব গণ-আন্দোলনের, গান্ধীজীর নেতৃত্বের নয়।

এই ধরনের গোঁড়ামীর প্রচারে দেশে এবং দুই সমাজেও দুই সম্প্রদায়ের কিছু অংশের মধ্যে দু'রকম প্রতিক্রিয়া হলো। বুদ্ধিমুক্ত বুদ্ধিজীবী অংশের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার নমুনা হিসাবে নিম্নের উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। "তিনি (গান্ধীজী) জানিতেন ধর্মের নামে মুসলমানরা যত সহজে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে আর কোনো আহ্বান তাদের তেমনভাবে উচ্চকিত করিতে পারে না। তিনি দেখিলেন সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমান শিথিল গ্রথিত হিন্দুদের সহিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলে তাঁহার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।" (শ্রী প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড)। অর্থাৎ ব্যাপারটি প্রাগম্যাটিক কৌশলগত বলে প্রতিভাত হলো। পেটিবুর্জোয়া ইনটেলিজেনসিয়া যাঁরা প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দাঁড়ির সহজেই এধার ওধার হয়ে পড়েন, হিন্দুর সেইরূপ অংশের প্রতিক্রিয়ার নমুনা পাওয়া যাবে শরৎচন্দ্রের আলোচ্য উক্তিতে "...যে দেশের সহিত ভারতের সংশ্রব নাই, যে দেশের মানুষ কি খায়, কি পরে, কি রকম তাঁদের চেহারা কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল (যথা আরব দেশ), যদিচ তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আব্দার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটি ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফত—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্ণপাত করিল না এবং ওদিকে যাদের জন্য খিলাফত সেই তুর্কীরাই খলিফাকে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপ খিলাফত আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও

প্রাণবধ করিল।...” (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'হিন্দু-সংঘ' পত্রিকা, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৩)। ঐ ধরনের মুসলমানের মধ্যে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এম. আর. জয়াকর। "সাধারণ মুসলমানদের এইরূপ একটা ইমপ্রেশান হলো যে গান্ধী জাতীয় রাজনীতির ভেক ধারণ করে সঙ্গোপনে হিন্দুধর্মের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বাদি দেশের স্কন্ধে চাপিয়ে দিচ্ছেন। অনেক দিন ধরে এই সন্দেহের ভাব জাতীয় প্রয়াসে মুসলমান বিরোধিতার ভিত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁরা এই সময়ের উত্তর ভারতের মুসলিম সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে মুসলিম মতের ভাবগতি লক্ষ্য করে গেছেন তাঁরা দ্বিধাহীনভাবেই বলবেন যে (গান্ধীজীর) এই সব আধাদার্শনিক (কোয়াসি-মেটাফিজিক্যাল) মতবাদ প্রচারের ফলে ভারতীয় মনোভাবে (সেন্টিমেন্টে) একটা বড় ফাটল দেখা দিল। মুসলিমরা এ সবকে কুহকীয় (weird) বিবেচনা করত। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এইরূপ কুহকের প্রভাবান্বিত বলে হিন্দু সংগঠন হিসাবে বিবেচিত হলো।" (এম. আর জয়াকরের 'দি স্টোরি অব মাই লাইফ' ভলিউম এক, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৬০)

মৌলানা আজাদ অবশ্য একটা কথা অসহযোগ আন্দোলনের পর তাঁর পত্রিকা "আল হিলালে" স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যখন সংগ্রাম চলছিল তখন এসব পারস্পরিক সন্দেহের অভিযোগ আসেনি। চৌরিচৌরার পর সংগ্রাম শেষেই এ সব কথা উঠেছিল। অবশ্য 'উঠেছিল' বললে ঠিক হবে না। সংগ্রামের সময়েই মানুষ এইসব আধাদার্শনিক কথাবার্তা, রিভাইভেলিজমের কথাবার্তার ব্যাখ্যা খুঁজছিল। সংগ্রামের পর হতাশার মধ্যে এগুলি বিস্তার লাভ করছিল। ইংরাজ এবং হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তার সুযোগ গ্রহণ করল।

শেষোক্তরা সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া সামন্ত, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থেই এই সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষণ করছিল—গান্ধীজী কিংবা তাঁর উপরোক্ত সমালোচক কারও ঐ কথা মনে হল না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণআন্দোলনই যে এর প্রতিকার সে কথা প্রোলেতারিয়েতের দল ছাড়া আর কেউ বলল না।

রাসুকিন তত্ত্ব

গান্ধীজী একবার বলেছিলেন: "তোমাদের জানা উচিত আমাদের মধ্যে আমি সব চেয়ে কম পড়া লোক।" (হরিজন, অক্টোবর ১, ১৯২৬)। আশ্চর্য্য হবার কিছু নয়। তিনি কৃষকের উল্লেখ করে একবার বলেছিলেন: "তাকে

অক্ষর পরিচয় কারয়ে দিয়ে তোমরা কি প্রস্তাব করতে চাও? তার সুখে কি তোমরা এক ইঞ্চি যোগ দিতে পারবে? তোমরা কি তার কুটিরটি কিম্বা তার ভাগ্যের বিষয়ে তার মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চাও? তা যদি চাও তাহলেও শিক্ষার প্রয়োজন হবে না।" (হিন্দ্ স্বরাজ, ১৯২২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৮)। কাজেই, তাঁর নিজেই, তাঁর নিজের কোয়াসি-মেটাফিজিক্যাল আধা দার্শনিক কথাবার্তার পরিচর্চা ছাড়া তাঁর কোনো পুস্তক পাঠ করা বা পাঠ করতে উৎসাহিত করার প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু তাঁর যা পড়া ছিল তারই মধ্যে কয়েকটি পুস্তকের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। রাসকিনের "আন্টু দিস লাস্ট" তার একটি। এ বই সম্পর্কে তিনি বলেন, Ruskin's *Unto this last* inspired me. (Young India 2.4.31। বস্তুতঃ গান্ধীজীর ভক্তরা তলস্তয়ের খ্যাতি অনুযায়ী তলস্তয়ের সম্পর্কটার প্রচারের গুরুত্বটা বেশী মনে করেছেন এবং সেইমতো প্রচারও করে গেছেন। আমরা উপরে দেখেছি, তলস্তয়ের সঙ্গে তাঁর বরং একটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। তলস্তয়ের যে-গুণের জন্য সমালোচনা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তাঁকে তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছেন, ঠিক সেই গুণটিরই অভাব গান্ধীজীর মধ্যে।

বরং রাসকিন আর তাঁর "আন্টু দিস লাস্ট" সম্পর্কে যা বলা হয়, তা সঠিকই বলতে হবে। পুস্তকটি ভেক-অর্থনীতির একটি জগাখিচুড়ি। এর মূল বক্তব্য হলো অর্থনীতিবিদরা তাঁদের শাস্ত্রে মানুষের আত্মার ক্রিয়াকর্ম বিবেচনা করেননি। তিনি বললেন, আত্মার কথা বিচার করলে দেখা যাবে পিতৃসম মালিক এবং সন্তানসম শ্রমিক সংযোগে এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা যায়। রিফর্মেশানের যুগের প্রসিদ্ধ শিল্পীর ছবিতে খৃস্টের পায়ে জুতা—এইরূপ চিত্রাঙ্কনের তিনি একবার সমালোচনা করেছিলেন। মর্মার্থ ছিল উক্ত শিল্পী উল্লিখিত পেনটিং-এ খৃস্টের পরিধেয় এবং মুখচ্ছবিতে উদীয়মান ইউরোপীয় বুর্জোয়ার ছবি এনে ফেলেছেন। (মডার্ন পেন্টার্স—রাসকিন)। তাই বোধ হয় তিনি (রাসকিন) ক্ষতিপূরণ হিসাবে আধুনিক বুর্জোয়াকে খৃস্টের রূপের অবতারণা করতে লেগে পড়লেন, অনুপানের ব্যবস্থা করলেন, জাস্টিস্—যার মধ্যে স্নেহও থাকবে—এই গুণটির মিশ্রণ দিয়ে ব্যবস্থা করলে মালিক-মজুর সম্পর্ক সুমধুর দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা দেখেছি, এই জাস্টিস্ শব্দটির সংজ্ঞা আলোচনা করতেই সক্রেটিসের কালের গ্রীকদের হিমসিম খেতে হয়েছিল। রাসকিন গান্ধীজীর কোয়াসি-মেটাফিজিক্যাল আধা দার্শনিক তত্ত্বের

দার্শনিকদের ওসবের প্রয়োজন হয় না। রাসকিন শ্রেণীসংঘর্ষটা বুঝতেই পারেন না। তাঁর কাছে অদ্ভুত ঠেকে যে: 'ডাকাতির উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ একদল মানুষ প্রীতির সম্পর্কে উদ্দীপিত বোধ করে এবং দলের প্রতিটি সদস্য সর্দারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে অথচ আইনসঙ্গত উৎপাদন ও পুঁজি রাশীকৃত করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ব্যক্তিরা ঐরূপ কোনও প্রেমভাবে অনুপ্রাণিত হয় না এবং কেউই তাদের সর্দারের (অর্থাৎ মালিকের) জন্য প্রাণ দিতে ইচ্ছুক হয় না।" (আনটু দিস লাস্ট)। এখানে মালিক ডাকাত ঠিকই, কিন্তু শ্রমিক তার দলের ডাকাত নয়; শ্রমিক বরং গৃহস্থ যার নিকট হতে উদ্বৃত্ত মূল্য চুরি করে মালিক হয় ধনী। কাজেই অর্থনীতির অভিনব নৈয়ায়িক রাসাকনের তত্ত্ব আলোচনা করে লাভ নেই। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি অবশ্য চমকপ্রদ। সবগুলির উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। কয়েকটির উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যেতে পারে। "The natural and right system respecting all labour is that it should be paid at a fixed rate, but the good workman employed, and the bad workman unemployed." (মর্মার্থ: সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে স্বাভাবিক এবং ন্যায্য ব্যবস্থা এই হওয়া উচিত যে তারা একটা স্থির নির্দিষ্ট বেতন পাবে। ভাল মজুর হলে কাজে থাকবে। খারাপ মজুর হলে বেকার থাকবে।) শ্রমিককে বেশী মজুরীর সঙ্গে বেকার থাকার পরিবর্তে কম মজুরীতে কাজ করতে রাজী করাতে হবে—"inducing them rather to take low wages in the form of fixed salary than high wages, subject to the chances of being thrown out of work."

তাঁর চিন্তার সর্বসার পাওয়া যাবে নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে:

"কিছু মানুষ অন্য কিছু মানুষ অপেক্ষা, এমনকি একজন মানুষ অপর সকলের অপেক্ষা সুপিরিয়ার (উর্ধতর গুণবিশিষ্ট) এই কথা আমি অবিরত দেখাবার চেষ্টা করে এসেছি। এটাও দেখাতে চেয়েছি, ঐরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সেইরূপ পদাধিকারী করতে হবে যাতে তারা ঠিকমত নেতৃত্ব দিতে পারে এবং পরিচালিত করতে পারে—এমন কি উপলক্ষ ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে নিম্নতর স্তরের মানুষদের নিজেদের উত্তম জ্ঞান এবং জ্ঞানবান ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নত এবং বাধ্য করতে পারে (টু কম্পেল্ এণ্ড সাবডিউ)।" এর পর আর বলার প্রয়োজন হয় না। (গান্ধীজীর দ্বারা, অন্যান্য ছাড়া শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লারই বোধ হয় এইরূপ সুপিরিয়ার নির্বাচিত হবার সুযোগ হয়েছিল।)

শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীজীর নানান কথা নানান লেখায় ছড়ানো আছে। কয়েকটি সংকলনেও আছে। কিন্তু সব কিছু পড়লেও দেখা যাবে তাঁর বক্তব্য রাসকিন বর্ণিত তত্ত্বের চার দেয়ালের বাইরে যায়নি। সব কিছুর সর্বশেষ সার মর্ম দাঁড়ায় এই, যা তিনি আমেদাবাদের এক শ্রমিক সভায় বলেছেন: "আমি তোমাদিগকে আর একটা কথা বলতে চাই। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে, যে সব ইউনিয়ন আমরা প্রতিষ্ঠিত করছি তা মিল মালিকদের সঙ্গে লড়বার জন্য বা তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ (coercion) করার জন্য বা ঐরূপ কোনও উদ্দেশ্যে ইউনিয়নগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য, আমি তাঁদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান করতে বারণ করব। **মালিকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করার জন্য বা তাদের স্বার্থের হানি করার জন্য আমি জীবনে কখনও কোনও কিছু করিনি** এবং আমি নিজেকে এই কাজের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিব না।" (নবজীবন, ফেব্রুয়ারী ২৯,১৯২০)

গান্ধী-সহযোগীর দানের বড়াই

একটা কথা সহজেই এসে পড়ে। সহজেই প্রশ্ন এসে পড়ে তিনি কি কখনও ভেবে দেখেছিলেন ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্বিশেষে তিনি নিজেকে মালিকদের কাজের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন কি না। তাঁর প্রতি মালিকদের শ্রদ্ধা অবশ্য অত্যন্ত পরিমিত ছিল। এ কথা হালে প্রকাশিত শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লার "মহাত্মার ছায়ায়" (ইন দি শ্যাডো অব দি মহাত্মা) পুস্তকে বেশ বোঝা যায়। দেশের কাজ, সাধারণের কাজ করতে গেলে হাত পাততেই হয়, চাঁদাও তুলতে হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত দেশের কাজে চাঁদা দিয়েছেন। অন্যান্য সাহায্যের কথা উল্লেখ করলেও অর্থের কথা বা ঐ ধরনের দানের কথা কেউ জাহির ক'রে বেড়ান না। বরং দেখেছি সাধারণ মানুষ দান করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্যই কুণ্ঠিত থেকেছেন। ভারতের এই ধনীকুলপতি চাঁদা দেওয়ার এবং গান্ধীজী কর্তৃক তাঁর কাছে চাঁদা প্রার্থনা করার ফিরিস্তিকে উপরোক্ত পুস্তকের বিশিষ্ট অলঙ্কার করেছেন। খাদি, কুটির শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জন্য এঁরা অর্থ দিতেন এবং এই অর্থ ব্যয়িত হত ঐ সব সংগঠনের কর্মীদের প্রতিপালনে। শেষোক্তদের অন্যতম কাজ ছিল বিপ্লবের সমর্থক রাজনীতিকে প্রতিহত করা।

কিভাবে স্বদেশী আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে কংগ্রেসের নীতির দরুন শোষণ

মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ঘর থেকে তাঁদের ঘরে কোটি কোটি টাকা প্রবেশ করেছে, তার ফিরিস্তি ঐ কোটিপতি দেননি।

এমন কি ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কারের পূর্বেও এই ভদ্রলোক সাম্রাজ্যবাদী প্রভু রক্ষণশীল দলের বৃটিশ ভারতসচিব স্যর স্যামুয়েল হোরকে পত্র লিখছেন:

"...আমি চাই আপনি এইটা বুঝুন কংগ্রেস দলের কথা ছেড়ে দিলেও যদি প্রগতিশীল লোকদের (অর্থাৎ বিড়লা ও তাঁর শ্রেণীসহযোগীদের—প্রবন্ধ লেখক) সম্মতি ব্যতিরেকে গঠনতন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, এর সহজ পরিচালনা গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। অন্যদিকে আপনি যদি, ঐ প্রগতিশীল লোকদের অনুমোদন পায় এখন এমন গঠনতন্ত্র দান করেন, তা গান্ধীজীরও আশীর্বাদ লাভ করবে। আমি গান্ধীজী ও কংগ্রেসের মধ্যে তফাৎ করি। আমি পুনরায় নিবেদন করছি আপনার পক্ষে এমন গঠনতন্ত্র দেওয়া সম্ভব যা কংগ্রেসের নেতাদের গ্রহণযোগ্য না হলেও, গান্ধীজীর দ্বারা অগ্রাহ্য নাও হতে পারে। তার ফলে ভবিষ্যতে তা বাধাহীনভাবে কার্যকরী হতে পারে।..." তারপর গান্ধীজীর সম্বন্ধে তাঁর বলার অধিকার আছে এইটুকু বোঝাবার জন্য লিখছেন: "বস্তুতঃ আমি গান্ধীজীর আদরের সন্তানদের একজন। আমি তাঁর খদ্দর তৈরী আর অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতিতে উদার ভাবেই দান করেছি। আমি নিজে কখনও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিনি।" (শেষোক্ত ঘোষণা: ইংরাজের সতীর্থ হিসাবে নিজের পরিচয় দানের জন্য?—প্রবন্ধ লেখক)। বোধ হয় দুঃখ জ্ঞাপনের জন্য সরকার তাঁকে তেমন সুনজরে দেখেন না এই মত নিবেদন করার পর বলছেন: "আমি কর্তৃপক্ষকে (বলা বাহুল্য, বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে—প্রবন্ধ লেখক) এই মতে জয় করতে চাই যে গান্ধীজী ও ঐ টাইপের মানুষেরা শুধু ভারতের বন্ধু নয়, গ্রেট বৃটেনেরও বন্ধু। ...He (Gandhiji) alone is responsible for keeping the left wing in India in check (একমাত্র গান্ধীজীই ভারতের বামপন্থী শক্তিকে চেক্ করে রেখেছেন)।" (ইন দি শ্যাডো অব দি মহাত্মা—জি. ডি. বিড়লা, পৃষ্ঠা ৫৩)

একটি কথা তিনি প্রভু ভারত সচিবকে জানাননি—যা অবশ্য বৃটিশরা জানতেন। তিনি (বিড়লা) গান্ধীজীর নিষেধ ও অনুরোধ উপেক্ষা করে বৃটিশ বন্ধু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ও সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের কাজে টাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাঁরা এককালে স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ইংরাজ প্রভুকে পত্র দিতে দ্বিধা করেন না, গান্ধীজীর নিষেধ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক প্রচারে

টাকা দিতেন, তাঁরা আজ কি করছেন এবং পৃথিবীর কোন্ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, তা সহজেই অনুমেয়।

দুঃখের কথাটা তাই। ভুল তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে শ্রেণী সহযোগিতার রজ্জুকে শক্ত ক'রে, সাম্রাজ্যবাদের সুবিচারের উপর নির্ভর ক'রে শেষ জীবনে তাঁকে দেখতে হ'ল গোটা দেশটায় হু হু করে আগুন জ্বলছে। রক্তহীন বিপ্লবে স্বাধীনতার কথা ছিল। কথাটা এক নির্দিষ্ট সংখ্যালঘুর জন্য ঠিকই। সংখ্যালঘু ইংরাজকে এক ফোঁটা রক্তও দিতে হল না। কলকাতা আর ঢাকায়, দিল্লী আর লাহোরে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ হাসতে হাসতে দম্ভের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু হাজার হাজার নিরীহ দেশবাসীর প্রাণ দিতে হল—ঐ বৃটিশ শাসক আর তাদের সহায়কদের জন্য। সেই কলুষের আবর্ত শেষকালে প্রাণ দাবী করল তাঁরই যিনি বিপ্লবের গতিকে প্রতিহত করতে গিয়ে সেই কলুষের প্রতিরোধকে অসম্ভব করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের কাঠগড়ায় কমিউনিস্টদের চ্যালেঞ্জ

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কমিউনিস্টগণ দায়রা আদালতে বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতি দান বিখ্যাত এবং সুপরিচিত ঘটনা। বর্তমান কালে অনেকেই এই বিবৃতি দেখেননি বা পড়েননি। অনেকে তখনকার সংবাদ পত্রে দেখে থাকলেও এখন সেই স্মৃতি অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। মুদ্রিত পুস্তকাকারে* প্রাপ্য করে প্রকাশকরা পাঠকসমাজকে ঋণী করেছেন। তাতে শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মূল্যবান ভূমিকা সংযুক্ত আছে। সাম্রাজ্যবাদের কাছে তিনি ছিলেন প্রধানতম আসামী।

মুদ্রিত আকারে বিবৃতি এক বিরাট পুস্তকে পরিণত হয়েছে। হওয়ারই কথা। বিবৃতি দীর্ঘ। অভিযুক্তগণ চেয়েছিলেন তাঁদের মতবাদ প্রচার করতে। তাঁদের জানা ছিল জনসমাজে তাঁদের ফিরে এসে কাজ করার সুযোগ খুবই অনিশ্চিত। মার্কসবাদের অর্থ ও টীকাসহ সমগ্র রাজনৈতিক বক্তব্য এই বিবৃতিতে তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন। ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বলছেন: "...সাধারণত ফৌজদারী মামলার আসামীরা আইনের প্রতিটি সম্ভব ফাঁকের সুযোগে দণ্ডপ্রাপ্তি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন. মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীরা একেবারে ভিন্ন ভাবে কাজ করলেন। "দিনের পর দিন আদালতে 'তাঁরা যা' বিবৃতি দিতে থাকলেন, আদালতে তাঁদের অনুকূলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পরিবর্তে, তাঁদের এড়িয়ে যাবার সব সুযোগ পূর্ব হতেই বন্ধ করে দিল।..." দায়রা আদালতে তাঁদের গুরু দণ্ড প্রাপ্তি হয়েছিল। স্বয়ং প্রধান আসামী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর,

*কমিউনিস্টস্‌ চ্যালেঞ্জ ইমপিরিয়ালিজ্‌ম্‌ ফ্রম দি ডক (মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কমিউনিস্টদের বিবৃতি), ভূমিকা: মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। প্রকাশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২, দাম ৩৫.০০

অন্যদের ১২, ১০, ৭, ৫ বৎসর ক'রে দ্বীপান্তর স্থির হয়। (তিন বৎসরের নিচে কারও জেলের মেয়াদ ছিল না)। কাজেই আজকের পাঠক বুঝছেন কি দৃঢ় মনোবল ও বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় মীরাট মামলার আসামীগণ, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম যুগের সংগঠকগণ তাঁদের স্বনির্বাচিত গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন।

রচনারীতিতে বৈদগ্ধ ও দক্ষতার পরিচয়ও কম নয়। মার্কসবাদের তত্ত্ব তখন প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই তত্ত্বকে উপস্থিত করতে হয়েছে, আবার যেহেতু সাধারণ মানুষের পাঠ্য-ই লক্ষ্য সেদিকেও নজর রাখতে হয়েছে।

উপরোক্ত দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য পণ্ডিত সমাজের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ছোট্ট একটা ঘটনা মনে পড়ল। কলকাতার কোনও কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক তত্ত্ব হিসাবে সোস্যালিজম্, কমিউনিজম্ প্রভৃতির পক্ষে-বিপক্ষে পাঠের জন্য পুস্তক অনুমোদন করার সময় তার অন্তর্ভুক্ত করলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত মুজফ্ফর অহ্মদ প্রমুখের 'বিবৃতি'। সময়টা ১৯৩২। ছাত্ররা নিশ্চয়ই চমকে উঠেছিল। ঐ মামলার কথা সরকারী কলেজের ক্লাসে উঠলে তাদের চমকাবারই কথা।

এ মামলার কথা তখন সাধারণভাবে এক আলোচ্য বিষয়। ৩।৪ বৎসর ধরে এ মামলার কথা সংবাদপত্রে মানুষ দেখেছে। এই মামলার বিবরণে প্রধানত: আসামীদেরই উক্তিই যেন চারদিকের আশাহত অবস্থার মধ্যে একটা আলোর ছটা এনে দিয়েছিল। জেল, যন্ত্রণা, নিপীড়ন আসামীদের ভাগ্যে চলছিল নিদারুণভাবে। তার জন্য ব্যথা, বেদনা, সহানুভূতি, ক্ষোভ সবই ছিল। তবু অসহযোগ আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতা, ভেদ-বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার কলুষতায় জর্জরিত ভারতে আশাহীনতার শ্বাসরোধকারী অবস্থায় এই মামলার বিবরণ যেন এক মন্দ মধুর বাতাস সঞ্চারণ করে নবীন জীবনের সূচনা করছিল।

সত্যি কথা বলতে এর সূচনা হয়েছিল আগেই—যদিচ ইংরাজের নিষ্পেষণ ও শোষকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ অতিক্রম ক'রে তার প্রচার সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব ঘটেছিল।

পটভূমিকাটা স্মরণ করা ভাল। ১৯২০-২২ সালে ইংরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব তার কর্মসূচী জে:· ক'রে সীমিত ক'রে রাখল। আন্দোলন যখন সীমা অতিক্রম করতে চাইল জোর ক'রে তারা ভাটার টান দিল। রূপ হতে রূপান্তরে প্রবাহমুখী আন্দোলনের প্রবল স্রোতমুখে তাদের নির্দেশিত কর্মপন্থা বাধা দিল। আন্দোলনের তরঙ্গ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা

দিয়েছিল জেলায় জেলায় প্রধান প্রধান কেন্দ্র কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মীদের কর্মকেন্দ্র, রাজনৈতিক অফিস, প্রভৃতি। হতাশার সঞ্চার হয়ে পড়ল এই সব অফিসে অফিসে। কর্মীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে জিজ্ঞাসা করেছেন—অতঃপর? অতঃকিম? ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নেতা মহাত্মা গান্ধী। আন্দোলন এক রূপে না হয়ে হলো আর এক রূপে, চড়ার মুখে তিনি দিলেন তাকে স্তব্ধ করার ঘোষণা। বিভ্রান্ত কর্মীদের মুখে ঐ একটি প্রশ্ন—অতঃপর! খদ্দরের থান, চরখা—এগুলো সব নিজেদের ছাড়িয়ে একটা কি যেন অর্থ ধরে চলছিল এতদিন সবারই কাছে। প্রথমে যখন এর আবির্ভাব হয়েছিল তখন এরাই যেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শানিত তরবারি। সত্যি বটে, সে ধার কেটে গিয়েছিল। ব্যাপকভাবে যুবক আর জনসাধারণের মধ্যে সে রোমাঞ্চ আর ছিল না। তাই তাঁরা পথ খুঁজছিলেন। কিন্তু তবু এতদিন তো ওগুলো একটা অবলম্বন ছিল। আজ ইতস্তত ছড়ানো এই পদার্থগুলি অলীক অর্থ হারিয়ে যেন প্রকৃত ব্যঙ্গের বস্তু বলে মনে হচ্ছিল। সবাই তখন ভাবিত। যারা স্বরাজ এনে, জজীরাতুল আরবকে (আরব উপদ্বীপকে) ইংরাজের দখলমুক্ত ক'রে পুণ্যভূমি বয়তুল মোকাদ্দাস (জেরুসালেম) থেকে ইংরাজকে হটিয়ে তবে ঘরে ফিরব ঠিক করেছিল, তারা এখন ঘরে ফিরবে কোন মুখে? গ্রামের ও পাড়ার বাস্তববাদী মানুষ যারা বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে ঘরছাড়া এই মত্ত মানুষগুলোকে ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিল 'অসম্ভব, অসম্ভব,' 'মিথ্যা মরীচিকার পিছনে ছোটা'—এখন তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবে কি ক'রে? কংগ্রেস ও খিলাফতের সভায় স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীন ঘরের মেয়েরা অবিশ্বাসী দু'একজনের নিষেধ সত্ত্বেও সামান্য পুঁজি সোনাচান্দি দান ক'রে আভরণহীন হয়েছিলেন। গহনার জন্য না হোক, শুধু উক্ত বা অনুক্ত বিদ্রূপের মুখে সেই নিরাভরণাদের সান্ত্বনা আজ কোথায়? যারা স্কুল কলেজ ছেড়ে, জীবিকার উপায় চাকরী বাকরী ছেড়ে কপর্দক হয়ে পথে নেমেছিল দেশের সর্বোত্তম মঙ্গলের আদর্শে, তাদের আজ ভরসা কোথায়? আদর্শের জন্য, লক্ষ্যের জন্য মানুষ সব ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু সব ত্যাগের পর সেই আদর্শ, সেই লক্ষ্য—সবই যদি তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, সে-নগ্নতার দৈন্য অসহ্য। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে গান্ধীজীর 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতে গিয়ে কমিউনিস্ট বক্তা বলেছিলেন যে, দেশের হাজার হাজার যুবককে বুর্জোয়ারা

লক্ষ্যবস্তু থেকে বঞ্চিত ক'রে ভিখারী করেছে। তিনি যে কি ব্যথায় এ কথা বলেছিলেন, তখনকার অবস্থা যাঁরা জানেন তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারেন। উদ্যোগী কর্মীদের ঘরে ঘরে পড়ল ব্যর্থতা ও হতাশার একটা ছায়া। ইতোমধ্যে নজরুলের ভাষায় 'কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই' খিলাফতপন্থীদের সেই শেষ অবলম্বন শেষ ক'রে দিলেন কামালপাশা। খলিফার আসন দিলেন উচ্ছেদ ক'রে। তুর্কী হলো সাধারণতন্ত্র। (অবশ্য খিলাফত কমিটিকে অনেকদিন জিইয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল।)

যাঁরা যাচাই করতে পারলেন তাঁরা দেখলেন, তাঁরা যতটা আদর্শ ও কল্পনা মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি ও লক্ষ্যে, তার অবলম্বন অতিশয় সামান্য। ধরুন. কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য বলা হয়েছিল 'স্বরাজ'। বাংলার জাগ্রত জনমণ্ডকে সন্তুষ্ট করার জন্য বাংলার নেতাদের তরফ থেকে সামান্য একটু সংশোধন প্রস্তাব করা হলো। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু প্রস্তাব করলেন, 'গণতান্ত্রিক' শব্দটা যোগ করা হোক, 'গণতান্ত্রিক স্বরাজ' বলা হোক। গান্ধীজী তবু গ্রহণ করলেন না। এই সামান্য সংশোধনীও পরাজিত হলো। আর 'স্বাধীনতা, তো অসহযোগ আন্দোলনের দাবিই ছিলনা।

পরাধীনতার গ্লানি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের প্রশ্ন শোষিত শ্রমিক, মধ্যবিত্তকে মথিত করেছিল। এর সঙ্গে ছিল ধর্মীয় লাঞ্ছনাবোধ। কিন্তু বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ ধর্মোন্মাদনাকেই প্রধান অবলম্বন করেছিল। ১৮৫৭ সালে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ধর্মীয় লাঞ্ছনা উপলক্ষ মাত্র হয়ে বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হলো। কিন্তু ১৯২০--২১ এর আন্দোলনকে বুর্জোয়া নেতৃত্ব ধর্মশৃঙ্খলে বেঁধে রাখার চেষ্টা করলেন। ধর্মের আচ্ছন্নতাকে ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্ত প্রাঙ্গনে আসছিল সংগ্রামের স্বাভাবিক গতি, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক মনোভাব। কিন্তু বুর্জোয়া নেতৃত্ব এর সচেতন প্রতিরোধ করেছিলেন অহিংসার নামে; আর তাঁরা 'হিন্দু' 'মুসলিম' প্রভৃতি ধর্মের আবেদনে দুর্বার স্রোতকে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করছিলেন। ধর্মের ধ্বজা তুলে ধরায় খাঁটি, ভেজাল, সব রকমের স্বামীজী-মৌলবী-মৌলানার ভিড় হয়েছিল বেশ। সংগ্রামের মধ্যে অনেক সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অসাধারণে পরিণত হয়েছিলেন। পথ অভাবে এঁরা আবার সংসারের সাধারণ পথে বুদবুদের মত মিলিয়ে গেলেন। ধর্মধ্বজাধারীরা, যারা

'আন্দোলনের সময় দেবতা হয়ে' আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরা ইংরাজের আশীর্বাদে উপদেবতায় পরিণত হলেন। মসজিদের সামনে বাজনার প্রতিরোধ বা গো-হত্যার প্রতিরোধের মধ্য দিয়া হিন্দু মিশন ও মুসলিম মিশন, তানজিম প্রভৃতি উৎকট সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে মাথা চেড়ে উঠল। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে ধর্মীয় চিন্তার ধারায় উত্তোলিত স্বামীজী, মৌলবীর দল তাদের উপজীবিকা পেল। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ও জমিদাররা ভারতের রাজনীতিকে এক পঙ্কিল আবর্তে প্রবেশ করালো। ১৯২৬ সালে সারা ভারতে দাঙ্গা দেখা দিল আর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িক প্রচারের কলুষতা।

কিন্তু ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ দেশের মুক্তিকামনায় পথ খুঁজছিল। যাঁরা টেরোরিজমের পথকে ধরে থাকলেন বা বেছে নিলেন, তাঁদের কথা এখানে থাক। তাঁদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, আত্মত্যাগ ও বীরত্ব যতই প্রশংসনীয় হোক, জনসাধারণের প্রতি তাঁদের কোনও আবেদন ছিল না, বরং অবজ্ঞা ছিল। বুর্জোয়া চিন্তা, এমন কি সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব এঁরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করে উঠতে পারেননি। ফলে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে জন-জমায়েত ও গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দানের জন্য যে সংস্কারমুক্ততা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানসিকতার প্রয়োজন তা তাঁদের ছিল না। উপযোগী নেতৃত্ব তখন তৈরী হচ্ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের ডাক এসে পৌছেছিল এদেশে। ১৮৪৮ সালে যে ভূতের আবির্ভাবে ইউরোপের রাজারাজড়া, ধনিক-বনিক আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল বলে 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারে' উল্লেখ আছে, তা এসে পৌছেছিল এশিয়ার মাটিতে, ভারতের মাটিতে। শত সহস্র বাধা সত্ত্বেও এক একটি দৃঢ় পদক্ষেপে তা এগিয়ে চলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজ্যান্টস পার্টির প্রতিষ্ঠা, সংগঠন ও প্রসার, বিভিন্ন এলাকায় কৃষক আন্দোলন, ইতোপূর্বের কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৭-২৮ এর বিরাট শ্রমিক আন্দোলন, সংগঠন ও সংগ্রাম—সবই তার স্বাক্ষর। এ সব জীবনের সূচনা করেছিল, কৃষক শ্রমিকের বাইরেও বেশ কিছু মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে লক্ষ্য হিসাবে 'স্বাধীনতার' দাবী উপস্থিত করার পক্ষে জোরদার আন্দোলন সৃষ্টি হলো। গণতন্ত্রের দাবি, কৃষক-শ্রমিকের দাবি ইনটেলিজেন্সিয়া মহলেও সাড়া

পেতে লাগল। এর ধাক্কায় বুর্জোয়া রাজনীতিকরাও ভাষা বদলাবার প্রয়োজন বুঝতে লাগল এবং উত্তরোত্তর গণতন্ত্রের বুলি আওড়ানো শুরু করল।

ওয়াকিবহাল মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পেলেন ১৯২৮ সালের সাইমন কমিশন বয়কটের পূর্ণ সাফল্যে। আরও শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া নতিস্বীকার নমনীয়তার প্রতিবাদে ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্যানডেলে যখন কমিউনিস্ট-দের নেতৃত্বে বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হলো।

কিন্তু এত সত্বেও একদিকে বুর্জোয়া সংবাদপত্রের কলুষ কোলাহল এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ-যন্ত্র অতিক্রম ক'রে নবজীবনের বাণী তখনও ব্যাপকভাবে ছড়াতে পারেনি।

কবির ভাষায় বললে বলা যায় তখন—

> 'ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী
> মাতালদের ঐ ভাটিশালায় নটিনী আজ বীণাপানি!
> জাতির পরাণ সিন্ধু মথি' স্বার্থলোভী পিশাচ যারা,
> সুধার পাত্র লক্ষ্মী লাভের করতেছে ভাগ বাঁটোয়ারা।
>
> রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী
> আনিস খবর কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্গপাণি।"

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে মীরাট মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে একটা বড় আঘাত করল। কিন্তু এই আঘাতের মধ্যেও একটা বড় কাজ হলো। বুর্জোয়া নেতৃত্বের ধানাইপানাই নয়, "ভারত সম্রাটকে উচ্ছেদ করার" প্রকৃত সংগঠন গড়ে উঠেছে, শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত ও সারা ভারতব্যাপী শাখা-প্রসারিত হয়েছে—এই সংবাদ অনবহিত মানুষের কাছেও পৌঁছে গেল। ২১শে মার্চ—সকালের পত্রিকা একসঙ্গে তড়িৎগতিতে ভারতের কোণে কোণে কবি বর্ণিত 'যুগান্তরের খড়্গপাণি'র কথাই যেন ঘোষণা করল।

স্বভাবতই মামলার বিষয় জানাবার জন্য দেশের লোক উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক কৌতুহল জাগরিত হয়েছিল—কমিউনিজম কি? কমিউনিস্ট কারা? এ কি বিচিত্র মতবাদ যার অবলম্বনকারীদের মধ্যে আছে

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে নানান দেশের মানুষ, এমন কি শাসক ইংরাজের দেশের মানুষও যাতে এসে আসামী হয়েছে!

সুতরাং অভিযুক্ত কমিউনিস্ট বন্দীদের বিবৃতি প্রকাশ বিরাট এক রাজনৈতিক ঘটনা হয়ে গেল এবং তাতে দেশের এক বড় প্রয়োজন সাধিত হলো। মীরাট মামলা ও ঐ বিবৃতি রাজনীতিতে আগ্রহশীল দেশের মানুষকে কমিউনিজমের অকর্ষণের এক দীপবর্তিকা হয়ে দাঁড়াল। বস্তুত আজকের দিনে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, মীরাট বিবৃতিই তাঁদের অনেকের প্রথম শিক্ষা সোপান।

উল্লিখিত পুস্তকের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদ বলেছেন "...জেল হাজতে দেখা হলে আমি ডাঃ অধিকারীকে বললাম, সরকারের প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়ে দেওয়ানী আদালতকে আমরা রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চে পরিণত করি না কেন?... ডাক্তার অধিকারী রাজী হলেন।" ভারতের ইতিহাসে এবং ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার সংগঠনে শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদের এই দূরদৃষ্টি, তখনকার নেতৃবৃন্দের এই সিদ্ধান্ত এবং শেষে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবৃতিদান এক যুগান্তকারী ঘটনা।

১৯২৪ এর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা ও তখনকার দেশের অবস্থা স্মরণ ক'রে মুজফ্ফর আহ্মদ বলেছেন—"১৯২৯, ১৯২৪ নয়'। শুরুতে কমিউনিস্ট দল ছিল ছোট্ট। কিন্তু উদ্যোগের ফলে চতুর্দিকে তাদের প্রসার ঘটছিল। তিনি ১৯২৭-২৮ সালে ট্রেড ইউনিয়নের অভূতপূর্ব অগ্রগতির কথা, কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ গিরনী কামগর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন: "বৃটিশ গভর্নমেন্ট এ সবের জন্য বেশ বিব্রত ও হতবুদ্ধি বোধ করছিলেন।"

বস্তুত সমসাময়িক ঘটনায় দেখা যায় যে, দেশী বিদেশী মালিক ও শিল্পপতিরা কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারে বেশ রুষ্ট হচ্ছিল এবং একযোগে আক্রমণের চেষ্টা করছিল। ২২শে ডিসেম্বর (১৯২৮) বোম্বাই-এর মিল মালিক ও ব্যবসায়ীগণ গভর্নরের নিকট ডেপুটেশন স্মারকলিপি পেশ ক'রে শ্রমিকদের সায়েস্তা করার জন্য আবেদন করলেন। ইউরোপীয় এসোসিয়েশন তাদের বাৎসরিক ভোজসভায় অনুরূপ ভাবে প্রধান অতিথি ভাইসরয়কে আবেদন করেছিল। (অমৃতবাজার পত্রিকা, এপ্রিল ১৮, ১৯২৮)।

শেষ পর্যন্ত হলো! কিন্তু বিপরীত। কমরেড মুজফফর ঠিকই বলেছেন: "মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ভারত গভর্নমেন্টের একটা পরাজয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটা জয়ে পরিণত হলো। যে ভাবে কমিউনিস্টরা আদালত থেকে গভর্নমেন্টের খরচে তাদের মতবাদ প্রচার করল, ইতিহাসে তার অনুরূপ নিদর্শন নাই বললেই হয়। বাস্তব আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে তাদের অপসারণ শূন্যতা সৃষ্টি করা দূরের কথা উল্টোভাবে তার বদলে কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রচার মাধ্যমে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিল। আদালত থেকে কমিউনিস্ট আসামীরা যা প্রচার করলেন তাতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে চিন্তাধারার পুনর্বিচার শুরু হলো এবং ত্রিশ দশক শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁরা প্রচুর সংখ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলেন।" অন্য কারণ বাদ দিলেও শুধু এইরূপ ঐতিহাসিক কারণেই এই পুস্তক মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু, পাঠক দেখবেন শুধু ঐতিহাসিক দলিল হিসাবেই এ বিবৃতির মূল্য নয় (এই জন্যই গোড়ায় আমার জানা একটা সত্য ঘটনা উল্লেখ ক'রে এই লেখা শুরু করেছি)। মার্কসবাদের একটা সামগ্রিক পরিচয় এই বিবৃতিতে আছে। উপরন্তু ভারতে তার প্রয়োগক্ষেত্রে তখনকার কালে কমিউনিস্টরা যা সমাধান হিসাবে ভেবেছিলেন তারও পরিচয় আছে। ভারতে মার্কসীয় তত্ত্বের পরিচয়ের জন্য আজও এই পুস্তক কার্যকরী। এই কারণেও এই মুদ্রণ উপযোগী হয়েছে।

পুস্তক পাঠে একটা জিনিষে আশ্চর্য হতে হয়। মাত্র কয়েক বৎসর অনুশীলন ও অনুধাবনে চিন্তাধারায় কতটা স্বচ্ছতা আয়ত্ত হয়েছিল দেখলে অবাক লাগে। বস্তুত আজকে আমরা কমিউনিস্টরা যে স্বচ্ছতা দাবি করি তা সোজাসুজি এই প্রারম্ভের স্বচ্ছতার উত্তরাধিকারী। পরিষ্কার বোঝা যায় মাঝে যে ঘোলাটে চিন্তাধারার আমদানি হয়েছিল তা বহিরাগত এবং ভারতের কমিউনিস্ট ঐতিহ্যের বাইরে। ইতিহাসের কাল সম্বন্ধে ডিলাইল বার্নস্-এর একটা সুপরিচিত উক্তি স্মরণে পড়ে। "It is the ancient which is more modern and it is the medieval which is ancient." এই বিবৃতি পাঠ করলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই উক্তি প্রযোজ্য মনে হবে।

উপরোক্ত ছাড়াও বিবৃতির একটা বড় মূল্য হচ্ছে বিংশ দশকে ভারতে সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও আন্দোলনের ইতিহাস ও পরিচয়, একদিকে

গান্ধীজী তথা বুর্জোয়া নেতৃত্বের সমালোচনা এবং অন্যদিকে নবউত্থিত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতৃত্ব কর্তৃক ঘটনাবলী উদ্ভূত সমস্যার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ এবং সক্রিয় হস্তক্ষেপের বিবরণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতিতে গান্ধীজী ও বুর্জোয়া নেতৃত্বের ভূমিকা বেশ ভাল ক'রেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আজকের যুবকদের পক্ষে এ সবের পাঠ ও অনুধাবন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

পুস্তকটির বিবৃতিটি—একটি পুরা পুস্তকই—আট খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ডে ভূমিকা হিসাবে দেওয়া হয়েছে—'আমাদের সমাজ সম্বন্ধীয় মতবাদ'—এই শিরোনামায় মার্কসবাদের চুম্বক মতো পরিচয়, প্রসঙ্গত ভারতীয় বিপ্লব যে অনিবার্য এ বলে নেওয়ার এবং ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের শিরোনামা 'ধনতন্ত্র'। ইতিহাসে মানবসমাজের বিবর্তনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আজকের দিনে অনেককে এই আলোচনা আকর্ষণ করবে। পুস্তকের একটি উদ্ধৃতি হলো, "এটা বুঝতে হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় যে বুর্জোয়াকেই করতে হবে কিংবা তাদের শাসনে হ'তেই হবে এমন নয়।...একটা সন্তোষজনক ক্ষমতা পেলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়... এই ভাবে বুঝে নিতে হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক কাজ সম্পন্ন করার ভার সর্বহারা কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর সম্পাদন করার জন্য পড়ে থাকবে। ধনতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কসের বিশ্লেষণ ও লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য রেখে প্রথম যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অবস্থা পর্যন্ত ঘটনাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ ক'রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের ক্ষয় ও শেষ পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ১৯১৭ সালের বিপ্লব ও রুশ দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডের শিরোনামা "জাতীয় বিপ্লব"। এই সূত্রেই "বিপ্লব সম্পর্কে ভারতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা" আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে বৃটিশ শাসনকে বৈপ্লবিক পথে উল্টিয়ে দেওয়া এরা চাইবে না। "বুর্জোয়া কি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'কমপ্রোমাইজ' করতে পারে? সমঝওতায় আসতে পারে?" এই শিরোনামায় চিন্তাবর্ধক একটি পরিচ্ছেদ আছে। ত্রিশ দশকের গোড়ায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট নেতারা যা বলেছিলেন,

যুদ্ধ পর্যন্ত তার বাস্তব সত্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছিল। (স্বভাবতই বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা এখন যে পরিবর্তন সম্বন্ধে সুপরিচিত হয়েছি তার উল্লেখ থাকতে পারে না এবং নাই।) অসহযোগের হুঙ্কার সত্ত্বেও এবং ইংরাজের দেওয়া গঠনতন্ত্র অগ্রাহ্য করার হুমকি দেখিয়েও ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। পরে আবার সেই নতি স্বীকারে আসল কিছু আদায় করতে বিফল হলেন। শেষে আবার মন্ত্রীত্ব ছাড়তে এবং ইংরাজের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে আসতে বাধ্য হলেন—পরবর্তীকালের এ সব ঘটনার নির্দেশ আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁদের ভবিষ্যৎ-বাণীতে ফুটে উঠেছিল। যুদ্ধ পূর্ব অবস্থার বিবেচনায় তাঁরা বলেছেন যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ আসল কিছুই ছাড়তে প্রস্তুত নয় সেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে সমঝাওতা হবার কোনও ঠাই নাই। তবুও একবার আলোচনা ক'রে দেখেছেন—"It is worth while to see"—যদি কোনও মতে স্থায়ী কমপ্রোমাইজ হয়, কী অবস্থায় হতে পারে? তারপর "সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় থাকবে… বৃটিশ মূলধনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা চলবে না।…দেশের জনসাধারণের শোষণ চলতে থাকবে।…"

পঞ্চম খণ্ডে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রশ্নকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সতেরটি পরিচ্ছেদে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে কৃষকের দারিদ্র্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ছাড়া জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলের ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা আছে। ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ, কৃষির সংকট, উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক অভ্যুত্থান প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ যে কৃষিসঙ্কট সমাধান করতে পারবে না বরং সঙ্কট আরও গভীরে যাবে সে বিষয় আলোচনার পর বুর্জোয়াজীর সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক এবং এই প্রশ্নে বুর্জোয়াজীর দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় অবতারণা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের উপনিবেশ সংক্রান্ত থিসিস থেকে নিম্নের উদ্ধৃতি উদ্ধৃত ক'রে সমর্থন করা হয়েছে: "…বুর্জোয়াজীর আশু স্বার্থ জমিদারীর সঙ্গে এমন ভাবেই জড়িত…যে এরা শুধু কৃষিবিপ্লবের বিরুদ্ধে যায় তা নয়, যে কোনও চূড়ান্ত ধরনের সংস্কারেরও ওরা বিরুদ্ধে যায়…।" ভারতের ঘটনা থেকে একে চিত্রিত করা হয়েছে। জমিদারদের প্রতি বুর্জোয়া মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে রমেশ চন্দ্র দত্তের ইতিহাসে লেখক কর্তৃক জমিদারদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯১৯২০ সালেই

দেশের জনসাধারণ ও কৃষকের প্রতি বুর্জোয়াজী আন্দোলনের ডাক দিল। "নো ট্যাক্স" আন্দোলনের কথা হলো। "...রায়তওয়ারী এলাকাতে সমগ্র কৃষকশ্রেণী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে এগিয়ে গেল। অযোধ্যা ও আগ্রার জমিদারী এলাকা গুলিতে কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ল। এখানেই আসল পরীক্ষা ('এসিড টেস্ট'), আসল যাচাই এর ক্ষেত্রে উপস্থিত হল। কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে উঠে পড়তেই, জাতীয়তাবাদীরা তাদের সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। 'আইন অমান্য' প্রত্যাহার করা হলো। উত্থানে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদের গোলার সামনে নিক্ষেপ করা হলো...।" এর পর বিবৃতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিখ্যাত বারদৌলী প্রস্তাব উদ্ধৃত করা হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বলছেন: "...কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস কর্মী এবং অধস্তন সংগঠনগুলিকে রায়তদের জানাবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে যে খাজনা বন্ধ করা কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং দেশের স্বার্থের ক্ষতিকর। ওয়ার্কিং কমিটি জমিদারগণকে সুনিশ্চিত করে জানিয়ে দিচ্ছে যে কংগ্রেসের আন্দোলন তাদের আইনানুগ অধিকারের বিরুদ্ধে নয় এবং এমনকি যে ক্ষেত্রে রায়তদের বিক্ষোভ আছে সেক্ষেত্রেও ওয়ার্কিং কমিটির ইচ্ছা পারস্পরিক আলোচনা এবং সালিশীর মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করা হোক।" বিবৃতিতে বলা হলো: "এই প্রস্তাব কৃষি প্রশ্নে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি চুম্বকাকারে দিয়েছে।...পরে দেখা যাবে আইন সভায় যখনই প্রজাস্বত্ব বা মহাজনী ঋণ সম্বন্ধে কোনও আইনের প্রস্তাব বিধানসভাগুলিতে এসেছে কংগ্রেস জমিদার মহাজনদের যুক্তি ও স্বার্থকেই সমর্থন করেছে।..." বস্তুত সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে যাঁরা অবহিত তাঁরা জানেন, এই বাংলা দেশেই কংগ্রেস ঐরূপ সব আইনে ঐ ভাবেই জমিদার ও মহাজনদের সমর্থন করেছে। বাংলাদেশের কংগ্রেসেই এই কলঙ্কময় অধ্যায় ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের বিষয়নির্বাচনী সভাতেও উঠেছিল। উত্তর প্রদেশের একজন সদস্য বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জমিদারদের সমর্থন করবার আচরণকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিন্দা করার প্রস্তাব করেন। জে. এম. সেনগুপ্ত উঠে জবাবে বললেন, তাঁরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আনুষ্ঠানিক সমর্থন নিয়েই এ কাজ করেছেন এবং জমিদারদের হাতছাড়া করতে চাননা বলেই করেছেন। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ডিসেম্বর ২৭, ১৯২৮, পৃষ্ঠা, ৩ দ্রষ্টব্য)

গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, যার অনেক কিছুই আজকালকার তরুণদের জানা তো নাই, অন্যত্র প্রাপ্যও নয়। শেষে সমস্যা সমাধানে কমিউনিস্টদের নিজেদের বক্তব্য রাখা হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংগঠন আলোচিত হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য আসামীদের অভিযুক্ত করা হয়নি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আঘাত করা হয়নি, আঘাত করা হয়েছে শুধু ট্রেড ইউনিয়নে 'বহিরাগত' বিপ্লবীদের এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এজেন্টদের। আসামী পক্ষ সাফল্যের সঙ্গে সরকার পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনের এই যুক্তিকে আঘাত করেন। বস্তুত শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আঘাত করার জন্যই যে তাঁদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের চেষ্টা হচ্ছে আসামী পক্ষ তার অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করেন। ট্রেড ইউনিয়নের রিফর্মিস্ট ব্যাখ্যা তাঁরা অস্বীকার করেন এবং দেখান "জন্ম হতেই ট্রেড ইউনিয়ন একটি বিপ্লবী আন্দোলন—যার লক্ষ্য থেকেছে শুধু তার সংগঠনের সদস্যদের জীবনের মান উন্নয়ন নয়—ধনতন্ত্রের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।" 'বহিরাগত' হওয়ার অভিযোগের উত্তরে বলা হয়েছে "…যেটুকু সত্য এর মধ্যে আছে তার কারণ এই যে বুর্জোয়াজীদের প্রেরিত 'বহিরাগত'দের কাজ চলেছে দীর্ঘ দিন ধরে এবং সজোরে। ১৫ বৎসর পূর্বে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর গণসংগঠন ও সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে প্রচুর সংখ্যায় বুর্জোয়া এজেন্ট এই আন্দোলনে প্রেরিত হয়। এরা নানা রকমের-স্বতন্ত্র 'মানব হিতৈষী', উদারনীতিক, থিওসফিস্ট, কংগ্রেসী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং পুলিশ এজেন্ট। এরা আন্দোলনকে নানান রকমের প্রতিবিপ্লবী ধ্যান ধারণা দিয়ে দূষিত (corrupt) করছে। যাই হোক, আমরা বলতে চাই যদি আমরা বহিরাগত হই আমরাই একমাত্র বহিরাগত নই।…" তাঁরা জোরের সঙ্গে উপস্থিত করেন যে কমিউনিস্ট পার্টি—শ্রমিক আন্দোলনের বাহিরের প্রভাব নয়। 'কমিউনিস্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়নের নেতা' এ কথা বলে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক এবং কি ভাবে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ট্রেড ইউনিয়নে সঞ্চালিত হয় তার ব্যাখ্যা করেন। সংস্কারবাদী ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পার্থক্য দেখানো হয়। সারা বিশ্বে এবং ভারতে উভয়ের

সংঘাত দেখানো হয় এবং বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সংস্কারবাদীরা কেমন ভাবে ধনতন্ত্রের স্বার্থ এবং বিপ্লবীরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, তাও দেখানো হয়। প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা ধরে ট্রেড ইউনিয়নের সামগ্রিক সমস্যা ও তার সমাধান আলোচিত হয়েছে।

সপ্তম খণ্ডে কমিউনিস্ট পার্টির ট্যাকটিস্ বা রণকৌশল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ফ্র্যাকশন, আশু দাবীর সংগ্রাম, জাতীয় বুর্জোয়াজী, ইউনাইটেড ফ্রন্টের কৌশল, গান্ধীবাদ, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ, গঠনতান্ত্রিক অগ্রগতি, বুর্জোয়াজীর 'বৈপ্লবিক' ভাবভঙ্গি, বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম, সহিংস পন্থা—প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি বিষয় এখনও আলোচিত হচ্ছে। 'গঠনতান্ত্রিক অগ্রগতি' শিরোনামার পরিচ্ছেদে গঠনতান্ত্রিক উপায়ে বিপ্লবের লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছানো সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "এই প্রশ্নের ভারতে এখনই কোনও ব্যবহারিক গুরুত্ব নাই। কিন্তু শাসন সংস্কার ও ভোটক্ষমতা প্রসারের দ্বারা জনগণের মনে, এমন কি শ্রমিকশ্রেণীর মনে সংসদীয় ভাবধারার ভ্রান্ত ও অলীক ধারণা উৎসারিত করার প্রচেষ্টা সম্ভব। আমাদের মত…এমন কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পূর্ণতম বিকাশ ও সার্বজনীন ভোটাধিকার আছে এমন ক্ষেত্রেও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সংসদীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব…" 'কমিউনিস্ট রণকৌশলের' বিস্তৃত আলোচনা এই পরিচ্ছেদে আছে।

অষ্টম ও শেষ খণ্ডে, যে সব বিষয় অভিসন্ধিমূলক প্রচারের ফলে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি থাকে সেই সব কতকগুলি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পরিবার, মেয়েদের অবস্থা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্ম, বুর্জোয়া মর্যালিটি, রাজশক্তি, আইন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় নিদর্শিত বুর্জোয়া 'ন্যায্য ব্যবহারের' (fair treatmentএর) নমুনা এবং শেষে উপসংহার দিয়ে বিবৃতি শেষ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, স্বাধীনতার পূর্বে, যুদ্ধের পূর্বে এমনকি ১৯৩৫ এর শাসন সংস্কারের পূর্বের লেখা এই বিবৃতির কিছু কিছু অংশ স্বভাবতই এখন অপ্রযোজ্য হতে পারে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরং সেরূপ অংশের স্বল্পতা, নগণ্য স্বল্পতাই আশ্চর্য লাগে। সাময়িক প্রয়োজনে লেখা হলেও, এর স্থায়ী মূল্য আছে। বরাবরই এ পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করবে এবং রাজনৈতিক দিক দিয়েও এর প্রয়োজন এখনও অনেক।

উভয় বাংলায় দাঙ্গা কেন হয়

কয়েকদিন ধরে বাংলার বুকে ভয়াবহ যে এক ঘটনা ঘটে গেল এখনও সে আগুনের রেশ নিঃশেষ হয়নি। উভয় বাংলার হাজার হাজার মানুষ জঘন্যতম নৃশংস আক্রমণে বাস্তুচ্যুত—তার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নিহত ও আহত।

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর মাঝে মাঝে কিছু ঝড়-ঝাপটা আসলেও মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। এরূপ প্রচণ্ড আঘাত (অতীত অপেক্ষা অনেক বেশী প্রচণ্ডতর) পুনরায় আসতে পারে—একথা কেউ অনুমান করতে পারেনি।

শান্তিপূর্ণভাবে অহিংস সগ্রাম ও তার ফলে স্বাধীনতা—এই ছিল বুর্জোয়া-শ্রেণীর পরিকল্পনা। কিন্তু তাদের ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্ মুহূর্তে ও সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের মঙ্গল শঙ্খনাদকে ডুবিয়ে দিয়ে ভারতের আকাশ-বাতাস মথিত ক'রে উঠল আর্তের চীৎকার। অসহায় নারী-শিশু-বৃদ্ধের হত্যায় দেশের মাটি রক্তে ভিজে গেল; ভারত মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, আফগান সীমা পর্যন্ত গৃহদাহের লেলিহান শিখা নূতন দিনের আলোর স্থান অধিকার করল।

এ অবশ্য সত্য ইংরেজকে রক্ত দিতে হলো না। কলকাতা ও ঢাকায়, দিল্লী ও করাচীতে ইংরেজ সন্তান সদর্পে পদচারণা করতে লাগল—একদিন যেমন তারা করেছিল—পলাশীর যুদ্ধের পর আর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বা 'সিপাহী বিদ্রোহে'র পরাজয়ের পর।

শান্তিবাদিতা ও রক্তহীনতার প্রতিশ্রুতি আকাশে মিলিয়ে গেল। তাকে প্রহসন ও ব্যঙ্গে রূপান্তরিত করে ভারত ও পাকিস্তানের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী

বিঃ দ্রঃ—দাঙ্গা সম্পর্কিত এই অধ্যায়টি ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সাপ্তাহিক দেশহিতৈষী পত্রিকার (১৯৬৪ সালের ১৪ই ২১শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত) জন্য ঐ সময়েই লিখিত।

তাদের কদর্যতম ও ঘৃণ্যতম রূপ প্রকাশ করল। ইংরেজের পরিবর্তে সংখ্যালঘুর রক্তে তারা দ্বিখণ্ডিত পবিত্র ভারত-ভূমি রঞ্জিত করল।

কিন্তু অপরাজেয় সাধারণ মানুষ মোড় ঘুরাল। নিজের অপকীর্তির জঘন্যতম প্রকাশে ও উদ্ভূত সমস্যায় ভীত ও সন্ত্রস্ত শাসকশ্রেণীকেও থমকিয়ে দাঁড়াতে হল এবং শান্তির পথের সূচনা করতে হল।

এই অবস্থায় ১৯৫০ সালের নেহরু-লিয়াকত আলী চুক্তি তৈরী হল। চুক্তির বক্তব্য যাই হোক দাঙ্গা-হাঙ্গামা-উদ্বাস্তু সমস্যা জর্জরিত উভয় দেশের শান্তিকামী সাধারণ মানুষের শান্তি কামনার মূর্ত প্রকাশ হিসাবে সেই সময় তা দেখা দিয়েছিল। আর এই অন্তর্ঘাতি বিভেদ কলুষের মধ্যেও উভয় দেশে সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ বন্ধ করার এবং নিরস্ত্র নারী ও অসহায় শিশুর রক্তে রাঙা অস্ত্র সংবরণের ঘোষণা হিসাবে এই চুক্তি সম্বর্ধিত হয় এবং শান্তির পথে আশু কার্যকরী অস্ত্র হিসাবেই পরিগণিত হয়।

চুক্তির অব্যবহিত পূর্বে বুর্জোয়া নেতৃত্বের দেউলেপনা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা তাঁদের স্বীকৃতিতেই বোঝা যায়। "...ভাগ্য ও কালচক্র যে সময় আমাকে রাজনৈতিক জীবনে প্রবিষ্ট করিয়েছিল তখন থেকে আমি যে সব আদর্শের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম তা সবই মনে হল ম্লান হয়ে অবলুপ্তপ্রায় হয়েছে। এরই জন্য কি আমরা বৎসর বৎসর ধরে অধ্যবসায় করে গেছি?" (লোকসভায় নেহরুর বক্তৃতা, এপ্রিল ১০, ১৯৫০) "...মনে হল আমাদের নোঙরের খুঁটি হারিয়েছি এবং অন্ধ ভবিষ্যতের দিকে অন্ধের মত হাতড়ে চলছি..." (নেহরু, রেডিও বক্তৃতা, এপ্রিল ১০, ১৯৫০)।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর নেহরু বললেন, "সৌভাগ্যবশতঃ আমরা পার হয়ে এসেছি:..." উভয় দেশের প্রবঞ্চিত সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে লিয়াকত আলী বললেন: "আমি এই চুক্তিকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা নতুন পারস্পরিক বোঝাপড়ার অগ্রদূত বলে মনে করি..." (পাক পার্লামেন্টে বক্তৃতা, এপ্রিল ১০, ১৯৫০)।

চুক্তির মধ্যে কি ছিল? উভয় দেশের জনমত, শান্তির প্রয়োজনীয়তা, অন্ধ নৃশংসতার বিপজ্জনক ফল সম্বন্ধে দেউলে বুর্জোয়া নেতৃত্বের চেতনালাভ, —সব মিলিয়ে শান্তির পক্ষে চুক্তিটিকে বেশ কিছুটা শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবেই পরিণত করা হল।

নহলে চুক্তির ছত্রগুলো পড়লেই দেখা যাবে চুক্তির মধ্যে এমন কিছু

অন্তর্নিহিত ('বিল্ট-ইন') ব্যবস্থা নেই যা আপনি আপনি কার্যকর। চুক্তির কার্যকরিতা নির্ভর করে শর্ত পালনে। এবং শর্তগুলোও এমন কিছু নয় যা পালনের জন্য একটা চুক্তির প্রয়োজন ছিল। শর্তগুলো এমন যা যে কোনও সভ্য গভর্নমেণ্টের যে কোনও দেশে যে কোন সময় অবশ্য করণীয়। নাগরিকের ধন-প্রাণ রক্ষার প্রচেষ্টা তো যে কোনও সভ্য সরকারের সাধারণ কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়। তেমনই নির্দোষ নারী-শিশুহত্যার জন্য দণ্ডদান ব্যবস্থাও সব সভ্য দেশের আইনেই আছে। একটি প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় তৎকালীন সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রাসঙ্গিকভাবেই লেখা হল: "এই চুক্তি আদৌ প্রয়োজন হল কেন? অপরাধ করলে অপরাধী ব্যক্তিদের যে শাস্তি দেওয়া উচিত, এর জন্য কি চুক্তির দরকার হয়? হৃত সম্পত্তি উদ্ধার ও লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ কি যে কোনও সভ্য দেশের গভর্নমেণ্টের কর্তব্য নয়? নারী নিষাতনের প্রতিকার ইত্যাদির জন্য কি একটা চুক্তি করতে হয়? **এরূপ এবং অন্যান্য অনুরূপ সামান্য সামান্য জিনিসের জন্য যে চুক্তির প্রয়োজন হলো এতেই বোঝা যায় যে যেসব গভর্নমেণ্ট দুই প্রধান-মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত এরূপ চুক্তিতে অংশ গ্রহণকারী তাদের গঠনতন্ত্র, চেহারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই একটা অত্যন্ত য়্যাবনর্ম্যাল কিছু আছে।**..." (অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় এপ্রিল ১২, ১৯৫০, বড় হরফ আমার—লেখক)। এই মন্তব্যে সম্পাদক মহাশয় যে রোগস্থানে ঠিকই স্পর্শ করেছেন তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি গভর্নমেণ্টের য়্যাবনর্ম্যালিটি তথা বিশেষ একটি ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রই যে বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী তা অনস্বীকার্য। ইংরেজের দেশের সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর যোগসাজশে যা ভূমিষ্ঠ হলো সে গভর্নমেণ্টের চরিত্র এমনই যে সাধারণ সভ্য গভর্নমেণ্টের কর্মসূচীও সেখানে চুক্তি ক'রে করতে হয়।

চুক্তিতে আছে অপরাধীদের দণ্ডদান করতে হবে ও সংবাদপত্রের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন প্রচার বন্ধ করতে হবে। চুক্তিতে এ কথা লিখতে হলো এজন্যই যে এটা করণীয় হলেও করা হয় না। আজকের ঘটনাতে প্রমাণিত হয়েছে তা হয় না।

চুক্তি হিসাবে চুক্তির বাঁধুনিতে ত্রুটিও এখানে। অনুচ্চারিত অন্তর্নিহিত ভাবে এ কথা স্বীকৃত হচ্ছে যে গভর্নমেণ্ট দুটি তা করে না যা তাদের করা উচিত কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তা উল্লেখ করা হচ্ছে না বা কর্তব্যের অবহেলা যে ইতিবাচক অনবধানতার ত্রুটি নয়, বরং ইতিবাচক অর্থে অপরাধ—তা গৃহীত হচ্ছে না।

দুটি দেশের শাসকশ্রেণী বনাম জনসাধারণ

ইংরেজের আশীর্বাদ প্রাপ্ত উভয় দেশের বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীই এই দুই দেশে জঘন্যতম দাঙ্গার অপরাধে অপরাধী। তাদের শাসনব্যবস্থা সাক্ষাৎভাবে দাঙ্গার প্ররোচনা দেয়, দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করে, শান্তিকামীদের বিপর্যস্ত করে। অথচ সবসময়েই তারা জনসাধারণের স্কন্ধেই এর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়।

দাঙ্গা করার সময় এদের অদ্ভুত স্লোগান। এই স্লোগানের মর্মার্থকে সাধারণ সূত্র আকার রাখলে এরূপ দাঁড়ায়:

একদেশের গভর্নমেণ্ট বা সংখ্যাগুরুর সৎ আচরণের জামিন আর এক দেশের সংখ্যালঘু। প্রথমোক্ত কর্তৃক সৎ আচরণে ত্রুটি হলে শেষোক্তর ধন, প্রাণ, সম্পত্তি সম্মানহরণ ন্যায্য ও করণীয়।

অন্য যে কোনও বিষয়েই দুটি দেশের শাসকশ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু উপরোক্ত সূত্রতে উভয়েই একমত।

নৈতিকভাবে হৃতসর্বস্ব, সাম্রাজ্যবাদের কৃপাভিক্ষার কিউ এ দণ্ডায়মান, জনসাধারণের সমস্যা সমাধানে অসমর্থ শাসকশ্রেণী নিজেদের কলহ এবং অযোগ্যতার সমাধান করতে অপারগ হয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সংখ্যালঘুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করে। তাদের দেউলেপনার এই পরিণতি।

কিন্তু মজা এই যে দাঙ্গার সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি, এমন কি তার অপবাদ জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে 'বুর্জোয়া ক্যাণ্ট'-এর (বুর্জোয়া ভণ্ডামি) অধুনাতম নিদর্শন দেখিয়ে এরা পাশ কাটাতে চেষ্টা করে।

জনসাধারণের একাংশ, সংখ্যালঘুর যায় ধন-প্রাণ-মান-সম্পত্তি প্রভৃতি সব কিছু। অন্যদিকে দাঙ্গার সমস্ত দায়িত্ব জনসাধারণের আর এক অংশের ওপর অর্থাৎ সংখ্যাগুরুর ওপর আরোপ ক'রে বলা হয়, বিক্ষুব্ধ জনসাধারণই দাঙ্গা করেছে।

প্রতি ক্ষেত্রেই আসল অনুষ্ঠাতারা নিজেদের যবনিকার অন্তরালে রাখেন।

১৯৫০ সালের নেহেরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির প্রধান ত্রুটি এখানে যে, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ ঘটলে তার প্রধান আসামী যে সংশ্লিষ্ট সরকার এবং তার কর্মচারীগণ এ সত্য কথাটার স্বীকৃতি তাতে নেই। উভয় দেশের সরকারই আইন ও শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কিভাবে দাঙ্গার প্ররোচনায় ও প্রসারে ব্যবহার করেন তা তাঁদের

অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকালেই দেখা যায়। শত শত নিরপরাধ কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক কর্মীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে অথচ দাঙ্গা অনুষ্ঠানের পূর্বে একজনও দাঙ্গার উস্কানিদাতাকে দণ্ড দেওয়া হয়নি বা আটক করাও হয়নি। শাসকবর্গের সংবাদপত্রগুলি অবাধভাবে দাঙ্গার উস্কানি দিয়ে থাকে। চুক্তিতে এর প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি থাকলেও ব্যবস্থা করা হয় না।

দাঙ্গা রোধ করতে সমাজতান্ত্রিক দেশের কাজ

ধনতান্ত্রিক অথবা মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে যে দেশের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা পরিচালিত সেখানে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য শাসন পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িকতা, ভেদ পন্থা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। সাম্রাজ্যবাদের মূল কথাই 'divide and rule' বা জনগণকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শাসন কার্য চালাও। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত যে আমলাতন্ত্র স্বাধীন ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে তাদের মনোবৃত্তি এই নীতিতে কতখানা প্রভাবিত তা বিচার করা প্রয়োজন।

শিরোনামায় নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তি সম্বন্ধে বিশদভাবেই আলোচনা করেছি। কিছুটা ত্রুটির জন্য পাকিস্তান এবং ভারত এই উভয় দেশেই চুক্তির সামান্য শর্তগুলোও প্রতিপালিত হয়নি। বিদেশের একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এই ত্রুটিটুকু আরও পরিষ্কারভাবে বলবার চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ডে প্রথম যখন জনসাধারণের রাষ্ট্র স্থাপিত হল তখন ইহুদি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পোগরম বা দাঙ্গার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। বহুদিন ধরে পোল্যাণ্ড বিদেশী রাষ্ট্রের অধীন বা প্রভাবাধীন ছিল, যুদ্ধকালে কয়েক বৎসর ফ্যাসিস্ত জার্মানীরও অধীনে ছিল। সুতরাং পুরাতন সমাজের নানাবিধ গ্লানি তখনও সমাজদেহে বর্তমান। সাম্রাজ্যবাদ তাকে কাজে লাগিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করতে না পারে তার জন্যই এই প্রতিরোধক ব্যবস্থা।

নব-গঠিত জনগণতান্ত্রিক সরকার একটা আইন পাস করলেন, তাতে নির্দিষ্ট হল—কোনও স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলেই প্রথম ও প্রধান আসামী হবে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অক্ষমতার অপরাধে অপরাধী বলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের দণ্ডদান ব্যবস্থা রইল। এরূপ আইনের দ্বারা জনসাধারণের স্কন্ধে দোষ চাপিয়ে সরকারী দায়িত্ব এড়িয়ে

যাওয়ার কৌশল অসম্ভব করা হল। এইরূপে সাম্রাজ্যবাদের কৌশলকে সফলভাবেই পরাজিত করা হল।

নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তিতে আছে—দুই সরকারই "সংবাদপত্র, রেডিও, ব্যক্তি বা সংগঠন মারফত সাম্প্রদায়িক প্রচার জাগরিত করা হয় এমন প্রচার বন্ধ করার জন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তির অনুচ্ছেদ 'গ-৭')। কিন্তু দুটি দেশের কোনটিতেই এরূপ প্রচার বন্ধ করা হয়নি। এই না-করাটাই একটা অপরাধ। এর দ্বারাই দাঙ্গার সংগঠনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং এই 'না-করা'র অপরাধের অপরাধীদের দণ্ডদানের ব্যবস্থা চুক্তিতে থাকল না কেন?

অনুরূপভাবে উপরোক্ত চুক্তির (গ) ধারায় আরও আছে দাঙ্গা যাতে না হয় তার জন্ত উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ও দাঙ্গাকারীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা। অথচ লক্ষণীয় যে, গত দাঙ্গার প্রথম কয়েকদিন এ সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই গৃহীত হয়নি। এই ব্যবস্থা গ্রহণ 'না-করা'টাই একটা মস্ত বড় অপরাধ। কারণ রাষ্ট্র কর্তৃক আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার এদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এ বিচারে প্রধান আসামী হওয়া উচিত পাকিস্তান ও ভারতের পুলিস কর্তৃপক্ষ ও তাদের পরিচালক রাজনৈতিক শক্তি।

পূর্বেই বলেছি চুক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়নি। শান্তির অনুকূলে যে সামাজিক শক্তি তার হাতিয়ার হিসাবে এই চুক্তি মাঝে মাঝে কাজে লেগেছে। এ কথা সত্য, অনেক সময় (যেমন এখন) চোখের সামনে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তিকে অর্থহীন মনে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অস্বীকার করা যায় না যে, যখন শান্তির পরিবেশকে মেনে নেওয়া হয়েছে তখন দুই সরকারের কাজের পদ্ধতির নির্দেশ হিসাবে এই চুক্তি কাজে লেগেছে। অবশ্য এ সবের ওপর বড় সত্য হল অনুকূল রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে কোনও চুক্তিই স্বতন্ত্রভাবে কার্যকরী হওয়া কঠিন (এ বিষয় পরে আলোচ্য)। কিন্তু ওপরে বর্ণিত কারণে সীমাবদ্ধ হলেও চুক্তিরও কার্যকরিতা আছে। সুতরাং চুক্তি, চুক্তির বিষয়বস্তু, রচনা প্রভৃতির আলোচনা প্রাসঙ্গিকও প্রয়োজন। সে আলোচনায় চুক্তির উন্নতিই কাম্য, বর্জন নয়। শান্তির অনুকূলে সামাজিক শক্তিসমূহ আরও কার্যকরীভাবে কাজে লাগাতে পারে এমনভাবে চুক্তির উন্নতির প্রস্তাবের দাবি সমীচীন ও প্রয়োজন।

এইরূপ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করে পূর্বের চুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা উচিত

এমন ক'টি বিষয়ের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। যথা:—(১) এক দেশের সংখ্যালঘুকে আর এক দেশের সরকার ও সংখ্যা-গরিষ্ঠদের কাজের জন্য দায়ী বা 'হসটেজ' (hostage) বলে বিবেচনা করা চলবে না। (২) যাতে আভাসে ইঙ্গিতে ওরকম ধারণা প্রকাশ পায় ওরকম কোনও প্রচার বা কাজ গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে। (৩) যেহেতু প্রাণ ও গৃহের নিরাপত্তা রক্ষা প্রধানতঃ নাগরিক অধিকার সেহেতু তাকে বিপন্ন করার দিকে সামান্যতম উস্কানির ইন্ধন যোগায় এমন প্রচার নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করতে হবে। কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে তার অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রের উস্কানিমূলক প্রচারকদের প্রধানতঃ দায়ী ক'রে তার জন্য যাতে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা যায় উভয় রাষ্ট্রে এরূপ নির্দিষ্ট আইনের দাবি করতে হবে। (৪) কোনও স্থানে দাঙ্গা ঘটলে বা সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচার হলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষ যাতে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ও প্রধান আসামী বলে পরিগণিত হন এবং উৎপীড়িতের ক্ষতির পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হয় উভয় দেশের আইনে এরূপ বিধান রাখতে হবে।

উপরের প্রস্তাব নিছক ছক-কাটা পরিকল্পনা ('স্কিম্যাটিক') নয়। চুক্তির যে সব জায়গায় শাসকশ্রেণীর দুর্বলতাগুলোকে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে (এবং তাও রাজনৈতিক কারণে) তারই মাত্র কয়েকটিকে সুস্পষ্ট করা হল। উভয় দেশে এরূপ বা আরও বর্ধিত প্রস্তাবের দাবির ওপর আন্দোলন চলে শাসকশ্রেণীর দুর্বলতা উদ্‌ঘাটিত হয় এবং শান্তির পক্ষে অনুকূল জনশক্তি শক্তিশালী হয়।

[এই অধ্যায় লেখার পর দেখা গেল যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে সংখ্যালঘুকে 'হসটেজ' বিবেচনা না করার কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর শাসন ব্যবস্থায় তাই করা হয়েছে; যেমন সংখ্যালঘুদের প্রাণ ও আবাসিক নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়নি। এই ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দণ্ডদানের ব্যবস্থা কি তিনি করবেন?

ভারতে কলকাতার পুলিস কমিশনারকে স্বাস্থ্যের কারণে সাময়িকভাবে ছুটি দেওয়া হয়েছে এবং এই ছুটি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই ছুটি দেওয়া অর্থপূর্ণ বলে অনেকে মনে করেন। উভয় রাষ্ট্রে সরকারীকর্মচারী ও কর্তৃপক্ষকে প্রধান আসামী করার দাবির প্রস্তাব কি ভারত সরকার তুলবেন?

ভারতের নির্দেশনে পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট কি খুলনায় এস-পি ও ম্যাজিস্ট্রেট সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?]

বলাবাহুল্য, অনুকূল রাজনৈতিক শক্তি ব্যতিরেকে যে কোনও চুক্তিই তার কার্যকরিতা হারিয়ে থাকে। নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তির ক্ষেত্রেও এটা দেখা গেছে। অনুকূল রাজনৈতিক শক্তির প্রথম ও প্রধান কথা অবশ্যই উভয়দেশের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবস্থা। কিন্তু আজকের দিনে কোনও দেশই বিচ্ছিন্ন নয়। সেজন্য আন্তর্জাতিক জগতের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অতীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ইতিহাসে কয়েকটা জিনিস বিশেষভাবে দেখা যায়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলন যখন জোরদার হয়েছে, ইংরেজও দাঙ্গাহাঙ্গামা দিয়ে সেই আন্দোলনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার সুযোগের খোঁজে থেকেছে। আপসহীন সংগ্রামের মুখে এ সুযোগ তারা পায়নি। যখনই আপসের পথ গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর বিশ্বাসভঙ্গের ফলে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে, তখনই ইংরেজ ও তার অনুচরেরা দাঙ্গাহাঙ্গামার ছুরি জনগণের পৃষ্ঠদেশে বসিয়ে দিয়েছে। পশ্চাদ-পসরণকারী বুর্জোয়াশ্রেণী এই হীনকাজে সহায়ক হয়েছে। • কি ইংরেজ আমলে, কি বর্তমানে—বুর্জোয়াশ্রেণীর কাগজগুলিই তারস্বরে বুর্জোয়াশ্রেণীর ঘৃণ্য ভূমিকা প্রচার করে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেখা গেছে, সে সময় ইংরেজ হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নকে বড় করে তুলতে পারেনি। (সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত '১৮৫৭' পুস্তকের মৌলানা আজাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ঐ বিদ্রোহের পর হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে জাগিয়ে তোলা হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জনমতকে এভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলন চলাকালীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাম্প্রদায়িক বা জনবিরোধী দুষ্কৃতির কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়নি। তাই গণ-আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যেও সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত ও অপচেষ্টা সুকৌশলে অনুষ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক সংগ্রামই দাঙ্গা রোধের উপায়

কোনও শক্তিশালী গণ-আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অথবা আন্দোলন চলার সময় সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ জনতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে সংগ্রামকে বানচাল

করবার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠনের চক্রান্ত হয়। কিন্তু আন্দোলন চলা-কালে কোনও দিন কায়েমী স্বার্থ তাঁদের এই অপচেষ্টায় সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টায় সামন্ত-বুর্জোয়ানেতৃত্বের কিছুটা সাফল্যের পর এবং বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক দ্বিখণ্ডন রোধের আন্দোলন কালে এলো সাম্রাজ্যবাদী আঘাত। সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণী মর্লে-মিণ্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার মেনে নিল। বস্তুতঃ কার্যক্ষেত্রে তা তাদের দ্বারা অভিনন্দিত হল।

অথচ এই মর্লে-মিণ্টো সংস্কারে থাকল সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ভোটাধিকার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা। অর্থাৎ বাংলার ভৌগলিক ও শাসনতান্ত্রিক ভাগের বদলে বাংলার তথা দেশের সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক ভাগ কার্যক্ষেত্রে গৃহীত হল: জনসাধারণের হাতে সামান্যতম ক্ষমতা না দেওয়া সত্ত্বেও বিধান পরিষদকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সুবিধানুযায়ী মনোনয়ন ভারাক্রান্ত করা হল। তথাপি সুযোগসন্ধানী বুর্জোয়া-সামন্ত শ্রেণী কর্তৃক তা অভিনন্দিত হল। উক্ত শ্রেণীদ্বয় বিশেষ করে বাংলার জমিদার শ্রেণী জনগণের ব্যাপক ভোটাধিকার বা গণপ্রভাবের বিরোধী। মুসলমান জমিদার ও ধনিক শ্রেণী সংখ্যাল্প কিন্তু তাঁরাও অনুরূপ সুযোগ সন্ধানী। তাঁরা ও তাঁদের প্রভাবাচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গরীব হিন্দুসহ গরীব মুসলমানদের অর্থাৎ সমগ্র জনতার দাবি আদায়ের কথা না বলে সংকীর্ণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজ শ্রেণীর সুবিধার জন্য ইংরেজের সাথে আপস দ্বারা কি করে পৃথক নির্বাচন আদায় করা যায় তারই চেষ্টায় ছিল এবং তা সার্থক হওয়ায় পুরোদমে ছোট-খাটো সুযোগ সুবিধা আহরণে প্রবৃত্ত হল। হিন্দু ও মুসলমান জমিদার বুর্জোয়া ও তাদের সহযোগী বা তাদের ওপর নির্ভরশীল অংশের পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের খুঁটিনাটি অসন্তোষকে অবলম্বন করে পুরোদমে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করলো।

এখানে বেশি আলোচনা করার স্থান নেই। অনুরূপভাবে প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় ও তার অব্যবহিত পর, ১৯১৯ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়নি। আন্দোলন চলাকালে চৌরি-চৌরায় থানাটি জনতা কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ হল। এটা সহিংস, এই অজুহাতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু আন্দোলন বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রচার দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদ দিল অহিংসের সহিংস প্রতিদান। ১৯২৬ সালে সারা ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি হল। তখন মনে হয়েছিল এই দাঙ্গাহাঙ্গামার অনাচার বোধ হয় আর ঘুরানো যাবে না।

কিন্তু ১৯২৯ সালে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ ও তৎপর ১৯৩০ এর আন্দোলনে এমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার ঢেউ বয়ে গেল যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা দূর হয়ে গেল। ১৯৩৪ পর্যন্ত কোনও হাঙ্গামা থাকেনি। সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার, ইংরেজের সঙ্গে সমঝাওতা ও সীমাবদ্ধ সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে দরকষাকষি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে, ১৯৩৪ সালে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (কানপুর, বোম্বাই প্রভৃতিতে ১৯৩৪-এ)।

যুদ্ধকালে পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ বিষাক্ত আবহাওয়া চলল। তিরিশ দশকের শেষাংশে আবহাওয়া যেরকম বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল তা যে সহজে প্রশমিত হবে সে ধারণা করাই কঠিন ছিল। কিন্তু যুদ্ধকালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ হল।

কিন্তু যেমনই বুর্জোয়া নেতৃত্ব ১৯৪৫-এর গণ-সংগ্রামের অভ্যুত্থানকে বন্ধ করল ও ইংরেজের সঙ্গে সমঝাওতায় বসল, সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল ১৯৪৬-এর দাঙ্গা।

স্বাধীনতার পরও ঐ একই সূচক, একই সঙ্কেত দেখা গিয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও নানান ব্যাপারে ইংরেজের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থাতেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি কম বেশী অবিচ্ছিন্নভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। উপনিবেশবাদকে নূতন ছাঁচে ঢেলে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এশিয়া আফ্রিকার দেশ সমূহ ক্রমাগত এর প্রতিরোধ করে চলেছে।

বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনতা তাদের সমর্থনে ভারত সরকারের ভূমিকা যেরূপ আশা করেছিল তখন পর্যন্ত তা হয়নি। কোরিয়ার যুদ্ধে ভারত মার্কিন ও বৃটিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া নেতৃত্বের এরূপ ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতির সময়েই ঘটে ১৯৫০ সালের দাঙ্গা।

পঞ্চম দশকে ভারতের ভিতর ও বাইরের ঘটনাস্রোতে কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। বান্দুং সম্মেলন ও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর

করার প্রয়াস'এর নিদর্শন। দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর দল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আবির্ভূত হল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় দশ বৎসর ধরে অপেক্ষাকৃত শান্তি, ভারত ও পাকিস্তানে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শক্তির জাগরণ ও সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের বৃদ্ধি ও প্রসার।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় আবার ১৯৪৭-৫০-এর মতো অবস্থা ভারতে দেখা যাচ্ছে। ভারত সরকারের সম্পর্ক এখন এশিয়া ও আফ্রিকার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সরকারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ মনে হয়।

দেশের অভ্যন্তরে মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক জনজীবনের ওপর ব্যাপক আক্রমণ; রাজনৈতিক প্রতিরোধ অসম্ভব করার বা শিথিল করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর ওপর আক্রমণ ও নানা ভিত্তিহীন অজুহাতে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা—এই হলো বর্তমান অবস্থা।

অতীতেও দেখা গেছে এরূপ অবস্থাই সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গাহাঙ্গামাকে আমন্ত্রণ করে।

আজ যদি আবার ভারত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরের অগ্রভাগে আসে তা হলে ভারত, এমন কি পাকিস্তানের জনগণকেও বিভ্রান্ত করা কঠিন হয় এবং দাঙ্গা নিরোধের শক্তি কয়েকগুণ শক্তিশালী হয়।

দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রতিরোধে কোনো রূপ প্রয়াসই শিথিল করা উচিত নয় এবং সব রকম চেষ্টারই মূল্য আছে। কিন্তু এ কথা ভোলা যায় না যে জরুরী অবস্থার সুযোগে প্রতিক্রিয়ার শক্তি পুঞ্জীভূত হচ্ছে, সমাজের যে শক্তি সামনে এসে শান্তি ও দেশের ঐক্যের পথ দৃঢ় করতে পারে তাকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করা হচ্ছে।

তাই একদিকে যেমন শান্তির জন্ত ও আর্তের সেবায় আপাতঃ চেষ্টা প্রয়োজন হয়েছে তেমনই জরুরী আইন প্রত্যাহার ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রয়োজন। এ আওয়াজ জোরদার করার দরকার আছে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন যত গভীর ও ব্যাপক হয় পাকিস্তানেও গণচেতনায় তার শিহরণ সঞ্চারিত হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনই দাঙ্গা বিরোধী প্রয়াসের দৃঢ় অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়।

গান্ধীজীর আবিষ্কার ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মার্কস-এঙ্গেল্‌স্

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। ব্যাপারটা ঘটলো ভারতে নয়, ভারতের বাইরে পৃথিবীর বৃহত্তম শহর লণ্ডনে। ঘটনাটা কী তা পরেই বলছি। প্রথমে একটু জানা কথা আউড়ে নিই।

গ্রাম উন্নয়ন, গ্রাম উদ্যোগ ইত্যাদিই গান্ধীবাদীদের কাজ, এইটাই তাঁরা বরাবর দেশের মানুষকে বুঝিয়ে এসেছেন। অথচ এইসব গঠনমূলক কাজের প্রচারক তখনকার ভাষায় নোচেঞ্জারদেরই* দেখা গেল যে তাঁরা নেপথ্যে-স্বরাজ দলের নির্বাচনের পাণ্ডা। আর স্থানীয় পৌরসভা প্রভৃতিতে সর্বত্র তাঁরা সরাসরি ময়দানেই নেমেছেন। সুযোগ উপস্থিত হতেই দেখা গেল ত্রিশ

* নোচেঞ্জার—গান্ধীজীর ১৯২১-২২ এর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর পরবর্তী কার্যসূচী নিয়ে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতান্তর হয়। এক পক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মণ্টফোর্ড সংস্কারে গঠিত আইনসভাগুলিতে প্রবেশ করার পক্ষপাতী, অন্যপক্ষে গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁরা এর পর গঠনমূলক কাজের সিদ্ধান্ত নিলেন। গঠনমূলক কাজ বলতে তাঁরা বোঝাতেন চরখা-খাদির প্রচার ও সামাজিক সংস্কারাদি। যেহেতু এর পূর্বে আন্দোলনের সময় অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে এও ছিল যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে না, সেইহেতু দেশবন্ধু ও মতিলালের কার্যসূচী 'চেঞ্জ' বা পরিবর্তন বলে প্রতিভাত হলো! তাই তাঁদের বলা হতো 'চেঞ্জার' এবং গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীদের বলা হতো 'নো-চেঞ্জার'।

শেষে দেখা গেলো বাস্তব ক্ষেত্রে দুই এর মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। দেশবন্ধু অনতিকাল পরে মারা যান। পরে দেখা যায় তাঁর অনুবর্তী ও গান্ধীজীর অনুবর্তীরা সমানভাবেই প্রজাস্বত্ব ও কৃষকের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেন।

দশকেই তারা কাউন্সিল অ্যাসেম্বলীতে প্রবেশ করেছেন, মন্ত্রিত্বের আসনের জন্য যেরকম চেষ্টা সম্ভব তা করছেন। কেউ সার্থক হচ্ছেন, কেউ হচ্ছেন না। সে আলাদা কথা। তবে গ্রাম উন্নয়নের আশ্রমবাসী তপস্বীদের মৎসে স্বাদ নেই বলে যেটা শোনা গিয়েছিল সে কথাটা যে ঠিক নয় এটা ভাল ভাবেই দেখা গেল। স্বাধীনতার পর এদের ক্রিয়াকাণ্ড তো জনসাধারণ ভাল ভাবেই দেখেছেন।

গান্ধীজীর এই গ্রাম উন্নয়নের ব্যাপারটার শুরু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই। প্রথমে এটা চরখাকে অবলম্বন করে। চরখা সম্বন্ধে আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। গ্রাম উদ্যোগ, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি তো এরই বিস্তারিত শাখা প্রশাখা। সেইজন্য গান্ধীজীর চরখা তত্ত্বটির আবিষ্কার কী করে ঘটলো সে কথাটা তুলছি।

গান্ধীজী লিখছেন[১]: "১৯০৮ সালে আমি যখন লণ্ডন শহরে তখনই চরখা আবিষ্কার করলাম।..." সেখানে ভারতীয় ছাত্র এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর দেশের সম্বন্ধে অনেক আলাপ হয় এদের মধ্যে অনেকেই চরম পন্থার কথা ভাবছিলেন। আচম্বিতে এক ঝলকের মধ্যে গান্ধীজীর মনে হলো চরখাই সমাধান। গান্ধীজী বলছেন: "...আমি কিন্তু তখন চরখা এবং তাঁতের মধ্যে পার্থক্যটা জানতাম না এবং 'হিন্দ্ স্বরাজ' পুস্তকে 'চরখা' বোঝাতে 'তাঁত' শব্দ ব্যবহার করেছিলাম...।" পরে বলেছেন[২]: "এমন কি আমি যখন 'হিন্দ্ স্বরাজ' পুস্তকে চরখাকে ভারতের বর্ধমান দারিদ্রে[?] মহৌষধ বলে লিখলাম তখনও আমি তাঁত বা চরখা দেখেছি বলে স্মরণ হয় না। এমন কি যখন ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরলাম তখনও বাস্তবক্ষেত্রে কোনও চরখা আমি দেখিনি।"

অথচ ইতঃপূর্বেই বাংলা দেশে তাঁতের পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাও হয়েছে ১৯০৫ সালের পর স্বদেশী আন্দোলনে। (পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের এ কথা উল্লেখ করেছি।) বস্তুতঃ তারও পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই বাংলা দেশে স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গবিভাগ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে সেই আগ্রহ কয়েকগুণ বৃদ্ধি হয়। গান্ধীজী নিজেও বলেছেন বাংলা দেশের এই আন্দোলনের ফলে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলগুলির সুবিধা

---

১ ইয়ং ইণ্ডিয়া, সেপ্টেম্বর ২০, ১৯২৮
২ ইয়ং ইণ্ডিয়া, জানুয়ারী ১০, ১৯২৯

হয়েছিল। কাজেই চরখার কথা আবিষ্কারের পটভূমিকা হিসাবে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবকেও তিনি উল্লেখ করতে পারতেন। বস্তুতঃ যে সময়কার কথা তিনি বলেছেন সে সময় ভারতে কি করে নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, এই ছিল সব সামাজিক রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার, উত্তাপ-উত্তেজনার অন্যতম একটা প্রধান বিষয়। তবে যাঁরা বাংলা দেশের চিন্তানায়ক তাঁরা অনন্যোপায়ে হস্তশিল্পের কথা ভাবলেও চরখা বা তাঁতই মোক্ষসাধনের একমাত্র উপায় তা ভাবতেন না। কিংবা মেশিনারী যন্ত্রপাতি বিশিষ্ট শিল্পের তাঁরা বিরুদ্ধে ছিলেন না। বরং তারই অভাবে যে আমরা পশ্চাৎপদ—এ চিন্তা তাঁদের ছিল। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি তাঁরা অনেকদিন আগে থেকেই স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে আন্দোলন করছিলেন এবং সেরূপ শিল্প গঠনে উদ্যোগী ছিলেন।

অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে গান্ধীজী যে বলেছেন তিনি চরখার ব্যাপারটা লণ্ডনে প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন সেটা ঠিক নয়। সে কথা ঠিকই। আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি তা হল তাঁর সাক্ষাৎ জ্ঞান চরখার বিষয়ে ছিল না, তা তিনি নিজেই বলেছেন। এ কথা এখানে আরও বেশী করে উল্লেখ করার প্রয়োজন এইজন্য যে গান্ধীজীর চিন্তাধারার যাঁরা ধারক, তাঁরা বিরোধীদের, বিশেষ ক'রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসীদের 'কেতাবীবিদ্যার' সমালোচনা করেন। স্বয়ং গান্ধীজী নিজেও যুক্তিবাদীদের কেতাবী বিদ্যার সমালোচনা করেছিলেন। রামমোহনকে 'পিগমি' বা বামন বলতে ছাড়েননি!

গান্ধীজীর চিন্তার উৎস একদিকে (তিনি না স্বীকার করলেও) বাংলার আন্দোলন থেকে, বাংলার আন্দোলন তাঁকে শিল্প সম্বন্ধে ভাববার প্ররোচনা দেয়। কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় এক বিচিত্র রূপে। এর অন্যান্য কারণ ছাড়া একটা কারণ কিছু কেতাবী বিদ্যা। সে কেতাবের লেখকও মার্কস্‌-এঙ্গেলসের মতো পাশ্চাত্য দেশের—এ দেশের নয়।

সে সব লেখক হলেন টলস্টয়, রাসকিন, থোরো প্রভৃতি। এগুলো গান্ধীজীর স্বীকৃত। তা ছাড়া আমরা ধরে নিতে পারি ইউরোপের কিছু লেখকের প্রভাব যা তৎকালীন ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকতো। টলস্টয়, রাসকিন প্রমুখদের কথা আমি পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। কেতাবী বিদ্যা এবং কেতাবী তর্কাতর্কির মধ্যেই এই চিন্তার জন্ম বলে লণ্ডন শহরে আবিষ্কার হওয়াটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। কারণ, ইংলণ্ডের শিল্প সমৃদ্ধির

প্রতিযোগিতায় ইউরোপের যেসব দেশ নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারছিল না তাদের অনেকেরই মধ্যে এইরূপ চিন্তার লোক দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া সোশ্যালিস্ট নামে নানান ধরনের ভাবালুতা, এমনকি আসলে যা প্রতিক্রিয়াশীল সেরকম ভাবালুতা, পাশ্চাত্য দেশগুলির কিছু কিছু চিন্তাবিদদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বিশেষ করে শেষার্দ্ধে দেখা দিয়েছিল। ফ্রান্স ও তার সঙ্গে ল্যাটিন দেশগুলি, যথা স্পেন, ইতালী ইত্যাদি দেশে প্রুধোঁর ধ্যান ধারণা অনেকদিন ধরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। এর জন্য মার্কসকে প্রুধোঁর "ফিলজফি অব পভার্টি" পুস্তকের বিরুদ্ধে "পভার্টি অব ফিলজফি" নামে প্রসিদ্ধ পোলেমিকার পুস্তক লিখতে হয়। অনুরূপভাবে নানান বিষয়েই এঙ্গেলস্‌কেও লিখতে হয়। "হাউসিং কোশ্চেন" বা গৃহসমস্যা নামে তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক এই কারণেই লেখা। রাশিয়াতে টলস্টয় ছাড়াও সংগঠিত দল হিসাবে নারোদনিকরা ছিলেন। তাঁদের ভ্রান্তিপূর্ণ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্লেখানভ ও লেনিনকে লিখতে হয়। বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর এক উপরতলার থাক সৃষ্টি তখন হয়ে গেছে। উপনিবেশের শোষণে স্ফীত বৃটিশ ধনতন্ত্র শ্রমিকের একাংশকে প্রভাবান্বিত করেছে। ফলে শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী ধ্যানধারণার ধার সেখানে তখন আর বেশী নেই। কাজেই সেখানেও অনুরূপ নানারকম চিন্তা-ধারার প্রচার দেখা দিয়েছে।

বিলাতে প্রবাসী ভারতবাসী

ভারত থেকে যাঁরা ইংলণ্ডে গেলেন তাঁরা অধিকাংশই বেশী ধনীর সন্তান। তাছাড়া বিলাত থেকে দেশে ফিরে ইংরাজ গভর্নমেণ্টের অনুগ্রহে বড় চাকরী কিংবা আইনব্যবসায় উচ্চ হারে অর্থলাভ করার বাসনাই তাঁদের বুকে থাকতো। নজরটা থাকতো ইংলণ্ডের ধনী সম্প্রদায়ের দিকে আবদ্ধ। ফলে অন্যদিকে ইউরোপের প্রগতিশীল আন্দোলনের দিকে নজরই যেতো না। আমরা জানি ১৮৭১ সালে বিলাত থেকে ফেরার পথে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত সন্দেহের ফলে ফ্রান্সে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন 'প্যারিস কমিউনের' অভ্যুত্থানের নিগৃহীত বন্দীদের বিচার চলছে। থানা লক আপে রাত কাটিয়ে মুক্তি পাওয়ার পর বিচারালয়ে গিয়ে কমিউনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের বিচার দেখার সুযোগ পুলিস তাঁদের অযাচিত ভাবেই দেয়। তাঁরা সে সুযোগ

গ্রহণ করেননি। বিপ্লবী শ্রমিকদের চিন্তাধারার বিষয়ে পরিচিত হবার কৌতূহলও তাঁদের হয়নি। হবে কেন? তাঁরা তো দেশে ফিরে আই-সি-এস অফিসার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হবেন এই আশাতেই বিলাত গিয়েছিলেন।

গান্ধীজী প্রথম বিলাত গেছেন এর অনেক পর এবং ১৯০৮ সালে যখন যান সে তো হলো আরও অনেক পর। তখন রুশ দেশে ১৯০৫ সালের বিদ্রোহ হয়ে গেছে এবং ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর চেতনায় এর কিছু ছাপ এসেছে। কিন্তু যাদের নজরই সেদিকে নেই তাদের মাথায় ওসব আসবে কেন? তাছাড়া ইংলণ্ডে যা সহজে প্রাপ্য ছিল তার প্রকৃতি তো উপরে বলেছি। উপরোক্ত নানান তত্ত্বের প্রচারকদের সকলের মত অবশ্য সকল বিষয়ে এক নয়। তবে অনেকেরই মধ্যে সেই মূল সুরটি বেরিয়ে এসেছে যার জন্য মার্কস ১৮৪৭ সালেই "পভার্টি অব ফিলজফি" পুস্তকে বলেছিলেন: "Hence the jeremiads of the reactionary parties who offer up all their prayers for return of feudalism, of the good old patriarchal life, of the simple manners and the fine virtues of our fore fathers.

(মর্মার্থ: এইজন্যই প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সেই বিষাদময় অভিযোগ, আমাদের পিতৃপুরুষদের সামন্ততন্ত্র, পুরাতন পিতৃআধিপত্যাধীন সমাজ, সরল ব্যবহার এবং সুনীতির প্রত্যাবর্তনের জন্য তাদের একান্ত প্রার্থনা।)

শ্রেণী-সংগ্রামের-প্রতিরোধ

কাজেই গান্ধীজীর গ্রামউন্নয়ন, গ্রামউদ্যোগ প্রভৃতির প্রস্তাব যে জগতে একটা নতুন কিছু এনে দিল, একটা অভিনব আবিষ্কার, এটা ঠিক নয়। যে সব বই তিনি তখন পর্যন্ত পড়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যেও এসব ছড়িয়ে আছে। যে-কারণে অন্যান্য দেশেও এর আবেদন এক শ্রেণীর মানুষের মন স্পর্শ করেছিল ঠিক সেই একই কারণে গান্ধীজী বা তাঁর শিষ্যদের কাছেও এই একই কথা সাড়া পেয়েছিল। শ্রেণী-সংগ্রামকে এড়িয়ে ধনতন্ত্রকে বজায় রেখে কেমন করে সমস্যার সমাধান করা যায়—এটাই ছিল লক্ষ্য। লক্ষ্য ছিল যা অসম্ভব তারই চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিরোধ।

এখন গান্ধীজীর নিজের কথা দেখা যাক। 'হিন্দ্ স্বরাজ' পুস্তকে তিনি লিখছেন, "লক্ষ লক্ষ লোক তো চিরকাল গরীব থাকবেই—মিলিয়ান্স্ উইল

অলওয়েজ রিমেন পুয়োর।" তিনি বলছেন: "(আমাদের পূর্বপুরুষরা) দেখেছিলেন সুখ হচ্ছে একটা মানসিক অবস্থা। ধনী হলেই যে মানুষ সুখী হয় এমন নয়। কিংবা গরীব হলেই অসুখী হয় এমন কথা নয়। এ সব দেখেই আমাদের পিতৃপুরুষরা বিলাস-আনন্দ থেকে আমাদের রুখে রেখেছিলেন।" (অধিক উৎপাদনের অক্ষমতা তো আমাদের সবিস্ময়রণ মানুষের ভোগসামগ্রীকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে পারে। ইউরোপের মানুষের ব্যবহারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ চামচ কাঁটাও তো এককালে সেখানকার মুষ্টিমেয় উপরতলার মানুষের বিলাসদ্রব্য ছিল।) যাইহোক লক্ষ্য করার বিষয় এই উক্তির পর দৃষ্টান্ত হিসাবে যদি কিছু উপস্থিত করা হয় তা হলে কিছু বিলাস দ্রব্যেরই উল্লেখ হবে পাঠকের এইরূপ প্রত্যাশা স্বাভাবিক।

পুরাতন ভারতীয় সমাজের সামন্ত শ্রেণীর উপরতলার মানুষের বিলাসের তো কোনও অভাব ছিল না। অধিকাংশ বিলাসই ছিল অন্য মানুষের দাসসুলভ শ্রমের পর . তাঁরা তো ঘোড়ায় চড়ার পরিশ্রমটুকুও বাদ দিয়ে গরীবের স্কন্ধে পালকী চড়ে বেড়াতেন। যাক্ গান্ধীজী যা বলেছেন তাই উদ্ধৃতি করছি। গান্ধীজী এখানে লাঙলের নিদর্শন উপস্থিত করছেন। অর্থাৎ গরীবের উৎপাদনের যন্ত্র। অর্থাৎ তার অর্থ দাঁড়ায় গরীবের হাতে যদি লাঙলের বদলে ট্রাক্টর দেওয়া হয়, (কিংবা পাল্কীতে কাঁধ দেওয়ার পরিবর্তে তার হাতে যদি স্টীয়ারিং হুইল ও মোটরগাড়ী দেওয়া হয়) তা হলে তা হবে শ্রমের লাঘব নয়, তা হবে বিলাস। গান্ধীজী বলছেন: "আমরা হাজার হাজার বছর আগে যে-লাগল চালিয়েছি তাই নিয়ে তো চালিয়ে দিচ্ছি। যেমন কুটির শিল্প পূর্বে আমাদে‍ ছিল তাই আছে। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থা তাও তো তেমনই আছে। কোনও জীবনক্ষয়ী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা (সিসটেম) আমাদের ছিল না। প্রত্যেকে নিজ নিজ পেশা করে যেত এবং একটা নির্ধারিত মজুরী পেত।"

অবশ্য তাঁর গ্রাম পরিকল্পনার মধ্যেও প্রথম দিককার এই মনোভাব থেকে সরতে হয়েছিল এবং কিছু যন্ত্র যা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা যায় তা মেনে নিতে হয়েছিল। সে কথা পরে আলোচনা করব। এখানে যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী।

ভারতবাসীর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অভিযোগ—মার্কসের উত্তর

গান্ধীজীর কাব্যকল্প হলো গ্রামে সকলের নিজের নিজের পেশা করছে এবং

পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করে নিজেদের কঠিনভাবে সীমিত প্রয়োজন মিটিয়ে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়। তারা উদ্বৃত্ত বিক্রয় করছে। এই বিক্রয়ের মধ্যেই যে সমস্যা উপস্থিত হলো এ কথা সাময়িক ভাবে তাঁর নজরের আড়ালে চলে গেল।

এ ব্যবস্থা তো এ দেশে ছিলই। তবে গেল কেন? তিনি বলছেন, আমাদের দেশের মানুষদের লোভের জন্যই এরূপ হয়েছে। কিভাবে? "কোম্পানীর অফিসারদের কে সাহায্য করলো? তাদের রূপোর চাকচিক্যে কারা প্রলোভিত হলো? কারা তাদের পণ্য কিনলো?"

মার্কস কমিউনিস্ট ইশতিহারে সহজেই এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। "চীনের প্রাচীরের মতো সকল বাধা ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেয় বুর্জোয়াদের পণ্যের সস্তা দাম এমনই শক্তিশালী যন্ত্র। বিদেশীর প্রতি অনুন্নত জাতিদের এমন বদ্ধমূল যে ঘৃণার ভাব, এই অস্ত্রের সাহায্যে বুর্জোয়ারা তাকেও হার মানায়। উৎপাদনের বুর্জোয়া পদ্ধতি গ্রহণ করতে সকল জাতিকে এরা বাধ্য করে, অন্যথায় ভয় থাকে ধ্বংস হয়ে যাবার।......"

ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধীনতা গ্রাম শিল্পের ধ্বংস সাধনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ভারতের সমাজে ছিল গ্রামের স্বয়ং সম্পূর্ণতা এবং গ্রামের স্বৈরাচারের কঠিন নিয়ন্ত্রণে সর্বপ্রকার বাইরের স্বৈরাচারকে সহজেই মেনে নেওয়াই তার চরিত্র ছিল। সমাজ ব্যবস্থার এই দোষের ফলেই বার বার ভারত আক্রান্ত হয়েছে এবং শেষে ইংরাজের অধীন হয়েছে। "লাইট অব এশিয়া" কাব্যে ইংরাজ কবি ভারতের গ্রামের এই কূপমণ্ডুকতাকে প্রশংসা করেছিলেন। বস্তুতঃ এক ধরনের ইংরাজ ভারতের সব পশ্চাতপদতাকেই উচ্চবাক্যে প্রশংসা করেছেন। এ তারই এক দৃষ্টান্ত। গান্ধীজী সগর্বে সেই কাব্যের নীচের অংশটি উদ্ধৃত করেছেন:

> "The East bowed before the blast
> In patient deep disdain
> She let the thundering legions past
> And plunged in thought again."*

* হরিজন, ১৩-১-৪০; এর পূর্বে অন্যত্রও গান্ধীজী এই কবিতাংশটি উদ্ধৃত করেছেন।

(মর্ম্মার্থঃ "প্রাচ্য গভীর ধৈর্য্যশীল ঘৃণার সঙ্গে বাত্যাঘাতের কাছে নত হলো, বজ্রবাহিনীদিগকে পার হতে দিল এবং পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হলো।")

লক্ষ্য করার বিষয় শব্দাড়ম্বরের মধ্যে "নত হলো" কথাটি যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ ঐ কথাটুকুর মধ্যেই দেশের শুধু লজ্জার কথা নয়, গভীর দুঃখ ও দুর্দশার কাহিনী প্রচ্ছন্ন রয়েছে। Bow কথাটির ইংরাজী অভিধানগত অর্থটি বিস্তার করে দেখলে স্তবকটির মধ্যে নিহিত গ্লানিটি আরও পরিষ্কার করে চোখে পড়ে। অক্সফোর্ড অভিধান বলছে অর্থ হচ্ছে To bend down or kneel to or before person etc. in sign of submission or reverence. To signify submission or abstain from resistance to authority.

ঠিক একই বিষয়ে মার্কস সত্য কথাটি অনাচ্ছাদিত রূপে প্রকাশ করেছেন : "নিজেদের নগণ্য জমিটুকুর উপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মম্ভরিতা ও কূপমণ্ডুকতার এমন পশ্চাৎপদ পর্য্যায়ে গ্রামগুলি পৌঁছেছিল যে বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন, বড় বড় শহরের পর শহরে ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসসাধন অবিচলিত চিত্তে দেখে যেতো। প্রাকৃতিক ঘটনায় মানুষ যেটুকু মনোযোগ দেয় তার বেশী মনোযোগ এইসব বিপর্য্যয় তাদের কাছে পায়নি। আর কোনও আক্রমণকারী যদি কৃপা করে এদের দিকে বারেক নজর ফেরাতো এরা নিজেরাই তার অত্যাচার ও লুণ্ঠনের অসহায় শিকার হতো।......এই ছোট ছোট সমাজগুলি বর্ণাশ্রমের বিভেদ ও দাসত্বের কালিমায় লাঞ্ছিত এবং মানুষকে তার বাইরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উর্ধ্বে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পরিবর্তে তাকে সেই অবস্থার দাসে পরিণত করে।" (নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন, ২৫শে জুন, ১৮৫৩)

ভারতের গ্রামগুলির ধ্বংসকরণে ইংরাজের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা মার্কস উল্লেখ করেছেন। "এই ছোট অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিকে ভাঙার উদ্দেশ্যে ইংরাজরা একাধারে শাসক এবং জমির মালিক হিসাবে যুগপৎ তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। ইংরাজের ব্যবসা এই সংগঠন (গ্রাম) গুলির উপর শুধু এই পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক প্রভাব প্রয়োগ করছে, তাদের একক অস্তিত্বকে শুধু এইভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে ইংরাজের সরবরাহ করা কম মূল্যের পণ্যের দ্বারা তাদের সুতা কাটা এবং কাপড় বোনার শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। শেষোক্ত হচ্ছে ঐ একই অস্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন অংশ—প্রাচীন অথচ এখন অচল।" (কার্ল মার্কস, ক্যাপিট্যাল)

"কারা তার পণ্য কিনলো ?" এই বলে গান্ধীজী দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, কমবেশী অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে লেখা মার্কসের কথায় তার উত্তর পাওয়া গেল। কি অবস্থায় দেশের মানুষ এই পরিস্থিতিতে পড়েছিল মার্কস তারই ব্যাখ্যা করেছেন।

"তাদের রূপোর চাকচিক্যে কারা প্রলোভিত হলো।" প্রশ্ন করেছেন গান্ধীজী। অর্থাৎ গ্রামের মানুষরা তাদের তৈরী কাঁচা মাল বা পণ্য কেন ইংরাজের দেওয়া টাকায় প্রলুব্ধ হয়ে তাদের বিক্রয় করলো—দেশের মানুষের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অভিযোগ হলো এই। মার্কস বলেছেন: "রাশিয়া বা ভারতের কমিউনের (গ্রামগুলির) জমির উৎপন্ন ফসলের একাংশ গ্রামবাসিদের বিক্রয় করতে হয়। তাও আবার ক্রমোত্তর বেশী পরিমাণে। এ তাদের বিক্রয় করতে হয় সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য। এই ট্যাক্স তাদের কাছে সরকার নিঙড়ে আদায় করে—প্রায়ই, বেশীর ভাগ সময় নিপীড়ন করেই আদায় করে।"

দেখা যাবে গান্ধীজীর হিন্দুস্বরাজ লেখার প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, রমেশ চন্দ্র দত্তের পুস্তক লেখা ও প্রকাশেরও বহু আগে মার্কস ভারতের গ্রাম সমাজের পতনের হেতু পরিষ্কার করেই লিখে গেছেন। আর ভারতের (যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের) মধ্যযুগীয় এবং এশীয় সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও মার্কস ধ্বংসের দায়িত্বটা গান্ধীজীর মতো দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি—দিয়েছেন বৃটিশ বুর্জোয়া অভিজাত শাসকশ্রেণীর উপর এবং তাদের এখানকার সহযোগী জমীদার ও দেশীয় রাজকর্মচারীদের উপর যাদের সাহায্যে প্রজাদের নিঙ্‌ড়ে খাজনা আদায় করা হতো। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রেজা খাঁর কথা তো জানাই আছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের মুন্সী মহারাজা নবকৃষ্ণের মাসিক বেতন ছিল ষাট টাকা। কিন্তু তিনি মায়ের শ্রাদ্ধের সময় খরচ করেছিলেন নয় লক্ষ টাকা। এ টাকা এসেছিল প্রজাদের নিঙ্‌ড়েই।

আসল গ্রাম

গান্ধীজী গ্রামগুলির যেমন কাব্যকল্প চিত্র রচনা করেছেন, মার্কস অবশ্য তা করেননি। তিনি যা বাস্তব চিত্র তাই এঁকেছেন।

গান্ধীজী গ্রামের অত্যাচারীদের কথা বলেননি। প্রথম দিকে জমীদারদের অনাচার অত্যাচারের কথা তোলেনই নি। শেষে যখন কৃষক আন্দোলনের

ফলে জমীদার-কৃষকের সম্পর্কের কথা তুলতে বাধ্য হন তখন তার মধ্যে তাদের অত্যাচারের কথার উল্লেখ করেননি। বরাবরকার মতো বলেছেন যে জমীদাররা ট্রাস্টি হিসাবে জমী রাখবে।

মার্কস বলেছেন প্রাচ্যের গভর্নমেণ্ট আদিম কাল থেকেই তিনটি বিষয় পরিচালনা করতো:—(১) অভ্যন্তরীণ লুঠ, করভার চাপানো (২) বহির্দেশ লুঠ অর্থাৎ যুদ্ধ ও (৩) সেচ, বাঁধ প্রভৃতি পাবলিক ওয়ার্কস। শেষেরটির ব্যবস্থা না হলে চাষ হবেনা, সুতরাং লুঠের সম্পদই থাকবে না। এই কারণে এই ব্যবস্থা সরকারকে করতেই হতো। মার্কস দেখিয়েছিলেন ভারতের ক্ষেত্রে ইংরাজ প্রথম দুটি অর্থাৎ লুঠের ব্যবস্থাটাই বজায় রেখেছিল এবং শেষেরটি অর্থাৎ যেটির উপর কৃষিজীবন নির্ভর করে সেইটাই ধ্বংস করেছিল।

গান্ধীজী নিজেও স্বীকার করেছেন অতীতকালে প্রাচীন ভারতে বা তুর্কী আমলে জোর করে প্রজাকে দিয়ে সুতা কাটিয়ে নেওয়া হতো এমন তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ সামন্ত যুগের যা চরিত্র, উৎপাদনের অংশ আদায় করে নেওয়া, তা বজায় ছিল। কিন্তু এটি মাত্র একটি বিচ্ছিন্ন উক্তি। তিনি গ্রামের একটি কাব্যকল্প শান্তিময় জীবনের ছবিই রেখে গেছেন। এ ছবি সঠিক নয়। আমাদের সাহিত্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। এক রাজা গিয়ে আর এক রাজা এলে অত্যাচার কী রকম হয় তার নমুনা কবিকঙ্কন রেখে গেছেন। গান্ধীজীর মতো তিনিও প্রজার পাপের ফলই দেখছেন—"সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ শরীফ। ···সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে পায় খতি।" মোগল সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের এই অত্যাচারের বর্ণনা সুপরিচিত। সুতরাং এই কাব্যাংশের বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভের অত্যাচারের কাহিনীও যথেষ্ট আছে। বঙ্কিমের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনারও উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। শরৎচন্দ্রের এক 'মহেশ' গল্পেই জমীদারদের অত্যাচার এবং ইংরাজ আমলে পুষ্করিণী সংস্কারের ও সামান্য পানীয় জলের অভাব গ্রামে গরীব কৃষকের জীবন কিরূপ অসহণীয় করে তুলেছিল তা ফুটে উঠেছে। এই গল্পের আরম্ভের বাক্য কয়টি যেন মার্কসীয় সাহিত্যের নিদর্শন। "গ্রাম ছোট, জমীদার আরও ছোট, কিন্তু অত্যাচারে প্রজারা টু শব্দ পর্য্যন্ত করতে পারতো না।" লেনিনের লেখা থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়।

লেনিন রাশিয়ার গ্রামোন্নয়ন প্রসঙ্গে কাব্যকল্পবিলাসী নারোদনিকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন তাদের কথায় মধ্যে এই সব ক্ষুদে উৎপীড়কদের উল্লেখ থাকতো না। লেনিন বলছেন: "আপনারা আশ্চর্য হবেন যে এঁদের লেখা গ্রাম্য জীবনের আলোচনায় মধ্যে গঞ্জবাজারে যে সব উৎপীড়ক ফড়িয়ারা ছেয়ে আছে তাদের কথা কিছু নেই। সেই সব ক্ষুদে শোষকদের কথা নেই যারা এই সব গঞ্জবাজারগুলির উপর আধিপত্য করে এবং গ্রামের মেহনতী মানুষদের হৃদয়হীনভাবে অত্যাচার করে। ...গ্রামের এই ক্ষুদে শোষকের দল একালে ভয়ঙ্কর শক্তি। তারা এইজন্যই ভয়ঙ্কর যে তারা এক একজন বিচ্ছিন্ন মেহনতী মানুষের উপর উৎপীড়ন করে এবং তাকে নিজেদের শৃঙ্খলবন্ধনে শৃঙ্খলিত করে এবং মুক্তির সকল আশা হতে বঞ্চিত করে। ভয়ানক এইজন্য যে বর্ণিত ব্যবস্থায় (সিসটেমে) শ্রমের উৎপাদন শক্তির স্বল্পতার কারণে পশ্চাৎপদতার ফলে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার ফলে এই শোষণ শুধু শ্রমিকের উপর ডাকাতিতে পর্যবসিত হয় না, এশিয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদের মানুষের মর্য্যাদাকেও লাঞ্ছিত করা হয়। এখন আপনি এই বাস্তব গ্রাম সমাজের সঙ্গে আমাদের ধনতন্ত্রের তুলনা করুন। বুঝবেন কেন এই ধনতন্ত্রকে প্রগতিশীল বলা হয়। বলা হয় এই জন্য যে এই ধনতন্ত্র এইসব ছোট ছোট ছড়ানো বাজারগুলিকে যুক্ত করে একটা দেশব্যাপী বাজারের মধ্যে নিয়ে আসে। হাজার হাজার ক্ষুদে শুভার্থী রক্ত শোষকদের স্থানে মুষ্টিমের 'পিতৃভূমির বড় স্তম্ভ' সৃষ্টি করে, শ্রমকে সামাজিক চরিত্রে রূপায়িত করে, এবং শ্রমের উৎপাদন শক্তিকে বৃদ্ধি করে স্থানীয় রক্তশোষকদের পরিবর্তে শ্রমিকদের বড় মূলধনের (লার্জস্কেল ক্যাপিটালের) অধীন ক'রে। নারী শিশুদের দেহকে বিকলাঙ্গ করে ক্রমাগত তাদের অবলোপ ঘটানো প্রভৃতি দারুন উৎপীড়ন সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা প্রগতিশীল। কারণ এই ব্যবস্থা শ্রমিকের মনকে জাগরিত করে, মূক অসংলগ্ন অসন্তোষকে সচেতন প্রতিবাদে পরিণত করে, বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বিদ্রোহকে একটা সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রামে রূপায়িত করে, মেহনতী মানুষের মুক্তির যুদ্ধ রূপে উন্নীত করে। এই সংগ্রাম তার সমস্ত শক্তি অর্জন করে বৃহৎ শিল্পের অস্তিত্ব থেকে এবং সেই কারণে নিশ্চিত সাফল্যের উপর নিঃসন্দেহে ভরসা করতে পারে।" (লেনিন, "জনগণের বন্ধু কারা", ইংরাজী গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৫-২৩৬)

ধনতন্ত্রের বিকাশ

গান্ধীজী ধনতন্ত্রকে কখনও এক নামে নামাঙ্কিত করেননি। কখনও বলেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা, কখনও মেশনারী (যন্ত্রপাতি), কখনও ইণ্ডাসট্রিয়ালিজেশান। প্রথম জীবনে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি শেষোক্ত দুই নামের বিরুদ্ধে। ক্রমোত্তর গ্রাম্য শিল্প পুনঃপ্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইণ্ডাসট্রিয়ালিজেশান এমন কি হেভী ইণ্ডাস্ট্রী বা ভারী শিল্পের কথাও বলেছেন। মূলধনের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের হাতে মূলধনের তিনি পক্ষপাতী নন কারণ তাতে 'হিংসা'র দাপট বাড়ে। তিনি বলেছেন তিনি মূলধনের ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী। তবে ঐ ব্যক্তিরা নিজেদের কেবল ট্রাস্টি রূপে বিচার করবে। (অবশ্য নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনি বিড়লা, টাটা প্রমুখ ক্যাপিট্যালিস্টদের ট্রাস্টি মনে করেন না। কেবল একমাত্র যমুনালাল বাজাজ কিছুটা ট্রাস্টি হওয়ার নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি অনুযায়ী তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্য্য যাঁরা পেয়েছেন ভারতের এমন সব লক্ষপতি কোটিপতিদের মধ্যে কাউকেই তিনি ট্রাষ্টি হবার মতো চরিত্রে উন্নীত করতে পারেননি এবং এ রকম কাউকেও তিনি জীবনে দেখেনও নি। অথচ তিনি নির্বিঘ্নে সারা জীবন না দেখা ট্রাস্টি দাঁড় করিয়ে কাটিয়ে গেলেন এবং ঐ ট্রাস্টির উপর ভরসা রেখে গরীবকে সব নির্যাতন ভোগ করতে বলে গেলেন। সুতরাং তাঁর এই ট্রাস্টি বাদের কুহেলিকার আলোচনা এখন থাক।)

আধুনিক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশান বা যন্ত্রশিল্প বিশিষ্ট কারখানা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণতি। ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ যন্ত্র নয়। ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো পণ্য। পণ্য বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাতেই থেকেছে। কিন্তু যখন তা সাধারণ চরিত্রে পরিণত হলো তখনই সে সমাজব্যবস্থা হলো ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

লেনিন বলছেন: "মার্কসের মতবাদ অনুযায়ী ধনতন্ত্রের মূল প্রকৃতি হচ্ছে,

(১) উৎপাদনের সাধারণ রূপ পণ্য উৎপাদন। নানান বিচিত্র ধরনের সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় (ইনডাইভাস্ সোশ্যাল অরগ্যানিজ্ম্) উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যের রূপ নেয়। কিন্তু কেবল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই এ হয় সাধারণ রূপ— আকস্মিক, বিচ্ছিন্ন এবং ব্যতিরেক ঘটনা নয়।

(২) ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রকৃতি হচ্ছে শুধু মানুষের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য নয় মানুষের শ্রমশক্তিই পণ্যের রূপ নয়।" (লেনিন, ইকনমিক কনটেন্ট অব নারোদিজম)।

এর বিস্তৃত আলোচনায় অবকাশ এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলতে চাই গান্ধীজী তাঁর হস্তশিল্পে যে কোনও কাজই প্রবর্তন করেছেন বা গ্রহণ করেছেন তার কোনওটিকেই তিনি পণ্য চক্রের বাইরে নিয়ে যেতে পারেননি। বস্তুতঃ "চরখা" সম্পর্কিত প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে, তাঁর কাটুনী সংঘ খাদিপ্রতিষ্ঠান আদি ধনতান্ত্রিক চরিত্রই গ্রহণ করে এবং তিনি তা নিজেও স্বীকার করেছেন। কাটুনীদের শ্রমশক্তি তাঁরা ক্রয় করেছেন এবং তাঁরা যেখানে নিজেরাও তার মূল্য বা মজুরী অন্ততঃ আট আনা হওয়া উচিত বলে ধার্য্য করেছেন সেখানেও বাস্তবক্ষেত্রে যে চার আনার বেশী দেননি এও স্বীকার করেছেন।

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে ধনতন্ত্রের বিকাশের স্তরের পার্থক্য লেনিনের ভাষায় নারোদনিকদের (বা আমাদের এখানে গান্ধীবাদীদের) বর্ণিত বৃহদায়তন বা লার্জেস্কেল উৎপাদন ব্যবস্থার, এবং ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার তফাৎ হচ্ছে সম্পূর্ণ বিকশিত এবং অবিকশিত অবস্থার মধ্যে তারতম্য। অবিকশিত অবস্থার মধ্যেও সেই উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ শ্রেণীবিরোধ রয়েছে, যা পণ্য অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। দ্বন্দ্বমান স্বার্থবিশিষ্ট শ্রেণীদের রূপ, যা ধনতন্ত্রের চরিত্র তা এই ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু রয়েছে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায়। কারণ, এঙ্গেলসের ভাষায়: "শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের চালিকা-শক্তি (ড্রাইভিং স্পিরিট) কোথাও নীতি থেকে আসে না, সর্বত্রই আসে বৃহদায়তন (লার্জস্কেল) শিল্পের বিকাশ এবং তার ফল থেকে—একদিকে মূলধন জমে ওঠা, জড়ো হওয়া এবং কেন্দ্রীভূত হওয়া অন্যদিকে প্রলেতারিয়েত জড়ো হওয়া এবং কেন্দ্রীভূত হওয়া।" (এঙ্গেলস্—হাউসিং কোশ্চেন)

প্রুধোঁর আশা ও আসল ভবিষ্যৎ

এঙ্গেলস্ আরও বলছেন: "পেতিবুর্জোয়া প্রুধোঁ এক জগতের জন্য আশা করছে, যে জগতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি পৃথক এবং স্বতন্ত্র দ্রব্য উৎপাদন করে। এই উৎপন্ন দ্রব্য অবিলম্বে ভোগের এবং বাজারে বিনিময়ের উপযোগী। তার পর যতক্ষণ প্রতিজন ব্যক্তি নিজের শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্য আর একটি উৎপন্ন দ্রব্যের

রূপে ও মাধ্যমে পায় ততক্ষণ ন্যায়বিচারের সন্তোষ সাধন হয় এবং সর্বোত্তম জগৎ তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু প্রধোঁর এই সর্বোত্তম জগৎ শিল্পের অগ্রগতির (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলাপমেন্টের) দ্বারা পায়ে পিষ্ট হয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। এই অগ্রগতি বৃহদায়তন শিল্পের সমস্ত শাখায় ব্যক্তিগত শ্রমকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং প্রতিদিন বেশী ও তারও বেশী ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর শিল্পে এই ব্যক্তিগত শ্রমকে ধ্বংস করছে। তার স্থানে অধিষ্ঠিত করছে সামাজিক শ্রম যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে মেশিনারী এবং প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগানো। অবিলম্বে ভোগ কিংবা বিনিময়ের উপযোগী ঐ উৎপন্নদ্রব্য বহু ব্যক্তির হাতে হাতে পার হয়ে এসেছে এবং তা তাদের মিলিত শ্রমের ফল। এই শিল্পবিপ্লবই নির্দিষ্টভাবে মানুষের উৎপাদন শক্তিকে এত উচ্চ স্তরে উন্নীত করেছে যে মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমনই সে সম্ভাবনা যে সকলের মধ্যে যুক্তিযুক্ত শ্রমবিভাগ ধরে নিয়ে সমাজের সকল সভ্যের জন্য শুধু যথেষ্ট নয়, প্রচুর ভোগের জিনিষ তৈরী করা যায়। এর উপর গচ্ছিত ভাণ্ডারও (রিজার্ভ ফাণ্ডও) রাখা যায়। উপরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথেষ্ট অবসরও দেওয়া যায় যাতে বিজ্ঞান, আর্ট, মানুষের পারস্পরিক আচার ব্যবহারের বিনিময়—এই সবের মধ্যে যা সত্য সত্যই সংরক্ষণ করার মতো তাকে সংরক্ষণ করা যায়। শুধু তাই নয়, এই ভাবে ঐ সব জিনিষকে শাসকশ্রেণীর একচেটিয়া সম্পদ থেকে সমস্ত সমাজের সাধারণ সম্পদে পরিণত করা যাবে। পরন্তু এ সবকে আরও উন্নীত করা হবে। এখানেই হলো সেই সিদ্ধান্তকারী পয়েন্ট: যখনই মানুষের শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা এই উচ্চ মাত্রায় ওঠে শাসক শ্রেণীর অস্তিত্বের সব কৈফিয়ত অপসারিত হয়। কারণ, সর্বশেষে যার ভিত্তিতে শ্রেণীভেদের পক্ষ সমর্থন করা হতো তা সর্বদাই ছিল এই: সমাজের মেধাসম্পন্ন কাজ চালাবার জন্য এক শ্রেণী থাকতে হবে যাদের আর দৈনন্দিন রুজীর কথা ভাবতে হবে না। এই কথা, যার এতদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুক্তিযুক্ততা ছিল, গত একশত বৎসরের শিল্প বিপ্লবে চিরকালের জন্য তার মূলচ্ছেদ করা হয়েছে। শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রতিদিন বেশী করে, আরও বেশী করে, শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে বাধা হয়ে উঠছে। সমভাবেই তা বাধা হয়ে উঠছে বিজ্ঞান, আর্ট এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের উন্নয়নের পথে। আধুনিক বুর্জোয়ার মতো সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে, মেলামেশার মজলিসে এমন বিরক্তিকর উপস্থিত ইতোপূর্বে আর কখনও ছিল না।"

ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে অসাম্যের স্থায়ীত্বে বিশ্বাসী গান্ধী

শেষের কথা কয়টির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী কর্তৃক দৃঢ়ভাবে প্রচারিত একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গান্ধীজী মানুষের মধ্যে অসাম্যে বিশ্বাস করতেন এবং এও বিশ্বাস করতেন যে যারা ধনবান পুঁজিপতি তারা নিজের বুদ্ধি ও প্রতিভা বলেই সম্পদের অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর মতে ধনী-নির্ধন, মহাজন-খাতক, জমীদার ও কৃষক, মানুষে মানুষে এই যে-পার্থক্য এ-পার্থক্য প্রকৃতির দেওয়া বুদ্ধি ও যোগ্যতার পার্থক্য। এর সমর্থনে উদ্ধৃতি অনেক জায়গা থেকেই দেওয়া যায়। এখানে একটা দিলেই চলবে। বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিক কারবারে অংশীদার হতে পারে এ রকম ভরসা দিয়ে শেষে গান্ধীজী আবার শ্রমিককে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন! "সে (শ্রমিক) যদি একক মালিকানার চেষ্টা করে সে সম্ভবতঃ সেই রাজহংসটিকেই নিহত করবে—যে রাজহংস স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব করে। বুদ্ধির অসাম্য এমনকি সুযোগ সুবিধার অসাম্য চিরকাল থাকবে। ইনইকোয়ালিটিজ ইন ইনটেলিজেন্স অ্যাণ্ড ইভ্‌ন্ অপরচুনিটি উইল লাস্ট টিল দি এণ্ড অব টাইম।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৬-১-৩১)

একটি কথা লক্ষ্য করার বিষয়। এই প্রবন্ধের গোড়াতেই দেখিয়েছি বিলাসদ্রব্য না হলেও চলতে পারে এরূপ দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে গান্ধীজী হস্ত-চালিত লাঙলের কথা তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন এই হস্তচালিত যন্ত্রটি দিয়ে তো আমরা হাজার হাজার বৎসর চালিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে চাষের এইসব যন্ত্রপাতি—লাঙ্গল, কাস্তে, নিড়েন—এদের উল্লেখ নেই। বাইরে থেকে বস্ত্র আমদানী করার কথায় চিন্তিত হয়ে তিনি যেমন চরখার কথা ভাবলেন তেমনই বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করতে গিয়ে তিনি লাঙ্গল, কাস্তে, নিড়েনের কথা তো ভাবলেন না। বৃটিশ শাসনে বহু পূর্ব হতেই বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী শুরু হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তো অবস্থা আরও কঠিন হয়। তখনও তো এ সব যন্ত্রের কথা তুললেন না।

এ সব কথা তুললে জমির প্রশ্ন দেখিয়ে দিতে হতো। গ্রামে মানুষ চাষের সময় ছাড়া বসে থাকে, সেই সময় সে চরখা কাটতে পারে—এই ছিল গান্ধী-বাদের কথা। কিন্তু কথাটা তো সঠিক নয়। হাজার হাজার কৃষক উচ্ছেদ হয়েছে, জমিহীন, লাঙলহীন হয়েছে। তাদের প্রয়োজন তো জমি, লাঙল

প্রভৃতি, যাতে তারা চাষ করতে পারে। দেশেরও প্রয়োজন তাই—যাতে দেশের ভিতরেই যথেষ্ট ফসল উৎপাদন হবে, বিদেশ হতে আমদানীর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ঐ যা বললাম। এ সব কথার সঙ্গে সঙ্গেই জমির প্রশ্ন আসে। জমীদার, জোতদার, মহাজন—সব দেবতাকে সামনে রেখে এ সব কথা তোলাই মুস্কিল। সব কয়টি দেবতার যুগপৎ উষ্মা ও ভ্রুকুটির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুতি তো তাঁদের মধ্যে নেই। তাই বার বার গান্ধীজী বলেছেন তাঁর কর্মসূচী "গ্রামের সব শ্রেণীকেই—স্ক্যাভেঞ্জার থেকে শুরু করে মহাজনদের পর্যন্ত সকলকে নিয়েই" (হরিজন, ১৩-৪-৩৫)। গান্ধীজী বলে দিয়েছেন জমীদার ট্রাস্টি হলে তার জমির মালিকানা, আর সবই বজায় থাকবে। এমন কিছু তফাৎ হবে না। মহাজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেছেন এ কারবার তো আর না করলে চলবে না। যদি না করে সে সব হারাবে। (হরিজন, ১৬।১১।৩৪) তাঁরা সব ভাবেন, তা হলে, আমরা তো ট্রাস্টি আছিই, তবে কেন আবার ট্রাস্টি হওয়ার কথা ওঠে? এ রহস্য তাঁরা বোঝেন এবং স্মিত হাস্যে সংযম বজায় রাখেন। গান্ধীজী কি বলতে চান নিরাকার পূজ্যের পূজকদের ঈশ্বরের মতোই গান্ধীজীর ট্রাস্টি সাকারে দর্শন দেননি? এই নিরাকার কল্পিত ট্রাস্টিটির কথা বলে কৃষক শ্রমিকের শ্রেণী সংগ্রামের চেতনাকে শুদ্ধ করা যায় কিনা এটাই হলো প্রশ্ন। কি করে শ্রেণী সংগ্রামকে ঠেকানো যায় এই সাধনাতেই তাঁদের জীবন সমর্পিত।

গ্রাম শিল্পের সঙ্গে তাঁর এই সব মতবাদের সামঞ্জস্যের অভাব, অসঙ্গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা এখানে এখন আর বেশী করলাম না।

ভবিষ্যত দ্রষ্টা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন

মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন তাঁদের লেখায় দেখিয়েছেন বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া 'জন হিতৈষী'রা চান, সমাজের যে কোনও অবস্থায় ভালটি রাখব এবং মন্দটিকে কোনও মতে বাদ দেব বা মন্দীভূত করব। এ সার্থক হোক বা না হোক উপরতলার মানুষদের কষ্ট না করে আর গরীবদের সান্ত্বনা দিয়ে জীবনটা যাতে সাধু ব্যক্তি বলে কেটে যায় সেটাই মঙ্গল। কিন্তু ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়িত। সামন্ততন্ত্রের যে সব গুণ সম্বন্ধে এঁদের রোমান্সের অনুভূতি তার সঙ্গেই জড়িত থাকে সেই সমাজের মধ্যেই এমন শক্তি যা তার পরিবর্তন

সাধন করে। স্থিতিশীলতা নয়, গতিশীলতাই হচ্ছে প্রকৃতির চরিত্র। যে বিরোধী অবস্থাকে মন্দ ভাবা হয় তা হয় চালিকা শক্তি। আজ তাই প্রোলেতারিয়েত চালিকা শক্তি, যেমন বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষয়িষ্ণু। গ্রামে ধনতন্ত্রের প্রচার কিংবা সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার-উৎপীড়ন টেনে নিয়ে আসছে প্রলেতারিয়েতের মিত্র কৃষককে প্রলেতারিয়েতের কাছে।

এঙ্গেল্‌স্ একদিন আশা করেছিলেন যে ইতোমধ্যে যদি অন্য কোথাও শ্রমিক শ্রেণী উদ্যোগ না নেয়, জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণী নেবে এবং ধনতন্ত্রকে চরম আঘাত হানবে। তিনি আশা করেছিলেন, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত জার্মান কৃষক সেদিন প্রলেতারিয়েতের পাশে এসে দাঁড়াবে। ইতোমধ্যে অন্য কোথাও উদ্যোগের সম্ভাবনা, যা তিনি তাঁর আশা থেকে বাদ দিতে পারেননি, তাই ঘটল। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী কৃষকের মৈত্রী ও সহযোগিতায় বিপ্লব সফল করলো। এখন দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশেই তা ঘটে গেছে।

আজ ভারতের কৃষকও সব মায়াজাল ছিন্ন করে এগিয়ে আসছে। সহরের প্রলেতারিয়েতের পাশে দাঁড়াচ্ছে গ্রামের সর্বহারা।

ভারতের মাটিতেও মার্কসবাদের জয় আসন্ন।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বিষয়ে একটা আলোচনা বরাবর হয়ে আসছে। একাধিক পুস্তকও বের হয়েছে। এর কারণও আছে। ১৯১৫ সালে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতের রাজনৈতিক জগতে ঠাঁই নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়। সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম সি-এফ-এণ্ড্রুজ। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর ফিনিক্স ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়ে এসে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে তাদের প্রাথমিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এণ্ড্রুজ সাহেবই এর ব্যবস্থাপক। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই সাময়িক আশ্রয় ব্যবস্থার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে প্রথম গান্ধীজী শান্তিনিকেতন আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে ছিলেন না। বিদেশে ছিলেন। সাক্ষাৎ আলাপ হয় পরে। এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের গুজরাট সফর এবং গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজী এই অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় সাহায্য করেন। সুতরাং প্রথম হতেই একটা পারস্পরিক সাহায্যের বন্ধন দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল —যেটা জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে এই গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অনেককিছু মেনে নিতে পারেননি। অনেক সময় প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ করেছেন আবার গান্ধীজীও প্রকাশ্যেই তার উত্তর দিয়েছেন। আমরা ইতোপূর্বেই গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের উপাধি বর্জন তিনি সহ্য করতে পারেননি। সোচ্চার প্রতিবাদও করেছিলেন। নীরব প্রতিবাদ ছিল আরও সোচ্চার।

কাজেই দু'জনের সম্পর্ক ও বিতর্কাদি যে আলোচনার বিষয়বস্তু হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু এসব আলোচনাতেও বিতর্কের বস্তু কম নেই। কিন্তু বিতর্কের বিতর্কে যোগদান করার কোনও ইচ্ছা নেই। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয়, গান্ধীবাদীরা যা লেখালেখি করেছেন তাতে দু'জনের

পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনায় ক্ষেত্রে, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ব্যাপারে অর্থসংগ্রহে গান্ধীজীর কাছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ও রবীন্দ্রনাথের ঋণকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী।

কিন্তু মূল বিতর্কটির বিষয়ে আমাদেরও কিছু আলোচনার আছে। -

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন: "কংগ্রেস সেরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করার বহুপূর্বে, গ্রাম পুনর্গঠনের জন্য গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি প্রস্তাব করেছিলাম এবং লিখেছিলাম। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তশিল্পের শিক্ষা একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত, হিন্দু ধর্ম ও সমাজ হতে অস্পৃশ্যতার মতো বীভৎস আচার দূর হওয়া উচিত—এসব সম্বন্ধেও লিখেছিলাম।" কথাটা সঠিক। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাও এ বিষয় ভাল করেই জানেন। বলা বাহুল্য এও আবার সত্য যে রবীন্দ্রনাথের এই সব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয় আলোচনায় এমন অনেক কিছুও আছে যা মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে অনুমোদন করা সম্ভব হবে না। এ সব ক্ষেত্রে শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা এবং শিল্পসাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশে এবং ইংলণ্ডে প্রথম জীবনের পরিবেশের বিশেষ প্রকৃতির দরুন অনেক বিষয়েই তাঁর দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করেছে এবং সময়ে সময়ে কিছু কিছু বিষয়ে সঙ্কুচিত করেছে। জীবনের শেষার্ধে তিনি ক্রমোত্তর প্রগতির দিকে বেশী করে ঝোঁকেন। তবু বলা বাহুল্য, উল্লেখিত কারণে কিছু কিছু বিষয়ে পিছুটান থেকে যায়—যদিচ প্রগতির ক্ষেত্র এত বেশী প্রসারিত হয় যে গতিশীল সমাজে ঐ পিছুটানের দিকে সাধারণতঃ নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠন সংক্রান্ত আলোচনা, প্রস্তাবাদিতে মূল শ্রেণী-বিরোধের প্রশ্ন সম্বন্ধে অস্বচ্ছতা থাকলেও বা ধনতন্ত্রের প্রসারে দারিদ্র্যের মধ্যে বিরোধী যে চালিকাশক্তি জন্ম নিয়েছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরিচয়ের অভাব থাকলেও, একটা জিনিষ স্বীকার করতে হবে যে গান্ধীজী সমগ্র ব্যাপারটিকে এক ধর্মীয়, যুক্তিবিহীন উন্মাদনায় পরিণত করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। বরং তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি তাঁর সুপরিচিত প্রবন্ধে এই কথ টার উপর বেশ জোর দিয়েছেন: "কোনও বিশেষ পদ্ধতিতে তৈয়ারী যন্ত্রের ব্যবহার বা বর্জন বিষয়টি অর্থনীতি বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। আমাদের দেশের লোকের এই বিষয়ের আলোচনা অর্থনীতির (ইকনমিক্‌সের) ভাষায় হওয়া উচিত ছিল। যদি আমাদের দেশের মানসিক প্রবণতা এমন অভ্যাসে

গিয়ে পৌঁছায় যে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করা অসম্ভব হয়, তাহলে প্রয়োজন হলে সাময়িক অন্যান্য সমস্যা বর্জন করেও শুধু এইরূপ মারাত্মক অভ্যাসের (ফ্যাটাল হ্যাবিটের) বিরুদ্ধেই সমস্ত সংগ্রাম পরিচালিত করা উচিত।" আবার বলছেন: "ভারতে সকলের পক্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে এক হওয়া কঠিন। রাজনীতির মঞ্চে একত্রিত করার চেষ্টা সম্প্রতি কালে আরম্ভ হয়েছে। জনগণের মধ্যে তার প্রভাব প্রবিষ্ট হতে সময় লাগবে। সুতরাং অর্থনীতির (ইকনমিক্সের) ধর্মই হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে সকলকে মিলিত করার চেষ্টা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইটিই সবচেয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্র যা আমাদের হাতে আছে। কারণ, এখানে উচ্চ এবং নীচ, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেরই কার্য্যক্ষেত্র (স্কোপ) আছে।" (মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)।

ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত বিচার পদ্ধতি অপেক্ষা অর্থনীতির বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু অর্থনীতিও তো শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবান্বিত না হয়ে যাবে না। তাছাড়া অর্থনৈতিক বোধকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত না করলে এবং প্রয়োজনানুযায়ী রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ না করলে লাভ কি? অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম সমাবেশের সুযোগ থাকতে পারে, তেমনই বাস্তব শ্রেণী বিরোধের চিত্রও থাকবে। আবার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিলিত বিরোধিতার ক্ষেত্রে মেহনতী শ্রেণীগুলির যেমন আপোসহীন সংগ্রামের প্রবণতা থাকবে বুর্জোয়া শ্রেণীর তেমন থাকবে না। এ সব কারণেই তো ধর্মের মোড়ক সব কিছু জড়িয়ে রাখাটা বুর্জোয়া নেতৃত্বের কাজে আসে। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে সব জিনিষটা দেখবেন এটা আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু ধর্ম দ্বারা জটিলতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে তিনি যে সতর্কবাণী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অন্ততঃ দেশের প্রগতির পক্ষে তা একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ধর্মবর্জিত যুক্তিবাদের উপর জোর দেওয়ার প্রসঙ্গে লেনিনের কথা স্মরণ হয়: "নবালোক প্রাপ্ত মানুষ (দি এনলাইটেন্ড্)* বর্তমান সামাজিক বিকাশের স্রোতগতিতে বিশ্বাস করেন, কারণ তিনি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি লক্ষ্য করেন না। নারোদনিক বর্তমান সামাজিক বিকাশের স্রোতগতিকে ভয় করেন কারণ তিনি এই দ্বন্দ্বগুলি

* নবালোকপ্রাপ্ত বা এনলইটেন্ড্ শব্দটি এসেছে এনলাইটেনমেণ্ট শব্দ থেকে। নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে এর মোটামুটি অর্থ পাওয়া যাবে। Enlighten-

সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গেছেন। মার্ক্সবাদীরা বর্তমান সামাজিক বিকাশের স্রোত গতিতে বিশ্বাস রাখেন কারণ তিনি এই দ্বন্দ্বগুলির পূর্ণ বিকাশের মধ্যে অধিকতর ভাল ভবিষ্যতের জিম্মা দেখতে পান। অতএব প্রথমোক্ত এবং শেষোক্ত চিন্তাধারা বর্তমান পথে বিকাশের অগ্রগতিকে সাহায্য, সমর্থন এবং ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করে এবং তার অগ্রগতির পথে (বিকাশকে বাধা দেওয়ার মতো এবং তাকে পিছিয়ে দেওয়ার মতো) সমস্ত প্রতি-বন্ধতাকে দূর করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে নারোদনিকরা করে তার বিপরীত। তারা এই বিকাশকে থামিয়ে দেওয়ার, পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে কতকগুলি বাধাকে অপসারণ করতে তারা ভীত হয়।" (লেনিন, গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৫)

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মতৈক্যের ক্ষেত্র ছাড়া তাঁদের মধ্যে যেখানেই বিতর্ক এবং পার্থক্য তার মধ্যে প্রধান যে সুর দেখা যাবে তাতে উপরে উদ্ধৃত (রাশিয়ার ক্ষেত্রে) লেনিনের দেওয়া ব্যাখ্যার সম্পর্ক পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন "আমাদের নীতিগত মূল ভিত্তি এবং মেজাজের পার্থক্য এই অবস্থা নির্দ্ধারিত করে দিয়েছে যে তিনি যেখানে রামমোহন রায়কে বামন ভাবেন, আমি সেখানে রামমোহনকে দেখি এক বিরাট ও বিশাল ব্যক্তিত্ব।" ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে

---

ment—"...the whole of the Age of Reason, from the English revolution of 1640s to the French Revolution of 1780s ; the England of Hobbes, Locke and Newton ; the Scottland of Hume and Adam Smith ; the France of Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau and the Encyclopedie ; the Germany of Kant, Lessing and Hender ...the term is now usually applied... to the untramelled rationalism and empiricism and the ready questioning of authority and tradition in religious social and political matters which mark the period..." (Penguin Encyclopedia) আমাদের দেশে নবালোক প্রাপ্তদের সম্বন্ধে লেখক কর্তৃক একটি আলোচনা পাওয়া যাবে ১৩৭৭-এর শারদীয় সংখ্যা 'নন্দনে'—বিদ্যাসাগর স্মৃতি উপলক্ষে" শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধে।

রামমোহন এ দেশবাসীর জন্য যে শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন এবং গান্ধী এ সম্বন্ধে যা বলেছেন দুটো তুলনা করলেই পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সেই চিঠিতে রামমোহন এ দেশবাসীকে গণিত, পদার্থবিদ্যা, কেমেস্ট্রী, অ্যাস্ট্রনমি প্রভৃতি বিজ্ঞান শেখানো হোক বলে অনুরোধ করেছেন। আর গান্ধীজী বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কি বলছেন? তিনি বলছেন: "পাশ্চাত্য চিন্তার প্লাবনে ভেসে গিয়ে আমরা ভালমন্দ বিচার না ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে এই শিক্ষা আমাদের জনগণকে দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষার কথাই ধরুন। আমি ভূগোল, অ্যাস্ট্রনমি, অ্যালজেব্রা, জ্যামিতি—ইত্যাদি শিখেছি। তাতে কি ফল হয়েছে? তাতে কিভাবে আমি নিজেকে বা আমার চারপাশের মানুষকে উপকৃত করেছি? এগুলো আমি কেন শিখেছি?"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "যদি ইউরোপ কর্তৃক বিজ্ঞান চর্চার কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে তা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান মানুষকে প্রকৃতির পীড়ন (আউটরেজ) থেকে উদ্ধার করে. মানুষকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করার জন্য নয়, যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির শক্তি সমূহকে মানুষের সেবায় ব্যবহার করার জন্য। একটা জিনিষ সুনিশ্চিত। যে সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য আমাদের দেশের উপর চেপে বসেছে বিজ্ঞানকে হতগ্রাহ্য করে হাতের কাজের দ্বারা সে দারিদ্র্যকে অপাসরণ করা যায় না। মানুষের জানার ব্যাপারটা থাবে থেমে অথচ তার কাজ চলবে চিরকাল এরূপ অসম্মানজনক পীড়নমূলক শ্রম আর কিছুই হতে পারে না।*

---

* এঙ্গেল্‌সের নিম্নের উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে: "But precisely therein lay the true significance and revolutionary character of Hegelian Philosophy...that it once for all dealt the death blow to the finality of all the products of human thought and action. Truth, the cognition of which is the business of philosophy, was in the hands of Hegel no longer an aggregate of finished dogmatic statements, which, once discovered, had merely to be learnt by heart. Truth lay now in the process of cognition itself, in the long historical development of science, which mounts from lower to ever higher levels of knowledge without ever reaching, by discovering so called absolute truth, a point at which it can

…মানুষ যা কিছু কাজ বস্তুর উপায় মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারে না, তা অধিকন্তু বোঝা হিসাবে তার নিজের ঘাড়েই পড়ে এবং সেই কাজ তাকে বস্তুর স্তরে নামিয়ে দেয়।…মানুষের জড়াত্মক বোঝাকে যা হালকা করে দেয় তার চেয়ে বড় ধন আর কিছু নেই।"

তিনি দেখাতে চান যে চরখার আবিষ্কারেই মানুষের জ্ঞানানুশীলন শেষ হয়নি। "বিজ্ঞান যে সব ঘূর্ণায়মান ও বেগবান শক্তি উদ্‌ঘাটিত করেছে তার সম্বন্ধে যদি আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্ধ হয়ে থাকি, চরখা আমাদের জন্য কোনও বারতা আনতে সার্থক হবে না।"

লক্ষ্য করবার বিষয়, বিজ্ঞান চর্চার বিষয়ে গান্ধীজীর সহযোগী মৌলানা আজাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে এ বিষয়ে তাঁর লেখায় পরোক্ষভাবে সত্যের উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞানের প্রয়াসের নিরর্থকতার সুরই ফুটে উঠেছে। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপের হতাশাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব রয়েছে এবং ফলে, প্রকাশভঙ্গীতে তথাকথিত 'আধুনিকতার' ছাপ আছে। তিনি পাশ্চাত্যের বর্তমানকালের ঐরূপ লেখার উল্লেখও করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান যতই সাধনা করে যাক, এক পর্দা তুলতে না তুলতেই

---

proceed no further, where it would have nothing more to do than to fold its hands and gaze with wonder at the absolute truth to which it had attained…"—Luduig Feuerbach and the end of classical German philosophy.

(মর্মার্থ: কিন্তু হেগেল' দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈপ্লবিক চরিত্র ঠিক এই। সে চরিত্র হচ্ছে মানবিক চিন্তা ও ক্রিয়ার ফলাফলগুলির সম্পর্কে চূড়ান্তপনার সমস্ত ধারণার বিষয়ে। উক্ত ধারণার বিষয়ে তা চিরকালের মতো মরণ আঘাত হেনেছে। সত্য, যাকে, জানাই হল দর্শনের উদ্দেশ্য, সে সত্য আর হেগেলের কাছে কয়েকটি চূড়ান্ত আপ্তবাক্যের সমষ্টি মাত্র নয় যা কিনা একবার আবিষ্কৃত হবার পর শুধু মুখস্ত করতে পারলেই হলো। এখন সত্য মিলবে জ্ঞান-আহরণের প্রক্রিয়ার মধ্যেই, বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যেই, যে বিজ্ঞান ক্রমশই জ্ঞানের নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু কখনোই তথাকথিত পরম সত্যকে আবিষ্কার করে এমন কোনও স্তরে পৌঁছায় না, যার পর আর তার অগ্রগতি সম্ভব নয়, যেখানে ঐ লব্ধ পরম সত্যটির সামনে করজোড়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।)

আর এক পর্দা সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এইরূপে রহস্য উন্মোচনের শেষ আর হয় না। সুতরাং আধ্যাত্মিকতায় আশ্রয়ই নির্ভরযোগ্য। রহস্য উন্মোচনের শেষ হয় না—কিন্তু ইতোমধ্যে মানুষ তার জ্ঞানের সাধনায় প্রতি সার্থক পদক্ষেপকে আয়ত্ত ক'রে প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনকে যে উন্নত করে চলেছে এর মূল্য যেন কিছুই নেই। তা ছাড়া বিজ্ঞানের সাধনায় ও কর্মোন্মাদনায় অনুপ্রাণিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অজ্ঞাত অজ্ঞেয় নয়" এই আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বাণী গান্ধীজী ও তাঁর সহযোগীর মধ্যে নেই।*

প্রধোঁর উল্লেখে এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন: "প্রধোঁবাদের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এতে দেখা যায় শিল্পবিপ্লবের প্রতি একটা বিরোধিতা আছে। কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে সমস্ত আধুনিক শিল্প, বাষ্পচালিত কল, যন্ত্রচালিত তাঁত এবং অন্যান্য যন্ত্র মন্দির থেকে বিদায় করা হোক এবং পুরাতন হস্তশিল্পে ফিরে যাওয়া হোক এই ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। তাতে আমরা যে আমাদের বর্তমান উৎপাদন শক্তির নয় শত নিরানব্বই হাজার-তম অংশ হারাবো, সমগ্র মানব সমাজ হীনতম শ্রমদাসত্বে দণ্ডিত হবে, অনশন হবে সাধারণ নিয়ম—এ সবে কি এসে যায়..... ?" (এঙ্গেল্‌স্—হাউসিং কোশ্চেন)

রবীন্দ্রনাথ মানুষের এক ক্ষমতায় বিশ্বাসী যাকে তিনি বলেছেন 'সৃষ্টিশীল সাহস'। (বলা বাহুল্য, তিনিও একে স্রষ্টার দানই বলেছেন।) তিনি বলেছেন "মানুষের মন অসহায় ভাবে তার পরিবেশে আবদ্ধ নয়। যা' তার হাতে এসেছে তাকে সে নিয়ন্ত্রণাধীন করার চেষ্টা করেছে। উপরন্তু সে পাথরের যন্ত্রে সন্তুষ্ট না হয়ে, সে লোহার জন্য মাটির তল খুঁড়ে লোহা বার করেছে।

* গুবারে খাতের: মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দ্রষ্টব্য। (অবশ্য আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার কথা আছে।) প্রসঙ্গত: এও উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান কালের পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ের সংস্কৃতি মৌলানা আজাদের মনকে স্পর্শ করল কিন্তু এককালের প্রগতিশীল আরব চিন্তাধারার আবেদন তাঁর মধ্যে পাওয়া গেল না। এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি ল্যাটিন দেশ সমূহে আরব দর্শনের প্রভাবেই মুক্ত চিন্তা দেখা দিয়েছিল। আরব দার্শনিক মোতাজেলাদের প্রভাব রামমোহনের জীবনেও স্বীকৃত। আরব দর্শন ও সংস্কৃতিতে মৌলানা আজাদের পাণ্ডিত্য বিশ্ববিখ্যাত।

তারপর সেই লোহাকে গলিয়ে হাতুড়ির ঘায়ে তাকে প্রয়োজনীয় আকৃতিতে গড়ে তুলেছে।...সে গভীর হতে গভীরতর অভ্যন্তরে পৌঁছাতে চায়, যা বোঝা যাচ্ছে তার থেকে যা আবরিত ও লুক্কায়িত তার ভিতরে যেতে চায়..." তিনি বললেন, "মানব সমাজের কোনও অংশ যদি বলে—পাথরের অস্ত্র আমাদের পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধার বস্তু—এর থেকে সরে গেলে আমরা আমাদের বংশকুলের ('রেসের') প্রকৃত মর্ম হারিয়ে ফেলবো—তারা তাদের বংশকুল বা 'রেস'কে হয়তো রক্ষা করতে পারবে কিন্তু তারা মানুষের যে মহান ঐতিহ্য (যার তারাও অধিকারী) তা হারাবে।" (মডার্ন রিভিউ, অক্টোবর, ১৯২১)। অর্থাৎ তারা সে ক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃতির বিষয়ে জ্ঞানলাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের মহান ঐতিহ্য হারাবে।

এ কথা সত্য যে তাঁর সব কিছু কথা কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে মিশে আছে। তবু প্রকৃতিতে জানার ও বোঝার ক্ষমতা মানুষের অসীম এবং প্রকৃতিকে সে ক্রমোত্তর বেশী করে কাজে লাগাতে পারবে এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর আছে।

কর্মক্ষেত্রেও বহুবার—যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময়, বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সময় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপানী কবি নোগুচিকে পত্রলেখার কালে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ দৃঢ়তা দেখিয়েছেন ভারতের অনেক বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে ও তা পাওয়া যায়নি।

কিন্তু কর্মসূচী হিসাবে সাধারণ ক্ষেত্রে রাজনীতিক-অর্থনীতিক মত ও পথ সম্বন্ধে তিনি যখন আলোচনা করেছেন তখন তার উপরে উল্লেখিত ত্রুটি প্রকাশ হয়েছে। শ্রেণীচেতনার সীমাবদ্ধতার কারণে স্বভাবতই বিভ্রান্তি ঘটেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি সাহিত্যিক। তাঁর উপরোক্ত বিষয়ে মতবাদের প্রয়োগক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। প্রয়োগক্ষেত্র ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলি। বুদ্ধি-মুক্তির পক্ষে তাঁর সজোর ওকালতি, প্রগতির পথে তাঁর সাহিত্যের ও শিল্পের অবদান, বিশেষ বিশেষ সময়ে নিপীড়িত দেশবাসীর বুকের ব্যথার বলিষ্ঠ ও সোচ্চার প্রকাশে দেশের চিন্তাজগতে যে স্থায়ী প্রগতিশীল ছাপ রেখে গেছে তাঁর উপরোক্ত সামাজিক অর্থনীতিক লেখাগুলি তা রাখেনি।*

* রবীন্দ্রনাথের এ সব লেখার নমুনা হিসাবে তাঁর 'সমবায়নীতি' পুস্তিকার উল্লেখ করা যায়।

মার্কস বলেছিলেন : "দার্শনিকরা জগতকে নানারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো কেমন করে তাকে পরিবর্তন করা যায় ?"

গান্ধী আমাদের কোন্ পথে কোথায় নিয়ে এসেছেন তার আস্বাদ গত ২৩ বৎসরে দেশবাসী পেয়েছেন এবং এখনও পাচ্ছেন।

অন্যদিকে মার্কসবাদ লেনিনবাদ মানুষের কাছে কী সাফল্য এনে দিয়েছে তারও দৃষ্টান্ত আজ পৃথিবীর মানুষের সামনে। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ আজ শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ। ঐ সব দেশে অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সুখ-সম্পদ প্রতিটি নাগরিকের হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। সমাজের উন্নততর বিকাশের দিকে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। এদেশের মানুষকেও আজ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রকৃত 'চালিকাশক্তির' দিকে—প্রোলেতারিয়েতের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে জয়ের প্রশস্ত পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বড়শিল্প : ছোটশিল্প : কুটিরশিল্প*

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে ইকনমিক কনফারেন্স হয়। সে-সময় বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ছাড়া বাকী সব প্রদেশে ১৯৩৫ সালে ইংরাজের দেওয়া শাসন-সংস্কার আইনানুযায়ী গঠিত মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত ছিল কংগ্রেস। নাগপুরে তখন সে সময়কার মধ্যপ্রদেশের শাসনকেন্দ্র। ঐ সময়ে কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেস অধিষ্ঠিত থাকাকালে জাতীয় জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে এই ধরনের কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সম্মেলন গুলিতে বুর্জোয়াদের আসল চেহারা—যা এতদিন গান্ধীবাদের ধোঁয়াটে ভাষায় আবরিত ছিল—কিছু কিছু প্রকাশ পায়। পটভূমিকা বোঝার জন্য এইটুকু উল্লেখ করলাম। পথ আরও পরিষ্কার করার জন্য তখন বুর্জোয়াজী ভাল করে বড় শিল্পের কথা খোলাখুলি বলতে আরম্ভ করেছে। আমরা যেমন ইতিপূর্বেই দেখেছি এবং গান্ধীজীর নিজের স্বীকৃত মতেও, তিনি কখনই নির্দিষ্ট বড় শিল্প যা গড়ে উঠছিলো তার কোনওটিরই বিরোধিতা করেননি বরং তাঁর অদ্ভুত বাক্য রচনার ভাষা যাই থাক মিল-মালিকদের তিনি নিশ্চিন্তই করে গেছেন, কিন্তু এই বাক্য রচনার মধ্যেও পূর্ব পরে তফাৎ হতে থাকে। ভারতীয় মিলশিল্পগুলির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষা মেশিন, ইণ্ডাস্ট্রি, লার্জস্কেল ইণ্ডাস্ট্রি, হেভী ইণ্ডাস্টি, এইরূপে ধাপগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটির পক্ষে পূর্ব অপেক্ষা ক্রমোত্তর নমনীয় হতে নমনীয়তর হতে থাকে। বিংশ দশক হতেই উপরে বর্ণিত মতো শিল্প প্রসারের উপযোগী তাঁর ভাষারও বিবর্তন লক্ষিত হয়।**

উপরে উল্লেখিত নাগাপুর সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ত্রিশ জন প্রতিনিধি ৩০শে ডিসেম্বর সেবাগ্রামে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন।

* Large Scale industry vis-a-vis small Scale Industry

** এম. কে. গান্ধী : "ইকনমিক লাইফ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশান্‌স" প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা (রোমান অক্ষরে) ৫১-৫৩

একজন প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কি বড় শিল্পের বিরুদ্ধে?"

গান্ধীজী বললেন: "আমি কখনও তা বলিনি।...আমি বলেছি তার বিরুদ্ধে যা গ্রামবাসীরা বিনা কষ্টে তৈরি করতে পারে।"*

শেষ বাক্যটি শুধু তাঁর বরাবরকার ভাষার অনুবর্তিতা রক্ষা করে।

আমি পূর্বেই বলেছি তিনি স্বয়ং-স্বীকৃত ভাবেই ভাষা বা মতের সঙ্গতি রাখার দায় দায়িত্ব আছে বলে মনে করতেন না। কাপড়ের কলগুলি (যাদের সহ অস্তিত্ব তিনি সমর্থন করেছেন) তাদের তৈরী কাপড় বিক্রয় করে ভারতের গ্রামে। বাংলার তাঁত শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বোম্বাই-এর কলের প্রতিযোগিতাতেই বড় ঘা খায়। উপরে উল্লেখিত কালে তিনি যেমন পূর্বের মতো বলে চলেছেন সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে সূর্যের মতো খাদিশিল্পকে প্রাণকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; আবার এও বলেছেন যে ভারী শিল্প (হেভী ইণ্ডাস্ট্রি), বড় শিল্প (লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি) এবং গ্রামশিল্প পারস্পরিক সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তুলতে হবে। বাস্তব অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁদের সামান্যটুকু পরিচয় আছে তাঁরা জানেন ধনতন্ত্রের বাজারে শিল্পের বিস্তার ও ক্রমোন্নয়নের স্তর বিশেষে শেষোক্তকে তবু দেখা যেতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে একদিকে গোটা দেশে হেভী ইণ্ডাস্ট্রি, লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি কেন্দ্র এবং অন্যদিকে গ্রামের মধ্যে খাদি-শিল্প-প্রাণ-কেন্দ্র—এইরূপ দুই বিরোধী চরিত্রের সংমিশ্রণ অসম্ভব। কিন্তু পূর্বে শিল্প গড়ে ওঠা কালে তার সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্প তখনও বজায় থাকা—এইরূপ গোড়ার দিককার অবস্থা ও যন্ত্রশিল্পের স্থাপন, প্রসার ও প্রাধান্যের সময় গ্রাম্য শিল্পের সহ অস্তিত্ব থাকা একরকম নয়।

এঙ্গেল্‌স জার্মানীতে এই রকম দুই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন। 'হাউসিং কোশ্চেন' (আবাস গৃহসমস্যা) পুস্তকের ১৮৮৭ সালে লিখিত ভূমিকায় তিনি বলেছেন: "হাউসিং কোশ্চেনে বড় বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়ার সমাধানের প্রস্তাবের মূল চরিত্র হচ্ছে শ্রমিকের নিজের বাসগৃহ থাকবে। যাই হোক, জার্মানীর গত বিশ বৎসরের শিল্পের বিকাশে একটি বিষয় একটি বিশেষ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। অন্য কোনও দেশে এত মজুর নেই যাদের শুধু নিজেদের বাসগৃহ আছে তা নয়, একটা বাগান কিংবা একটা খেতও আছে। এই শ্রমিকরা ছাড়া আরও অনেকে আছে যাদের ঘর আছে এবং মোটামাট কায়েমী প্রজাস্বত্বের ভিত্তিতে জমি আছে। জার্মানীর নতুন বড়

* হরিজন, ২৮ ১-১৯৩৯

শিল্পের প্রশস্ত ভিত্তি হচ্ছে ছোটোখাটো চাষ ব্যবস্থার কিংবা তরিতরকারী খেতের পরিচালিত গ্রাম্য কুটির শিল্প। পশ্চিমের দিকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বাসগৃহগুলির মালিক। দেশের পূর্বাঞ্চলে তারা প্রধানতঃ রায়ত। এইরূপ কৃষি বা তরিতরকারীর খেত, ফলতঃ কায়েমী সত্বে আবাসগৃহের সঙ্গে যুক্ত কুটিরশিল্প আমরা শুধু সাইলেশিয়া, স্যাকসন আর্‌ৎসেবিগে, ওয়েস্টফালিয়া এবং লোয়ার রাইনল্যাণ্ড (যেখানে হস্তচালিত তাঁত এখনও যন্ত্রচালিত তাঁতের সঙ্গে লড়ছে) সেখানেই দেখছি তা নয়। এ আমরা দেখছি যেখানেই কুটিরশিল্প একটি গ্রাম্য পেশা হিসাবে দেখা দিয়েছে। তামাকের একচেটিয়া কারবারের আলোচনা যখন চলছিল তখন একটা ব্যাপার দেখা গেল। সিগার তৈরী তখনই কত ব্যাপকভাবে কুটিরশিল্প হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে তা প্রকাশ পেল। যেখানেই ছোট কৃষকদের মধ্যে দুর্দ্দশা ছড়িয়ে পড়ে (যেমন কয়েক বৎসর আগে আইফেল এলাকায় ঘটলো) বুর্জোয়া সংবাদপত্র জগৎ প্রতিকার হিসাবে উপযোগী কুটিরশিল্পের প্রবর্তনের জন্য হৈ চৈ শুরু করে। বস্তুতঃ জার্মানীর ছোটো ছোটো টুকরো জমির চাষীদের বর্ধমান অভাবের অবস্থা এবং জার্মান শিল্পের সাধারণ পরিস্থিতি উভয়ই কুটির শিল্পের প্রসারের তাগিদ দিচ্ছে। এই দৃশ্য বিশেষ করে কেবল জার্মানীর ব্যাপার। ফ্রান্সে যদি দেখা যায় তা কেবল খুব ব্যতিক্রম হিসাবে। যেমন দেখা যায় রেশম চাষের এলাকায়। ইংলণ্ডে (যেখানে কোনও ছোট চাষী নেই) গ্রামের কুটির শিল্প খেতমজুরদের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নির্ভর করে। কেবল আয়ারল্যাণ্ডে দেখা যায় রেডিমেড পোষাকের শিল্প জার্মানীর মতো রায়ত চাষী পরিবারদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। স্বভাবতই এখানে আমরা রাশিয়া বা অন্যান্য দেশ যাদের বিশ্বের শিল্পের বাজারে প্রতিনিধিত্ব নেই তাদের কথা আলোচনা করছি না।"

"এইরূপে শিল্পের ক্ষেত্রে জার্মানীর বিস্তৃত এলাকায় দৃশ্য দেখা যাবে যা প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হবে মেশিনারী প্রবর্তনের পূর্বাবস্থা। যাই হোক এ কেবল মনে হবে প্রথম দৃষ্টিপাতে। অন্ততঃ পক্ষে আগের কালে যে-সব দেশে ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছিল তরিতরকারীর বাগান ও চাষের সঙ্গে, গ্রামের কুটিরশিল্প সেখানে চলনসই জীবিকার ভিত্তি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে জীবন ছিল মেধায় এবং রাজনৈতিক চেতনায় সম্পূর্ণ সত্তাবিহীন। হস্তশিল্পে তৈরী দ্রব্য এবং তার তৈরীর খরচ বাজার দর নির্দ্ধারণ করতো। এখনকার তুলনায় শ্রমের উৎপাদন খরচ ছিল খুব কম। সরবরাহ অপেক্ষা বাজার আরও দ্রুতগতিতে

বাড়ছিল। এই রকমই অবস্থা ছিল ইংলণ্ডে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে। কতকটা ফ্রান্সেরও, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে ছিল এই অবস্থা। জার্মানী তখন ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধের ধ্বংস থেকে মাত্র কোনও রকমে আবার জেগে উঠছিল। খুবই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে কোনও মতে মাথা তুলছিল। এখানে, যাই হোক, অবস্থাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। লিনেন বয়নশিল্প জার্মানীর একমাত্র কুটির শিল্প যা দুনিয়ার বাজারের জন্য উৎপাদন করতো। কিন্তু এই শিল্প সামন্ততান্ত্রিক শোষণে ছিল জর্জরিত ও ভারাক্রান্ত। ফলে এই শিল্প সাধারণ কৃষক জীবনের জীবিকার নিম্ন মান থেকে এই সব কৃষক-বয়ন শিল্পীদের জীবিকার মান উপরে তুলতে পারেনি। তবুও গ্রামের শিল্প-শ্রমিকরা বেঁচে থাকার, টিকে থাকার একটা নিরাপত্তা পেত।"

"মেশিনারী (যন্ত্র) প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সব পাল্টে গেল। তৈরী দ্রব্যের দাম এখন মেশিনে তৈরী দ্রব্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হতে লাগলো। কুটির শিল্পের মজুরের মজুরী ঐ দামের সঙ্গে সঙ্গে পড়তে লাগলো। যাই হোক শ্রমিককে তাই গ্রহণ করতে হতো। নচেৎ অন্য কাজের সন্ধানে যেতে হতো। সে ক্ষেত্রে সে প্রোলেতারিয়ান বনে যেতো। প্রোলেতারিয়ান না বনে গিয়ে তো সে এইভাবে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারতো না। তার অর্থ সে তার ছোট ঘর, খেত, বাগান (তা সে নিজেরই হোক কিংবা খাজনায় নেওয়া হোক) না ত্যাগ করে এ কাজ করতে পারতো না। খুব বিরল ক্ষেত্রে সে এ কাজ করতে প্রস্তুত ছিল। এইরূপে গ্রামের তাঁতীদের তরিতরকারীর বাগান ও চাষ এরই কারণে যন্ত্র চালিত তাঁতের সঙ্গে হস্তচালিত তাঁতের সংগ্রামে সর্বত্র প্রলম্বিত হলো। এখনও জার্মানীতে সে লড়াই শেষ সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছালো না। এই সংগ্রাম প্রথম যখন দেখা দিল, বিশেষ করে ইংলণ্ডে দেখা দিল, তার সঙ্গে আর একটা জিনিস দেখা গেল। যে বিশেষ অবস্থা অতীতে শ্রমিকের তুলনামূলক সচ্ছলতার ভিত্তি ছিল, উৎপাদনের উপায় গুলিতে তার নিজের মালিকানা, তাই তার বাধা আর দুর্দশার কারণ হয়ে পড়লো। ছোট বাড়ী, খেত, বাগান, হস্তচালিত তাঁত এবং ব্যক্তিগত হস্তশিল্পের শ্রম—উৎপাদনের এই প্রাচীন পদ্ধতির শৃঙ্খলে সে বাঁধা পড়ে গেল। নড়াচড়া, এখানে ওখানে সরে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা ঘর আর বাগানের মালিকানা সর্বাপেক্ষা কম সুবিধার হয়ে পড়লো। হস্তচালিত তাঁতের শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে এবং সুনিশ্চিত ভাবেই অনশনের কষ্টে পড়লো। কোনও

কারখানার শ্রমিক তার সঙ্গে স্থান বদল করতে রাজী হতো না। (এমনই হয়ে গেল সেই কুটিরশিল্প-কর্মীর অবস্থা।)"

"জার্মানী বিশ্বের বাজারে দেরীতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের বড় শিল্প (লার্জস্কেল ইণ্ডাস্ট্রি) শুরু হলো ১৮৪০এর দশক থেকে। ১৮৪৮সালের বিপ্লবে ঐ শিল্প প্রথম ইমপেটাস, প্রথম বেগবল পেল এবং ১৮৬৬-১৮৭০ সালের বিপ্লব সবচেয়ে খারাপ রাজনীতিক বাধাগুলি অপসারণ করার পরই কেবল সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারলো। কিন্তু দেখলো বিশ্ববাজার তখন দখল হয়ে গেছে। সর্বসাধারণের ভোগের পণ্য ইংলণ্ড সরবরাহ করছিল। বিলাসের সৌষ্ঠব-সম্পন্ন দ্রব্যগুলি দিত ফ্রান্স। জার্মানী প্রথমোক্তকে দামে এবং শেষোক্তকে গুণে টেক্কা দিতে পারতো না। ফলে ঐ মুহূর্তে আর কিছু করার ছিল না। কেবল একটা পথই ছিল। সেই সময় পর্যন্ত জার্মানীর যা পরিচিত পথ সেই পথে চলা। সেই পথ ধরে ইংরাজের পক্ষে যা অত্যন্ত তুচ্ছ এবং ফরাসীর পক্ষে যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট দ্রব্য তার পসরা নিয়ে বিশ্বের বাজারের কিনারা ঠেলে জার্মানী সুড় সুড় করে এগোতে লাগলো। অবশ্য জার্মানী তার প্রচলিত প্রতারণার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে ভাল নমুনার জিনিস দিয়ে পরে নিম্নতর প্রকৃতির জিনিস দিতে লাগলো। শীঘ্রই এর জন্য বিশ্বের বাজারে প্রচণ্ড শাস্তি পেল। অন্যদিকে অতি উৎপাদনের প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত মর্য্যাদা সম্পন্ন ইংরাজকেও পণ্য নিকৃষ্ট করার পথ ধরতে বাধ্য করলো। এতে তারা জার্মানদের সুবিধাই করে দিল। এই বিষয়ে জার্মানদের সঙ্গে কেউই টেক্কা দিতে পারে না। এইরূপে আমরা শেষ পর্য্যন্ত একটা বড় শিল্প (লার্জ-স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি) পেলাম এবং বিশ্বের বাজারে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারলাম। কিন্তু আমাদের বাকী লৌহ শিল্প বাদ দিলে লার্জস্কেল ইণ্ডাস্ট্রি প্রায় শুধু দেশের বাজারের জন্যই উৎপাদন করে। লৌহ শিল্প উৎপাদন করে দেশের প্রয়োজনের অনেক বেশী। আমাদের বহির্বানিজ্যের মালের প্রভূত পরিমাণ অংশ হচ্ছে বৃহৎ সংখ্যায় ছোট ছোট জিনিস, যার জন্য বড় শিল্প (লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি) বেশী করে তো এইটুকুই করে—প্রয়োজনীয় আর সমস্ত জিনিস সরবরাহ করে। ছোট জিনিসগুলো গ্রামের কুটির শিল্প সরবরাহ করে।"

"এতেই দেখা যায় আধুনিক শ্রমিকের বাসগৃহ এবং জমির মালিকানার গৌরবজনক খ্যাতি এবং আশীর্বাদ। অন্য কোথাও এতো নিন্দনীয় কম মজুরী দেওয়া হয় না যেমন জার্মান কুটিরশিল্পে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতা

মালিককে (ক্যাপিটালিস্টকে) একটা সুযোগ দেয়। সে শ্রমশক্তির মূল্যের মধ্য থেকে তা কেটে নেয় যা শ্রমিকের পরিবার তার ছোট বাগান বা ক্ষেত থেকে পায়। ফুরণ হিসাবে মজুরী হয় এবং শ্রমিকদের যতটুকু দেওয়া হয় তারা ততটুকুই নিতে বাধ্য হয়। এক কারণ, অন্যথায় তারা তো অন্য কিছু পাচ্ছেই না। তাদের পক্ষে শুধু ঐ সামান্য চাষের উপর জীবিকা ধারণ করা কঠিন। অন্যদিকে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই—ঐ সামান্য চাষ আর ক্ষুদ্র জমির মালিকানাই তাদের ঐ স্থানে শিকলে বেঁধে রেখে দেয় এবং অন্য কাজের জন্য অন্যত্র কোথাও যাওয়া থেকে আটকে রেখে দেয়। এটাই হলো ভিত্তি যার দ্বারা জার্মানী ছোট ছোট পণ্যে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা পেয়েছে।"

"নর্ম্যাল যে-মজুরী ক্যাপিটালিস্ট তার থেকেই মুনাফাটা কেটে নেয় এবং নর্ম্যাল মজুরীর উপর যে উদ্বৃত্ত মূল্য তার সমস্তটাই ক্রেতার হাতে পার করতে পারে। জার্মানীর রপ্তানী পণ্যের এত অসাধারণ সস্তা দামের পিছনে গোপন রহস্যটি হচ্ছে এই।"

"অন্য কোনও কারণ অপেক্ষা বেশী করে এই কারণই অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও জার্মান শ্রমিকের মজুরী পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা কম করে রেখেছে। বরাবরই শ্রমশক্তির মূল্যের নীচে নামানো শ্রম-মূল্যের ভারী ওজনের বোঝা ও চাপ শহরের শ্রমিকদেরও মজুরী কমিয়ে দেয়। তাদেরও মজুরীকে শ্রমশক্তির মূল্যের নিচে নামিয়ে দেয়। এ-ঘটনা ঘটে আরও বেশী এইজন্য কারণ অতি কম মজুরী দেওয়া কুটিরশিল্প সত্বেও পুরাতন হস্তশিল্পের স্থান দখল করেছে এবং সেখানেও মজুরীর সাধারণ স্তর নামিয়ে দিয়েছে।"

"এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যা ইতিহাসের একটা আগের কালে শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত কল্যাণের (ওয়েলবীংয়ের) কারণ ছিল যেমন চাষ এবং শিল্পের একযোগে মিলন, বাসগৃহ, বাগান ও ক্ষেতের মালিকানা, এখন বড় শিল্পের (লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রির) শাসনাধীনে তাই শ্রমিকের বৃহত্তম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় এই ব্যাপার সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর জন্য বৃহত্তম দুর্ভাগ্য হয়েছে, মজুরীর স্তরকে নর্ম্যাল স্তর থেকে দৃষ্টান্তহীন ভাবে নামিয়ে দেওয়ার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা আবার শুধু এক একটা এলাকা বা শিল্পের এক একটা শাখার জন্য নয়—সমগ্র দেশের জন্য। কাজেই বড় বুর্জোয়াজী এবং পেটি-

বুর্জোয়াজী, যারা শ্রমিকের মজুরী থেকে অস্বাভাবিক অংশ কেটে নেওয়ার উপর জীবনধারণ করে এবং ধনী হয়, তাদের যে গ্রাম-ভিত্তিক শিল্পের উপর, শ্রমিকদের নিজস্ব ঘর থাকার উপর এত উৎসাহ তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। **তারা গ্রামের দুর্দশা দূর করার জন্য একমাত্র প্রতিকার হিসাবে গ্রামে কুটির শিল্পের প্রবর্তনকে দেখে, এও আশ্চর্যের কথা কিছু নয়।"**

এঙ্গেলস্ এর পর একটা বিপরীত দৃষ্টও দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রেও বিপ্লব তার চালিকাশক্তি কোথা থেকে পাবে তাও দেখিয়েছেন। কিন্তু সে এখন থাক। পরে আমরাও তাঁকে অনুসরণ করে সেই বিষয়ে আসবো। আশা করি পাঠক বুঝবেন সমস্ত তত্ত্বটি বোঝার জন্য এঙ্গেলসের লেখা থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্প বজায় রাখায় বুর্জোয়া শ্রেণীর যে যথেষ্ট স্বার্থ থাকতে পারে এবং থাকে ও এ কথা এঙ্গেলস্ পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন। এরপর পাঠকের কাছে গান্ধীজীর নিচের উক্তি চিত্তাকর্ষক হবে। আদর্শ গ্রাম কেমন হবে? "...কুটির থাকবে, যাতে যথেষ্ট আলো বাতাস থাকবে।...এই গ্রাম নিজের শস্য, তরিতরকারী, ফল এবং খাদি তৈরী করবে।" (হরিজন, ২৮-৭-৪৬)

জাপানের দৃষ্টান্ত

এখন আমরা একজন জাপানের বিশেষজ্ঞের কিছু কথার আলোচনা করব। ভারতের ধনপতিরা জাপানের শিল্পের উন্নতিকে খুব বড়ো ক'রে বর্ণনা করেন। যুদ্ধের পর জাপানের শিল্পের উন্নতি তাঁদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে।

প্রধানতঃ মার্কিন ধনতন্ত্রের অনুকরণে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রেরণায় এবং তাঁদের সাকরেদ এখানকার ধনপতিদের উদ্যোগে ভারতবর্ষে এখন শিল্পের ব্যবস্থাপনা বিভাগ পরিচালনাকে 'বিজ্ঞানের এক শাখা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া'র চেষ্টা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষানুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে উঠেছে ও ডিপ্লোমা ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। বিদেশী শিল্পপতিরা এবং তাঁদের সহযোগী বড় বড় শিল্পপতিরা অনুরূপ আরও প্রচেষ্টা করছেন যেমন সেমিনার অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এই সব সেমিনারের মাধ্যমে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কত কি জল্পনা কল্পনা হচ্ছে তার সব তো প্রকাশ পাচ্ছে না। কিন্তু শিল্পপতিদের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আকস্মিক ভাবে এমন এমন মোড়

নিতে দেখা যায় এবং বিভিন্ন শিল্পে এরকমই একই রীতির আবির্ভাব হতে থাকে যে, বোঝা যায়, এ সব নানান সলাপরামর্শেরই ফল। কমবেশী একই সময়ে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে অনেক সব একই রূপ ঘটনা দেখে বোঝা যায় এসব বাইরের অনুপ্রেরণারই ফল।

গত বৎসর (আগস্ট, ১৯৭০) এক সংবাদে প্রকাশ পায় 'শ্রীনগর, শহরে "অ্যাডভান্স্‌ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামিং" সম্পর্কে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।* সাংবাদিক বলছেন, উক্ত সেমিনার হচ্ছে একটি সেমিনার কার্যসূচীর একাদশ সিরিজ। এতেই বোঝা যাবে ধনপতিরা এই সেমিনারকে কিরূপ গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐ সেমিনার উপলক্ষে একজন জাপানী বিশেষজ্ঞ এখানে এসেছিলেন।**

সাংবাদিক বলছেন :

"জাপানের দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় অধ্যাপক এক শান্ত সন্তুষ্টির সঙ্গে নিজের দেশের কথা বললেন।...তিনি আশা প্রকাশ করলেন জাপান তার মোট জাতীয় উৎপাদনের (জি-এন-পির) শতকরা ১০ ভাগ হারে বৃদ্ধি বজায় রেখে যাবে।...ডক্টর মাটসুডো বললেন অর্থনীতিক অলৌকিক কাণ্ডে (মিরাকল্‌-এর) একটা কারণ হচ্ছে জাতীয় শিল্প সংগঠনে (সেট্‌-আপে) দ্বৈত-কাঠামো (ডিউএল স্ট্রাকচার) অর্থাৎ বড় শিল্প (লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি) ও ছোট শিল্পের (স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রির) সহ অস্তিত্ব। বিশ্বের বাজারে প্রধযোক্তকে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে বিনা ব্যতিক্রমে উৎপাদনের খরচের বোঝা (কস্ট বার্ডেন) ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির (তথা স্মল স্কেলটির ইণ্ডাস্ট্রিগুলির) উপর সরিয়ে দেওয়া এবং তাদের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়।" ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এটা অসুবিধাজনক তা তিনি স্বীকার করেন।

"কিন্তু সাবকণ্ট্রাক্ট মাধ্যমে এক নিপুণ পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুযায়ী (অ্যান এফিসিয়েন্ট ফর্ম অব স্ট্যাটিসটিক্যাল কণ্ট্রোল) উৎপন্নের গুণগত

* স্টেট্‌সম্যান, ৪র্থ কলম, ৭ম পৃষ্ঠা ২রা আগস্ট, ১৯৭০

** সাংবাদিক ঐ বিশেষজ্ঞের এইরূপ পরিচয় দিয়েছিলেন :

Dr. Takehiko Matsuda (49) D. Sc. Vice president of the International federation of operational Research Societies holds a chair in the Tokyo Institute of Technology in Management Systems Engineering.

-মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। কারণ ছোট শিল্পগুলি সাধারণতঃ বড় শিল্পগুলির তদন্তাধীন।" ভদ্রলোক কমপিউটার ইত্যাদির পরিচালনার গুণকীর্তন করতে গিয়ে আসল কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন। নিয়ন্ত্রণটা পরিসংখ্যানের নিপুণ পদ্ধতির ব্যাপার নয়। আসল কথাটা হচ্ছে ঐ শেষের কথাটা "ছোট শিল্পগুলি সাধারণতঃ বড় শিল্পগুলির তদন্তাধীন। 'তদন্তাধীন' শব্দটির পরিবর্তে 'নিয়ন্ত্রণাধীন' বলাই উচিত ছিল। জাপানের একচেটিয়া মালিকানা কোন স্তরে পৌছেছে সমস্ত বক্তব্যটি তারই পরিচয় দিচ্ছে।

যাই হোক, এখানেও আমরা দেখছি এঙ্গেল্‌সের সেই কথার দৃষ্টান্ত। শ্রমশক্তির মূল্যের যা নর্ম্যাল মান তার চেয়ে কম দরে শ্রম আয়ত্ত ক'রে তার থেকেই লাভ করা হচ্ছে। আর বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতার সঙ্গে মুকাবিলা করতে নর্ম্যাল মুজরীর উপর যে উদ্বৃত্ত মূল্য তার থেকেই দরে ওটা-নামার ধাক্কাটা সামলে নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ ক্রেতার নিকট তারই অংশ বা গোটাটা পার ক'রে পণ্যকে সস্তা করে বিক্রয় করার চেষ্টা হচ্ছে।

এখন প্রতি দেশে একচেটিয়া মূলধনের স্ফীতি ছোটশিল্পের উপর বড় শিল্পের নিগড় আরও কঠিন করেছে।

এঙ্গেল্‌সের বক্তব্যে আমরা দেখেছি এইভাবে একটা দেশে সমগ্র মজুর শ্রেণীর মজুরী মান নামিয়ে দেওয়া হয়। আজ জাপানে একচেটিয়া আধিপত্যে এঙ্গেল্‌স্ বর্ণিত অর্থনৈতিক সূত্রটিকে নিপুণভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

উপরোক্ত অধ্যাপক নিজের দেশের কথা বলতে গিয়ে শান্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং গর্বসহকারে শতকরা ১০ হারে উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও বলেছেন। নিম্নের হিসাবে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায়।

জাপানে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত উৎপাদন যেখানে বেড়েছে শতকরা ১৪৬ ভাগ সেখানে প্রকৃত মজুরী বেড়েছে মাত্র শতকরা ৬৮ ভাগ। উপরে বর্ণিত পদ্ধতি ও একচেটিয়া আধিপত্য মাধ্যমে মজুরের স্কন্ধে কিভাবে খরচের বোঝা (কস্ট বার্ডেন) চাপানো হয়েছে তা পরিষ্কার হচ্ছে। জাপানের শিল্পপতিরা দেশকে যেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম ঘাঁটিতে পরিণত করেছেন এবং মার্কিন একচেটিয়া ধনপতিদের সঙ্গে একজোট হয়েছেন তাতে এটা স্বতঃই সংশয় হয় যে যাতে উপরোক্ত অধ্যাপকের বিশ্বপ্রতিযোগিতার উক্তিতে দর কম করা বা কনসেশান দেওয়ার যে ইঙ্গিত রয়েছে তার মধ্যে বহির্বাণিজ্যে সহযোগী মার্কিন একচেটিয়াদের বা মার্কিন দেশে একচেটিয়া

ক্রেতাদের ছাড় দেওয়ার অর্থও নিহিত থাকতে পারে। যার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় নিজের দেশের মজুরদের মজুরী কমিয়ে সহযোগী মার্কিন একচেটিয়াদের সাহায্য করা।

সে যাই হোক, মোট কথা দেখাই যাচ্ছে জাপানে মজুরের শোষণ তীব্রহারে বেড়ে চলেছে। এবং এই শোষণবৃদ্ধি জাপানের শিল্পের উল্লেখিত দ্বৈত কাঠামোর ফলে আরও সহজ হচ্ছে। জাপানের শ্রমিক এ জিনিস অবশ্যই সহ্য করবে না। জাপানের শ্রমিক আন্দোলন, মার্কিন রণঘাঁটি অপসারণের দাবির আন্দোলন প্রভৃতি তার সাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুত: একচেটিয়ার আধিপত্যে ঐরূপ সংগঠন এবং শ্রমিকের এইরূপ শোষণ শ্রমিকের সংহতি এবং একচেটিয়া ধনপতিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে মার্কিন রণঘাঁটিকে আটকে ধরে প্রতিক্রিয়াশীলরা রেহাই পাবে—তাদের এ-আশা বৃথা।

এঙ্গেল্‌সের বর্ণিত আর একটি দিক

এবার এঙ্গেল্‌সের বর্ণিত আর একটি দিকের কথায় ফিরে যাব। এঙ্গেল্‌স্ উপরে তাঁর উদ্ধৃতিতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত অবস্থার মধ্যেও শুভ সম্ভাবনার লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। পাঠক দেখেছেন ঐ উদ্ধৃতিতে বুর্জোয়াজী ও পেটি বুর্জোয়াজী কেমন ভাবে নিজেদের লাভের জন্য গ্রাম্য শিল্পের এবং কুটির শিল্পের সমর্থন করেন। তার পর তিনি বলছেন:

"এটা বিষয়টির একটি দিক। এর একটি বিপরীত দিকও আছে। কুটির শিল্প জার্মান বহির্বাণিজ্যের, অতএব সমগ্র বড় শিল্পের (লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রির) প্রশস্ত ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে জার্মানীর ব্যাপক এলাকায় এ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে।...যাই হোক কুটিরশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক কৃষক এলাকাগুলি আজকের শিল্পের আন্দোলনে আকর্ষিত হলো। কুটির শিল্পের প্রসারের দ্বারা গ্রাম এলাকার এই বিপ্লবীকরণ জার্মানীতে শিল্প বিপ্লবকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপেক্ষা আরও অনেক বেশী ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের শিল্পের অপেক্ষাতর নিম্ন মানই এলাকার বিস্তৃতি আরও বাধ্যতামূলক করছে। এতেই বোঝা যায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানীতে কেন শ্রমিক আন্দোলন শুধু শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ না থেকে এত বিরাট ও বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।" এটাকে

এঙ্গেল্‌স্‌ বলেছেন "আরও বেশী বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রাথমিক স্তর মাত্র। মার্কস যেমন ক্যাপিট্যালে প্রমাণ করেছেন* বিকাশের এক স্তরে মেশিনারী এবং ফ্যাক্টরী উৎপাদন ব্যবস্থার দরুন এরও পতন হবে।" এইভাবে জার্মানীর অবস্থা আরও কী করে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবে, তার একটা ছবি এঙ্গেল্‌স্‌ দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, এঙ্গেল্‌সের বর্ণিত তখনকার জার্মানীর সঙ্গে আমাদের সব কিছু মিলবে এমন কথা নয়। এঙ্গেল্‌স্‌ সমসাময়িক কারণেই অন্যান্য দেশ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে বিভিন্ন রকমের বিকাশের চরিত্র দেখিয়েছেন। 'হাউসিং কোশ্চেন' তিনি লিখেছেন ৯৮ বৎসর আগে এবং উপরে উল্লেখিত ভূমিকা (আংশিক উদ্ধৃত) লিখেছেন ৮৩ বৎসর পূর্বে। অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসরের তফাৎ। ইতোমধ্যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। সুতরাং বৈচিত্র্যের নিদর্শন এখন অনেক বেশী।

কিন্তু জাপানের দৃষ্টান্তে পাঠক দেখেছেন তাঁর মূল তত্ত্বটি অভ্রান্ত দিগদর্শন হিসাবে রয়ে গেছে।

আমাদের দেশেও অন্তত: পক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁত শ্রমিক বিড়ি শ্রমিক প্রমুখ শ্রমিকেরা গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশীদার হয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের শক্তিকে প্রসারিত করেছেন। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে যেসব বড় বড় শিল্প হচ্ছে সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামের কৃষকের, গ্রামের গরীবের নিবিড় সংগ্রামী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আজ দুর্গাপুর, হীরাপুর, কল্যাপুর বলতে সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনই বোঝায় না, বোঝায় সেখানকার কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর সংগঠন। দেখতে দেখতে কলদিয়াও আজকে সেইরূপ সংগ্রামের কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আকাশজোড়া তারার মত সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে ছোট বড় নানারূপ শ্রমিককেন্দ্র গড়ে উঠেছে আর তাদের দীপ্তিতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম এলাকাকে আলোর পথে টেনে নিয়ে এসেছে।

* Capital, Volume I, Moscow, English Edition, Pages 470—80

বিড়লা কথিত সুসমাচার

"...তিনি মানুষ ভাল এবং আপনাকে আন্তরিক ভাবেই বোঝার চেষ্টা করছেন......।"

মন্তব্য করছেন শ্রী ঘনশ্যাম দাস বিড়লা তাঁর এক পত্রে, যাঁকে বোঝার আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে—তিনি হচ্ছেন গান্ধীজী। পত্রটি লেখা হয় তাঁকেই।

কিন্তু মানুষটি? যাঁর জন্য বিড়লা বলছেন 'তিনি ভাল'—এই 'তিনিটি' কে?

স্যর জন অ্যাণ্ডারসন! শুনে চমকে উঠবেন অনেকেই। কিন্তু ঘটনাটা তাই, বিড়লার পুস্তক "ইন দি শ্যাডো অব দি মহাত্মা" ১৭ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন।

পত্রটির তারিখ হচ্ছে ৩১শে মার্চ ১৯৩৩। সেই সময়, সেই অ্যাণ্ডারসনের কালে সারা বাংলা জুড়ে ইংরাজের তাণ্ডবলীলা চলছে। অ্যাণ্ডারসানী বিভীষিকা ও সন্ত্রাস বলে বাংলায় একটা কথাই রয়ে গেছে।

এই ঘটনাটা একটা নিদর্শন মাত্র। এর জানলার ছোট ফাঁকটা একটু বড় করে খুলে দিলে এক নাটক দেখা যাবে। একদিকে ভারতের সাধারণ মানুষ, যুবক, ছাত্র কর্মীরা ইংরাজের সঙ্গে লড়ছে, গ্রেপ্তার হচ্ছে, বন্দী হচ্ছে, ফাঁসীতে যাচ্ছে—আর একদিকে যবনিকার অন্তরালে অন্য দৃশ্য চলছে—যেখানে সেই অত্যাচারীদের সঙ্গে মিল মুলাকাত, কথাবার্তা ও বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন বুর্জোয়া নেতারা ভারতের অন্যতম বৃহৎ ধনপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মাধ্যমে।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, গান্ধীজীর বিশিষ্ট শিষ্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছেই ব্যাপারটা শুনুন। উল্লেখিত পুস্তকের ভূমিকায় গান্ধীজীর আন্দোলন চলাকালের কথা উল্লেখ করে তিনি বলছেন, "সেই ঘটনাবহুল কালে দেশে যা ঘটলো তা অবশ্য সকলের ভাল ভাবেই জানা আছে; কিন্তু গান্ধীজীর ক্যাম্প এবং গভর্নমেন্টের ক্যাম্প উভয়ের মধ্যেই পর্দার আড়ালে কি ঘটছিল তার কিছুই জানা নেই বললেই হয়। এই পুস্তকটি সেই ফাঁকটি পূরণ করছে।"

বিড়লার জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলছেন : "যা অন্তত: গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার সম্বন্ধে বৃটিশদের কাছে তিনি নিজেকে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে প্রমাণিত করেন।" গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান শিষ্য, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি, ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন বলছেন এ বিষয় বিড়লা বিশ্বস্ত ভূমিকা পালন করেছেন তখন আর কারও সে বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকার নেই।

স্বরাষ্ট্র সচিব স্যর হেনরী ক্রেক, যাঁর দমননীতিও অখ্যাত নয়, তাঁকে বিড়লা বলছেন : "...স্যর হেনরী ক্রেক, আপনাকে বেশ কল্পনা করা যায় যে আপনি হাজার হাজার মানুষের মাথা ভেঙ্গেছেন এবং অর্ডিনান্স ইস্যু করে গেছেন; আপনাকে কল্পনা করা যায় হাতে পিস্তল নিয়ে, তলোয়ার নিয়ে আপনি চলছেন। কিন্তু আমি আপনাকে যখন সাক্ষাৎ দেখি এবং আপনার কথা শুনি তখন মনে হয় আপনি একজন সরল ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ।..."

উত্তরে স্যর হেনরী ক্রেকও সন্তোষজনক কথা বলছেন : "...গান্ধীজীর আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি স্বীকার করি তিনি **কমিউনিজমের জোয়ার আটকে দিয়েছেন**।..." (কথাবার্তার তারিখটা ৩০শে জুন, ১৯৪৫)

১৯৩২ সালে ১০ই এপ্রিল বাংলার কুখ্যাত নিপীড়ক জন অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি গান্ধীজীর সম্বন্ধে বলছেন : তিনি অ্যাণ্ডারসনের কাছে স্বীকার করলেন যে কংগ্রেসের পূর্ণ দাবী মেটানো সম্ভব নয় কিন্তু এমন গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করা সম্ভব যা গান্ধীজী রিজেক্ট করবেন না, বাতিল করবেন না। ফাইনান্সের সম্বন্ধে তিনি বললেন, ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের সঙ্গে ফ্যাক্টরীর মালিকদের সম্পর্ক যেমন থাকে আমরা সেইরকম সম্পর্কের ভিত্তিতে ফ্যাক্টরীর মালিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত ডিবেঞ্চার হোল্ডার আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না।..."* পাঠক লক্ষ্য করবেন ক্ষমতা হস্তান্তরের একযুগ পূর্বেই গান্ধীজীর মনোভাব ঠিক মতো ব্যক্ত করতে পারেন বলে যাঁর উপর ভরসা করা যেতো তিনি ইংরাজকে জানিয়ে দিচ্ছেন ভারতে তার শোষণের দরুন যে পাওনা সে পাওনা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকবেই।

---

* ডিবেঞ্চার : শেয়ার ছাড়া অন্য ধরনের সিকিউরিটি যাতে নির্দ্ধারিত হারে একটা পাওনা মেটাবার প্রতিশ্রুতি থাকে।

বিড়লা ছিলেন ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্র নেওয়ার পক্ষে। পরপর যা ঘটে তাতে প্রমাণ হয় যে গান্ধী শেষ কংগ্রেস কর্তৃক এই গঠনতন্ত্র প্রথা সম্বন্ধে যে মনোভাব পোষণ করেছিলেন এবং যেভাবে সযত্নে ইংরাজদের তিনি জানিয়ে দিলেন তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়।

কংগ্রেস ঐ গঠনতন্ত্রকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য ঘোষণা ক'রে ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে অবতরণ করলো। জনসাধারণকে এই ভাবে তারা প্রবঞ্চিত করলো। অথচ গান্ধীসহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গোড়া থেকেই এই গঠনতন্ত্র কার্য্যকরী করার পক্ষে ছিলেন এবং ইংরাজকে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। মোটমাট সারমর্মটাই বলছি। বিড়লা তাঁর পুস্তকে এ বিষয়ে বোঝাপাড়া করার চেষ্টায় তাঁর বিশেষ অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের বিবরণ দিয়েছেন।

তার পুনরুল্লেখ এখানে প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে তখনকার ১৯৩৫ সালের আইনের পক্ষে বিড়লার বক্তব্য পরবর্তী ইতিহাসে যে সমর্থিত হয়েছে তাও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান তথ্য হলো এই যে বর্তমান গঠনতন্ত্রের মধ্যে ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্রের অনেকখানি গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থান দেওয়া হয়েছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা এখানে না উল্লেখ করলে জমীদার এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে প্রথম পক্ষের অধিক প্রতিক্রিয়াশীলতার কথাটা বাদ থেকে যায়। হিন্দু-মুসলমান চুক্তি আলোচনার মধ্যে এর প্রতিফলন দেখা যায়। মিশ্র-নির্বাচনের ব্যাপারে, জয়েন্ট ইলেক্টোরেটের ব্যাপারে যেহেতু ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগের প্রস্তাবে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবী করা হয় এবং জিন্না সাহেবের ১৪ দফার মধ্যে একটি ছিল ঐ প্রথা চালু রাখা সেই হেতু এইটাই তখন এবং বরাবর প্রচারিত করা হয় যে এ ব্যাপারে জেদটা যেন শুধু জিন্নারই। কিন্তু এই ব্যাপারে জিন্নাকে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবী পরিত্যাগ করানোতে রাজী করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বাংলা দেশে পূর্ব বাংলার জমীদারদের এ বিষয়ে মিশ্র নির্বাচনে বিরোধিতা দেখা গিয়েছিল এবং ১৯৩৫ সালের আইনের প্রাক্কালে এই বিরোধিতা কংগ্রেস-লীগ চুক্তির যে একটা বড় বাধা হয়েছিল সে কথা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সাধারণের কাছে চাপা দেওয়া হয়।

১৯৩৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীকে এক পত্রে বিড়লা লিখছেন :

জিন্নাহ রাজেন্দ্র-প্রসাদ সূত্র বিষয়ে আমার ধারণা হলো ভয়ের ফলে লোক কাপুরুষতা দেখাচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাংলা দেশের এম-এল-এরা সূত্রটি পছন্দ

করছেন কিন্তু তাঁদের এই ফরমূলা স্বাক্ষর করার সাহস নেই। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক একে পছন্দ করেছেন কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক করেননি। কিছু মাথা গরম যুবকও আছেন যাদের বিপ্লবী বলা হয়। প্রত্যেকেই এই সূত্র সম্বন্ধে ভীত। **নলিনী (সরকার) আসছেন কিন্তু যেহেতু তিনি পূর্ববঙ্গের মিশ্রনির্বাচন প্রথম উল্লেখ মাত্রই ভীত।**...বাংলা দেশের হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা পশ্চিমবাংলার তাঁরা মিশ্র নির্বাচনের পক্ষে। অন্যদিকে যাঁরা পূর্ববঙ্গের তাঁরা একেবারে ভীত (simply frightened of it) এবং সব চেয়ে খারাব হচ্ছে এই যে একজনও বাঙ্গালী নেই যিনি সাহস করে এ সম্বন্ধে মুখ ফুটে কথা বলেন।......" আমরা জানি সাধারণ মুসলমানের মতো সাধারণ হিন্দুও এ সবের কিছুই জানতেন না। বাংলার জমীদাররা বাংলার ক্ষতিসাধনে কতদূর প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এ সব থেকেই তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বুর্জোয়া নেতাদের কংগ্রেস এবং গান্ধীজীকে সমালোচনা না করে পারা যায় না। জমীদারদের সঙ্গে মৈত্রীর ফলে তাঁরা শুধু তাদের সঙ্গে সায় দিয়েছেন তাই নয়, জমীদারদের ভূমিকাটা সাধারণের সামনে তারা প্রকাশও করেননি। যার ফলে ইংরাজের বিরুদ্ধে মিলিত আন্দোলনের পক্ষে বাধাগুলিকে সাহায্য করা হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় গান্ধীজীর অবস্থা মনোযোগ আকর্ষণ করে! প্রথম দিকে তিনি হিটলারকে সমালোচনা করে এক খোলা চিঠি দেন। কিন্তু সেই খোলা চিঠি লেখার ও তার রচনার মধ্যেই একটা যেন দরকষার ভাব উঁকি ঝুঁকি মারছে বলে পাঠকের মনে হয়। গান্ধীজীর কাছে হিটলারের ওজনটা একটু বেশী দাঁড়ায়। হিটলারের নিকট হল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করার পর এ ভাব বিশেষ করে লক্ষিত হয়। ১৬ই মে ১৯৪০ মহাদেবজী বিড়লাকে এক পত্র লেখেন :

Hitler's stock with Bapu is going up. I remarked that so long he said nothing publicly it was going to be alright.

বিড়লা লিখছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ গান্ধীজী ধরেই নিয়েছিলেন বৃটেন যুদ্ধে হেরে বসে আছে এবং লর্ড লিনলিথগোকে ঐ মতো লিখে এক পত্রও দিলেন। মহাদেব দেশাই এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বিড়লার কাহিনীতে শেষের যে ছবিটি বেরিয়ে এল তাতে পরবর্তী কালের অনেক কিছু ঘটনার উপর আলোকপাত করে এবং প্রকৃত অর্থের ইঙ্গিত দেয়।

সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে মার্কসীয় মতবাদ

পূর্বের প্রবন্ধ গুলিতে কয়েকটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে কিংবা কিছু কিছু প্রশ্ন অন্তর্নিহিত রয়ে গেছে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যার আলোচনা হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে উক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

সংরক্ষণ শুল্ক এবং অবাধ ব্যবসা

"গান্ধীজী ও চরখার তাৎপর্য্য" প্রবন্ধটিতে সংরক্ষণ শুল্কের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিভাবে সংরক্ষণ শুল্কের দাবী (ডিমাণ্ড ফর প্রোটেকটিভ ট্যারিফ) কুটিরশিল্প প্রভৃতির প্রচারের মাধ্যমে উত্থিত হতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যেই যে উত্থিত হয়েছে তার নিদর্শন ও তার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে তাঁর মতের সমর্থনে গান্ধীজীর নিজস্ব উক্তির উল্লেখের আর বেশী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। শুধু পাঠককে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং গান্ধীভক্তের উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। "তিনি প্রোটেকশানিজ্‌মের অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি বিদেশী পণ্যের উপর কঠোর শুল্কের পক্ষে সজোরে যুক্তি দিয়ে আবেদন করতেন যাতে জাতীয় শিল্পের লালন হয়।" (এম-কে-গান্ধী : ইক-নিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইফ পুস্তকের ভূমিকা)।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সংরক্ষণ শুল্ক বনাম অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে মার্কসবাদের অভিমত কী ?

মার্কস নিজেই এ বিষয় বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। এঙ্গেলস্‌ও করেছেন। এর বিশদ আলোচনা পাওয়া যায় মার্কসের এক ভাষণে। ১৮৪৮ সালের ৯ই জানুয়ারী ব্রাসেলসের "ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশানে" তিনি এই ভাষণ দেন* বৃটেনে বুর্জোয়াজীর কর্ন-ল'-বিরোধী যে আন্দোলন হয় এবং

* মস্কোয় প্রকাশিত মার্কসের "পভার্টি অব ফিলজফি" পুস্তকটির পরিশিষ্টের মধ্যে এই ভাষণটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারোদনিকদের রোমানটি-সিজমের সমালোচনা করতে গিয়ে লেনিনও মার্কসের এই ভাষণের বিস্তৃত

শেষে সেই কর্ন্-ল' বাতিল করা হয়। মার্কসের আলোচিত বিষয়বস্তু ঐ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

কাজেই কর্ন্-ল'-এর ব্যাপারটা বুঝে নিতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পনের বৎসর ফরাসী বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কালের ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলতে থাকে। ফলে ইংলণ্ডে কর্ন্ বা খাদ্য শস্য আমদানী ব্যাহত হয়। ইংলণ্ড তখন দ্রুত আধুনিক শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। সহরগুলিতে বা যে-সব স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠীত হয়েছে সে-সব স্থানে দেশের ভিতর থেকেই হোক বা দেশের বাইরে থেকেই হোক খাদ্যশস্যের আমদানীর প্রয়োজন বেড়েছে। যুদ্ধ জনিত বিঘ্নের কারণে বাইরে থেকে আমদানী ব্যাহত হওয়ায় দেশের ভিতর খাদ্যশস্যের চাহিদা ও মূল্য বাড়ে। ফলে জমীদার লর্ডরা এবং ফারমার কৃষকরা লাভবান হয়।

১৮১৫ সালে যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা দেখা দেয়।

ইতোমধ্যে "শিল্পের প্রসার যা জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছিল তা ম্যানুফ্যাকচারের বৃদ্ধির গতি মন্দীভূত হওয়ার কারণে এবং যন্ত্রপাতির (মেশিনারীর) অবিচ্ছিন্ন ধারায় উন্নতির ফলে—কৃষির উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে অ্যাবসর্ব্ (অভিনিবিষ্ট বা সঙ্কুলায়িত) করে নিতে পারছিল না। এই কারণে এর পর থেকে দুর্দ্দশা, যা এতদিন শিল্প-বিশিষ্ট এলাকাগুলিতে ছিল এবং তাও ছিল কখনও কখনও, এখন কৃষি এলাকাগুলিতেও দেখা দিল।"

যুদ্ধ-বিরতির দরুন আমদানী ব্যবসায় যে বাধা ছিল তা দূর হলো। "কৃষকদের খুব নিম্নমূল্যেই ফসল বিক্রয় করতে হলো; সুতরাং তারা খুব কম মজুরীই দিতে পারছিল।"* ফসলের দাম উঁচু রাখার জন্য ১৮১৫ সালে একটি আইন পাশ করা হলো। এই আইনানুযায়ী গমের দাম প্রতি 'সিক-চন্দরে' আশী শিলিং-এর নীচে নামলে আমদানী বন্ধ থাকবে, এইরূপ ব্যবস্থা নির্দেশিত হলো। এর পর ১৮২২ এবং ১৮২৮ সালে কয়েকটি সংশোধনী হয়। কিন্তু সবেরই উদ্দেশ্য এক। গমের দাম যেন নীচে নামতে না-পারে।

খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের আমদানীর উপর বিধিনিষেধ থাকলে বা সংরক্ষণ

আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: লেনিনের "এ ক্যারেকটারিজেশান অব ইকনমিক রোমানটিসিজম", মস্কো প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫২-২৬৫

* এঙ্গেলস্ "কনডিশান অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড" (মার্কস এণ্ড এঙ্গেলস্ অন ব্রিটেন, মস্কো, পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮)

শুল্ক থাকলে শিল্পপতিদের অসুবিধা হয়। অবাধ আমদানী থাকলে ও খাদ্য সস্তা হলে মজুরী কম হয়। কাঁচামালের অবাধ আমদানীতে উৎপাদনের অসুবিধা দূর হয়। অন্যদিকে বিধি নিষেধ ইত্যাদি বাতিল করার প্রস্তাব জমীদারদের শঙ্কিত করে। ফসলের দাম বেশী থাকলে বেশী খাজনা দিয়েও জমি নেবার তাগিদ থাকে। অপেক্ষাকৃত কমা গুণের জমিরও নেওয়ার লোক থাকে। এর ফলে খাজনা বেশী হয়। সুতরাং খাদ্যশস্যের অবাধ আমদানীর প্রবর্তন করলে জমীদারদের অসুবিধা এই তাদের ধারণা।

অবাধ আমদানীর ব্যবস্থা করতে হলে প্রতিবন্ধক 'কর্ন্-ল' গুলির উচ্ছেদ ও বাতিল প্রয়োজন। ১৮৩৮ সালে অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা রিচার্ড কবডেনের (১৮০৪-১৮৬৫) উদ্যোগে "অ্যান্টি-কর্ন্-ল লীগ" তথা কর্ন্-ল-বিরোধী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৬-এ তাঁর ও তাঁর সহযোগী শিল্পপতিদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়।

উপরে উল্লেখিত ভাষণে মার্কস্ বলছেন: "ইংলণ্ডে কর্ন ল'-এর উচ্ছেদ উনবিংশ শতাব্দীতে অবাধ বানিজ্যের (ফ্রী ট্রেডের) পক্ষে বৃহত্তম জয়। যে-দেশেই শিল্পপতিরা অবাধ বাণিজ্যের কথা বলে, প্রধানতঃ তাদের মনে থাকে সাধারণতঃ খাদ্যশস্য এবং কাঁচা মালের অবাধ ব্যবসা। বিদেশী শস্যের উপর শুল্ক-প্রবর্তন কলঙ্কজনক। এতে দাঁড়ায় বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিয়ে ফাটকাবাজী।"

জনগণের 'সস্তা খাবারের' জন্য কর্ন্-ল'-বিরোধী লীগ গঠন ক'রে অবাধ বাণিজ্যওয়ালা প্রচার ইত্যাদিতে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ কর[illegible]ল। মার্কস্ ব্যঙ্গ করে বলছেন: "কিন্তু এটা অদ্ভুত যে জনগণ যাদের জন্য সস্তা খাদ্য সংগ্রহ করবে তারা অকৃতজ্ঞ।...জনগণ বোরিং ব্রাইট কোম্পানী প্রমুখদের (তথা যারা এর প্রবক্তা তাদের) সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সবচেয়ে নির্লজ্জ ভণ্ড হিসাবে দেখছে।" কেন? শিল্পপতিরা দাবী করেন, গমের উপর শুল্ক প্রকৃত মজুরীর উপর ট্যাক্স। এই ট্যাক্স জমীদাররা লাভ করে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মাহার্ঘ্য বলেই তো মজুরের অবস্থা খারাপ। মার্কস শ্রমিকের মুখ দিয়ে এর জবাব দেন। মালিকের উদ্দেশ্যে শ্রমিক বলেন: "গত ৩০ বৎসরে আমাদের শিল্প এত বেড়ে উঠলো, কিন্তু গমের দাম যত বেড়েছে মজুরী সে অনুপাতে অনেক বেশী পড়ে গেছে। এ কেমন করে হয়? তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী আমরা জমীদারদের (গমের দামের মাধ্যমে) যে ট্যাক্স দিই তা মজুর প্রতি সপ্তাহে মাত্র তিন পেন্স,

দাঁড়ায়। অথচ ১৮১৫ থেকে ১৮২৮-এর মধ্যে হস্তচালিত তাঁতের তাঁতীদের মজুরী সপ্তাহে ২৮ শিলিং থেকে ৫ শিলিং এবং পাওয়ার লুম তাঁতের তাঁতীদের মজুরী ১৮২৩ থেকে ১৮৪৩-এর মধ্যে সপ্তাহে ২০ শিলিং থেকে ৮ শিলিংএ পড়ে গেল। কিন্তু এই সমস্ত কালটা ধরে জমীদারদের আমরা যে খাজনা দিলাম তা তিন পেন্সের বেশী নয়।...” প্রত্যুত্তরে মালিক বলে মজুরদের প্রতি-যোগিতার কারণেই মজুরী কমে। তারা বলে, আমরা যদি অপেক্ষাকৃত কমা জমিগুলিতে মূলধন ও শ্রম অপব্যয় না করে শিল্পে খাটাই, সমস্ত ইউরোপ তাদের কারখানা ছেড়ে দেবে আর ইংলণ্ড একটা বৃহৎ শহরে পরিণত হবে; বাকী ইউরোপ ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে পরিণত হবে।

মার্কস মালিকদের এই সব ভণ্ড জনহিতৈষণার মুখোশ খুলে দেন। তিনি দেখিয়ে দেন খাদ্যশস্য সস্তা হলে মজুরী পড়বে। ক্লাসিক্যাল ইকনমিক্সের অগ্রগণ্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের পথিকৃত রিকার্ডোকে উদ্ধৃত করেন। রিকার্ডো বলছেন: “যদি আমরা নিজেরা খাদ্য ফসল উৎপাদন করার পরিবর্তে যেখান থেকে আমাদের সরবরাহ পূরণ করতে পারি এমন বাজার আবিষ্কার করি, মজুরী পড়বে এবং মুনাফা বাড়বে। কৃষি-উৎপন্নের মূল্যের পতন শুধু খেতখামারে নিযুক্ত কৃষি-শ্রমিকের মজুরী কমায় তা নয়, ব্যবসা এবং ম্যানুফ্যাকচারে নিযুক্ত সকল শ্রমিকদেরও মজুরী কমিয়ে দেয়।”

মার্কস্ বুঝিয়ে দেন যদি শুধু এই কারণে মজুরী এক ফ্রাঙ্ক কমে, পাঁচ ফ্রাঙ্কের স্থানে চার ফ্রাঙ্ক হয়, শ্রমিকের পক্ষে তা অগ্রাহ্য করার মতো নয়। কারণ, শ্রমিক পূর্বে রুটির খরচ কম করে কিছু বাঁচিয়ে অন্য যে অভাব মেটাতো তার সুযোগ গেল। তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে যখন মালিকের মুনাফা বেড়ে যাচ্ছে, সামাজিক স্তরে শ্রমিকের কি আরও নেমে যেতে হচ্ছে না?

মার্কস বলছেন: “ইংরাজ শ্রমিকগণ অবাধ-বাণিজ্যওয়ালাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা শেষোক্তদের প্রচারের কুহকে প্রতারিত নয়। তা না হয়েও জমীদারদের বিরুদ্ধে তাঁরা অবাধ-বাণিজ্যের প্রবক্তাদের সঙ্গে একজোট হয়েছেন। সামন্ততন্ত্রের শেষে অবশিষ্টাংশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এইরূপে একজোট হয়েছেন, কারণ, তাঁদের উদ্দেশ্য ধ্বংস সাধনের পর তখন লড়বার জন্য বাকী থাকবে মাত্র এক শত্রু। শ্রমিকেরা হিসাবে ভুল করেননি। কারণ, জমীদাররা শিল্প মালিকদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ১০ ঘণ্টা শ্রমের আইন পাশের জন্য শ্রমিকদের সমর্থন করলো। ত্রিশ বৎসর

ধরে শ্রমিকেরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল। কর্-ল-'উচ্ছেদের অব্যবহিত পরে এই আইন পাশ হলো।"

অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তারা তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবক্তারা দাবী করতেন অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তিত হলে, আমদানী রপ্তানী সম্পূর্ণ মুক্ত হলে জিনিষপত্রের দাম সস্তা হবে। মার্কস বলছেন, যদি সব জিনিষের দাম কম হয়, শ্রমিকের পক্ষেও তা হবে। কিন্তু একটু অসুবিধা আছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যও তো কমে যাবে। সব পণ্যের মধ্যে সেও একটা পণ্য। কাজেই মজুরীর হার কমে যাবে। বস্তুতঃ অনুপাতে মজুরী আরও বেশী কমবে। এর উত্তরে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বলবেন, মজুরী কমলেও জিনিষপত্র সস্তা হওয়ার দরুন কনজাম্‌শান্ বা ভোগের পরিমাণ বাড়বে। ফলে উৎপাদন বাড়বে। তখন শ্রমিকের শ্রমশক্তির চাহিদা বাড়বে। এরূপ চাহিদার ফলে মজুরী আবার চড়বে।

মার্কস বলছেন: "(ওঁদের) যুক্তির ধারা এইরূপ। অবাধ বাণিজ্য উৎপাদন শক্তি (প্রডাকটিভ ফোরসেজ্) বৃদ্ধি করে। শিল্প যদি বাড়তে থাকে, ধন, উৎপাদিকা শক্তি এক কথায় উৎপাদনশীল মূলধন যদি বাড়ে, শ্রমের চাহিদা, তার মূল্য ফলতঃ মজুরীরও রেটও বাড়ে।"

"শ্রমিকের জন্য সব চেয়ে অনুকূল পরিস্থিতি হচ্ছে মূলধনের বৃদ্ধি। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যদি মূলধন একই অবস্থায় থাকে, শিল্প শুধু সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, বরং তার ক্ষয় হতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম বলি হবে শ্রমিক। পুঁজিপতির পূর্বে তার পিঠ দেওয়ালে ঠেকবে। যে-ক্ষেত্রে মূলধন বাড়তে থাকে—যে অবস্থার জন্য আমরা বলছি শ্রমিকের অবস্থা সবচেয়ে ভাল তখন তার ভাগ্যে কী ঘটবে? তখনও তার পিঠ সেই দেওয়ালেই ঠেকবে। উৎপাদনশীল মূলধনের বৃদ্ধির অর্থই হলো মূলধন পুঞ্জীভূত হওয়া এবং কেন্দ্রীভূত হওয়া। মূলধন পুঞ্জীভূত হলে শ্রমের বিভাগ এবং যন্ত্রের ব্যবহার আরও বেড়ে যাবে। শ্রমের বিভাগ বেশী হওয়ার কারণে সেই শ্রমবিভাগ শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতা, নিপুণতার বিনাশ সাধন করবে। নিপুণ শ্রমের যেখানে প্রয়োজন ছিল সেখানে তার স্থানে এই সহজসাধ্য শ্রম ঠাঁই নেওয়ার ফলে যে কোনও ব্যক্তি তা সম্পাদন করতে পারবে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে।"

মার্কস দেখালেন এর সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের পুঞ্জীভবনের ফলে উন্নত হতে

উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার হতে থাকবে এবং তিনজন শ্রমিকের কাজ একজন শ্রমিকের দ্বারা সম্পাদিত হবে। ছোট শিল্পপতিদের এতে বিনাশ হবে। তারা প্রলেতারিয়েতের সারিতে যোগ দেবে। মূলধন জড়ো হওয়ার সঙ্গে তাল রেখে সুদের হার কমতে থাকবে। সুতরাং যারা ছোটো পুঁজি খাটিয়ে জীবিকার সংস্থান করে তাদের অবস্থাও কাহিল হবে। শেষে তারাও প্রলেতারিয়েতের সারিতে যোগ দেবে।

শেষে উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই তা বাড়বে ততই উৎপাদন ঘটবে আঁধারে ঢিল ছোড়ার মতো। যে বাজারের জন্য সে-উৎপাদন তার চাহিদা তার জানা থাকবে না। উৎপাদন যতই এইভাবে ভোগের (কনসাম্প্‌-শান) থেকে আগে বেড়ে থাকবে ততই সংখ্যায় এবং পরিমাণে সঙ্কট বাড়তে থাকবে। কিন্তু এইরূপে প্রতিটি সঙ্কট মূলধনের পুঞ্জীভবনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণ করে। বাড়িয়ে তোলে প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা।

এই প্রসঙ্গে মার্কস দেখান কী বেদনাদায়ক ভাবে বিলাতে এবং ভারতে তাঁতীরা ধ্বংস হয়েছে।

কিন্তু সব শেষ কথাটা কী? তিনি বলেন, মূলধন বাড়লে ও পুঞ্জীভূত হলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, মুখোমুখী শ্রেণী-বিরোধিতা (ক্লাস-অ্যানট্যাগনিজ্‌ম্) কমবে না—বরং বাড়বে। তার সামাজিক বিপ্লবও এগিয়ে যাবে।

মার্কস সতর্ক করে দিয়েছেন—তিনি অবাধ বাণিজ্যের সমালোচনা করেছেন বলে তার অর্থ এ নয় যে তিনি সংরক্ষণ-ব্যবস্থা (প্রোটেকসানিস্ট সিসটেমকে) সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করলে তার অর্থ এ দাঁড়ায় না যে সমালোচক অতীতের স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন।

মার্কস বলছেন "সংরক্ষণ ব্যবস্থা আর তো কিছু নয়—শুধু একটা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করার উপায়।" এই বৃহৎ শিল্প যখনই প্রতিষ্ঠিত হলো তখনই তা বিশ্বের বাজারের উপর কমবেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। যন্ত্রপাতি আমদানী করা থেকেই এর সূত্রপাত হয়। কাঁচা মালেরও প্রয়োজন হয়। আকারে ও গুরুত্বে যথোপযুক্ত হলে উৎপন্ন পণ্য দেশের বাইরে বিক্রয়েরও প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া, তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, সংরক্ষণে লালিত শিল্প তো দেশের ভিতর অবাধ বাণিজ্য দাবী করে এবং পায়ও। দেশের ভিতর থাকে অবাধ প্রতিযোগিতা—ফ্রী কমপিটিশান। ফলে দেশের ভিতর এক এক এলাকায় বা

গ্রামে গ্রামে যে-সব পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থা থাকে, যেমন লাঙ্গলের পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁত, প্রতিযোগিতায় তার বিনাশ সাধন ক'রে এই বড় শিল্প এগিয়ে যায়।

ভারতের ক্ষেত্রে এ সবেরই দৃষ্টান্ত আমরা দেখছি এবং দেখেছি। লাঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত তাঁত ও চরখা প্রভৃতি হস্ত শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র এক একটি গ্রাম সমাজ ইংরাজ বহুদিন পূর্বেই ভেঙ্গে দিয়েছিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিছু উল্লেখ যোগ্য শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ইংরাজ আমলেই এরা দেশের অভ্যন্তরে তখনও চলতি হস্তশিল্পগুলিকে বিশেষ আঘাত দিল। উপরে এক প্রবন্ধে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের গল্পে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। দেশে কল-কারখানা যত বাড়লো হস্তচালিত তাঁতশিল্প ও অন্যান্য হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় ঘা খেয়ে পড়ে যেতে বাধ্য হলো। সংরক্ষণ শুল্কের ফলে বাড়ে সেই কল-কারখানা। কাজেই প্রতিযোগিতায় তা চরখা আর হস্তশিল্পকেই আঘাত করে। এইজন্যই কলের তৈরী খদ্দর চরখায় প্রস্তুত খদ্দরের স্থান দখল করে। এ গেল দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার কথা। দেশের বাইরেও রপ্তানি শুরু হয়। স্বাধীনতার পর এখন পৃথিবীর বাজারে আমাদের দেশের অনেক পণ্য রপ্তানী প্রসারিত হচ্ছে।

এই জন্য মার্কস বলছেন :

"The protectionist system is nothing but a means of establisning large scale industry in any giver country, that is to say, of making it dependent upon the world market, and from the moment that dependence upon the world market is established, there is already more or less dependénce upon free trade. Besides this, the protective system helps to develop free competition within a country. Hence we see that in countries where the bourgeoisie is making itself felt as a class, in Germany for example, it makes great efforts to obtain protective duties. They serve bourgeoisie as weapons against feudalism and absolute government, as a means for the concentration of its own powers and for the realisation of free trade within the same country." (On the

Question of free trade, Page 215, 'Appendix, Proverty of Philosophy, Moscow Edition).

তবু সেই শতাধিক বৎসর আগেকার কালের কথা বলতে গিয়ে মার্কস বলেছেন "সাধারণত: আমাদের আজকের কালে প্রোটেকটিভ সিসটেম তথা সংরক্ষণ ব্যবস্থা রক্ষণশীল এবং অবাধ বাণিজ্যের ধ্বংসকারী। শেষোক্ত ব্যবস্থা তথা অবাধ বাণিজ্য পুরাতন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভেঙ্গে দেয় এবং বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের অ্যানট্যাগনিজম্ (তথা মুখোমুখি তীব্র বিরোধিতাকে) তীব্রতর করে। এই বিরোধিতাকে শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়। এক কথায়, অবাধ বাণিজ্য সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। ভদ্র মহোদয়গণ, একমাত্র এই বিপ্লবী অর্থে আমি ফ্রী ট্রেডের পক্ষে ভোট দিচ্ছি।*

ইতোমধ্যে শ্রমিকের ভাগ্যে কী হবে ?

ঐ বক্তৃতাতেই মার্কস বলে দিয়েছেন :—"শ্রমিক দেখবেন শিকল ছাড়া অবাধ সুযোগের মূলধন সংরক্ষণ শুল্কের শৃঙ্খলে বর্ধিত মূলধনের মতোই তাকে দাস করে রাখবে।......যতদিন পর্যন্ত মূলধন এবং মজুর শ্রমের সম্পর্ক আছে ততদিন পর্য্যন্ত একটা শ্রেণী থাকবে যে শোষণ করবে এবং আর একটা শ্রেণী থাকবে যে শোষিত হবে।" সুতরাং সেই ব্যবস্থাই সহজে কাম্য যা সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত ক'রে উৎপীড়িত শ্রেণীর মুক্তিকে সফল করবে।

সংরক্ষণ শিল্প কেমন করে দেশের অভ্যন্তরে কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প এবং ছোট শিল্পকে বিনাশ ক'রে বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে তার পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে। এ থেকে বোঝা যাবে একদিকে কুটির শিল্পের প্রস্তাব এবং একই সঙ্গে অন্যদিকে সংরক্ষণ শুল্কের দাবী অচল। সংরক্ষণ শিল্প কুটির শিল্পের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে মার্কস বলেছেন :—

"আধুনিক রাজস্ব বা ট্যাক্স ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র যা ঐ ব্যবস্থার চাকাকে ঘোরায় তা হলো, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর ট্যাক্স। (সঙ্গে সঙ্গে এই ট্যাক্স যে সব জিনিসের উপর প্রযুক্ত হয় তার মূল্য বাড়ায়।) ফলত: এর মধ্যে থাকে সেই ট্যাক্সের ক্রমোত্তর স্বতঃই বৃদ্ধি হবার বীজ। অত্যাধিক করভারটা আকস্মিক নয়—একটা নীতি। হল্যাণ্ডে এই ব্যবস্থা প্রথম চালু করা হয়। হল্যাণ্ডের মহান দেশভক্ত ড উইট তাঁর "ম্যাক্সিম" লেখায় যেহেতু মজুরী শ্রমিককে এই ট্যাক্স ব্যবস্থা বাধ্য, অনুপাত-মিতব্যয়ী ও পরিশ্রম করে সেই

---

* উপরে উল্লেখিত মার্কসের প্রসিদ্ধ ভাষণ ।

হেতু একে উচ্চে তুলে ধরেছেন। এখানে অবশ্য মজুরী শ্রমিকের অবস্থার উপর এই ট্যাক্স যে ধ্বংসকারী প্রভাব প্রয়োগ করে তার সঙ্গে আমরা তত সংশ্লিষ্ট নই যত সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত বিষয়ের জন্য। এর ফলে কৃষক, হস্তশিল্পী এক কথায় নিম্ন-মধ্যবিত্তের সকল অংশের সম্পদ যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয় তার সঙ্গেই এ ক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। এই ভাবে ট্যাক্স মারফত শোষণ করার, কেড়ে নেওয়ার কার্য্যকারিতা সবচেয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছায় সংরক্ষণ শিল্পে। এই সংরক্ষণ শিল্প তার অবিচ্ছেদ্য অন্যস অংশ।" ক্যাপিট্যালের উক্ত উদ্ধৃত অংশ ইংরাজীতে নিম্নরূপ :

"Modern fiscality whose pivot is formed by taxes on the most necessary means of subsistance (therby increasing their price) thus contains within itself the germ of automatic progression, over taxation is not an incident, but rather a principal. In Holland, therefore, where this system was first inaugurated, the great patriot De Witt has in his "Maxims" extolled it as the best system for making the wage labourer submissive, frugal, industrious and over burdened with labour. The destructive influence that is exercises on the condition of the wage labourer concerns us less, however, here, then the forcible expropriation, resulting from it of peasants, artisans, and in a word, all elimeats of the lower middle class. On this there are not two opinions, even among the bourgeois extremists. Its expropriating efficacy is *still further heightened by the system of protection* which forms one of its integral harts." Capital Vol. I, Page 756, Moscow edition of 1954).

গ্রাম বনাম শহর

মানুষের সমাজ বিবর্তনের আদিতে যে সব শ্রম বিভাগ দেখা দিল শহর বনাম গ্রাম তার মধ্যে একটি।

গৃহ সমস্যা পুস্তকে এঙ্গেল্‌স্ দেখিয়েছেন কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যোগ রেখে

যে সব কাব্য কলাপ সামাজিক পরিকল্পনা রচনা করার চেষ্টা করেছে বুর্জোয়াদের নিজেদের স্বীকৃতিতেই দেখা যায় তা শেষ পর্যন্ত গ্রাম বনাম শহর—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে এসে ঠেকে যায়। এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে তা ব্যর্থ হয়। একমাত্র ধনতন্ত্রের অবলুপ্তিতেই এর সমাধান।

এই সমস্যা সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে এঙ্গেলস্ বলেছেন: "বর্বরতার উপরকার স্তর আরও একটি শ্রম বিভাগে নিয়ে এলো। কৃষি এবং হস্তশিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ। এর ফল হলো ক্রমোত্তর বৃদ্ধির হারে পণ্যোৎপাদন—বিশেষ করে বিনিময়ের জন্য পণ্যোৎপাদন। তাতে ব্যক্তিগত উৎপাদকের মধ্যে বিনিময় সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া কর্মের এক উচ্চতম পর্য্যায়ে পৌঁছে গেল। সভ্যতার যুগে শ্রমের বিভাগগুলি আরও শক্ত হলো এবং প্রতিষ্ঠিত বিভাগগুলি আর বৃদ্ধি করলো। বিশেষ করে সহর এবং গ্রামের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যকে (অ্যান্টিথিসিসকে) তীব্রতর করলো। (হয় সহর গ্রামের উপর আধিপত্য খাটাতো যেমন হয়েছিল প্রাচীনকালে, কিংবা গ্রাম খাটাতো সহরের উপর যেমন হতো মধ্য যুগে)। এই যুগ আর একটা তৃতীয় শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করলো যার নিজেরই বৈশিষ্ট্য এবং সিদ্ধান্তকারী গুরুত্ব ছিল। এ এমন একটা শ্রেণী তৈরী করলো যারা উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করলো শুধু উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় করতে। এই শ্রম-বিভাগ হলো ব্যবসায়ীর বা বণিকের।"* প্রাচীন সহরের নিদর্শনে রোমের কথায় মার্কস বলেছেন: "রোম বাস্তবিকই কখনও শুধু নগরের (সিটির) বেশী কিছু হয়নি। প্রদেশগুলির সঙ্গে এর সম্পর্কে ছিল রাজনৈতিক। যে কোনো সময় রাজনৈতিক ঘটনার ফলে এ সম্পর্কে ভাঙ্গা যেত।"**

মধ্যযুগের সহর সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন, সহরের মধ্যে ছিল ব্যবসায়গুলির ফিউড্যাল (সামন্ততান্ত্রিক) সংগঠন। এখানে সম্পত্তি প্রধানতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের শ্রম। সংগঠিত ডাকাতে অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন ছিল। যে যুগে শিল্পের পেশাদার নিজেই আবার ব্যবসায়ীও ছিলেন, সে-যুগে সমষ্টির পোষকতায় নির্দ্ধারিত রাজাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠা সহরগুলিতে পলাতক ভূমিদাসরা ভিড় করছিল।

---

(১) এঙ্গেলস্ "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র", পৃষ্ঠা ২৪৫, মস্কো, ১৯৪৮ সংস্করণ। (২) জারম্যান আইডিওলজি, পৃষ্ঠা ৩৪, মস্কো, ১৯৬৮

তাদের স্বষ্ট প্রতিযোগিতার সমস্তাও একটা সমস্তা হয়ে দাঁড়ালো। চতুর্দিকে ছিল ফিউড্যাল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই সামন্ততান্ত্রিক কারণের ফলে দেখা দিল সমষ্টি ও মণ্ডল চরিত্রের গিল্ড্। সামন্ততন্ত্রের কালে এইরূপে একদিকে ছিল ভূসম্পত্তি যাতে ছিল ভূমির সঙ্গে শৃঙ্খলিত ভূমিদাস এবং অন্যদিকে সহরে ছিল স্বল্প মূলধনের ব্যক্তিগত হস্তশিল্পী যার সঙ্গে থাকতো তার অধীনস্থ শিল্পী (যাকে বলা হতো) জারনিম্যান। উভয় সংগঠনের, কৃষির এবং হস্তশিল্প উৎপাদনের চরিত্র ছিল সীমাবদ্ধ—ছোটো আকারের প্রাচীন অনগ্রসর পদ্ধতির ভূমি চাষ এবং কারিগরী প্রকৃতির শিল্প। ফিউড্যালিজমের (সামন্ততন্ত্রের) পূর্ণ বিকাশের যুগেও শ্রম-বিভাগ খুব কমই ছিল। প্রত্যেক দেশের মধ্যেই ছিল সহর বনাম গ্রামের দ্বন্দ্ব (অ্যান্টিথিসিস)। চারিদিকে উপরে বর্ণিত কারণে ফিউড্যাল আধিপত্যের ফলে সহরের উপর ছিল গ্রামের আধিপত্য। মার্কস এঙ্গেলস্ এইভাবে ফিউড্যাল যুগে সহরের অবস্থার বর্ণনা করেছেন। (জারম্যান আইডিওলজি দ্রষ্টব্য)

আমাদের দেশে তথা প্রাচ্য জগতে কিন্তু সহরের চরিত্র ছিল ভিন্নরূপ। তা ছিল রাজা বাদশা, তাঁদের দরবারী আমীর ওমরাহ, কর্মচারী এবং সৈন্য সামন্তের উপর নির্ভরশীল। মার্কস বলছেন: "প্রাচ্যে সহর গড়ে ওঠার ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের নিকট নয় বৎসর থাকা চিকিৎসক ফ্র্যাঙ্করেজ বানিয়ারের লেখার মতো উজ্জ্বল, জীবন্ত, চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ঐ লেখার মতো পড়ার আর কিছু পাওয়া যায় না। ......দিল্লী বা আগ্রার মতো এক একটা গোটা বড় রাজধানীর সহর প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই সেনা-বাহিনীর উপর নির্ভরশীল। ফলে বাদশা বেশ কিছু কালের জন্য যুদ্ধে বের হলে গোটা সহরই বাদশাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। কারণ, এই সব সহরগুলি কোনও মতে প্যারিসের মতো নয় এবং তা হতেই পারে না। বস্তুতঃ সঠিক বলতে এরা মিলিটারী ক্যাম্প বা শিবির ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু খোলা মাঠে অবস্থিতি অপেক্ষা একটু ভালভাবে, সুবিধাজনকভাবে অবস্থিত।" (এঙ্গেলস্কে লিখিত পত্র, ২রা জুন, ১৮৫৩)

ইউরোপে সহরগুলিতে গিল্ডের কথা উপরে বলেছি। এই গিল্ড ব্যক্তিগত উৎপাদকের মণ্ডল। নানান রকমের আঘাতের আশঙ্কায় এদের সমষ্টিগত জীবনকে দৃঢ় করতে হতো এবং দৃঢ় হয়েও ছিল। চারিদিকের সামন্ত

অভিজাতদের চাপের প্রতিরোধ, পলাতক ভূমিদাসদের প্রতিযোগিতা, কারবারের ক্ষেত্রের নিরাপত্তা প্রভৃতির স্বার্থে এবং আত্মরক্ষার স্বার্থে তারা দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে থাকতো। (এ সংগঠন সম্বন্ধে উপরে কিছু উল্লেখ থাকলেও বিস্তৃতভাবে পুনরাবৃত্তি করতে দোষ নেই।) এক একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে থাকতো 'মাস্টারম্যান' যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তা বলা যায়। তার অধীনে জারনিম্যান এবং তার নীচে শিক্ষার্থী অ্যাপ্রেনটিস। শেষোক্ত দীর্ঘদিন কাজ করার পর, কাজ শেখার পর জারনিম্যান হতে পারতো এবং জারনিম্যান শেষে মাস্টারম্যান হতে পারতো। জারনিম্যান জানতো সেও একদিন মাস্টারম্যান. হবে। এইরূপে একটি প্রত্যাশিত জীবিকার সূত্র পরস্পরের মধ্যে বন্ধনকে দৃঢ় করে রাখতো। এরা একদিকে ছিল উৎপাদক এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ও করতো। সহরে ছুটকো মজুর যরো জড়ো হতো তারা উৎপাদনের ব্যবস্থায় কোনও বিশিষ্ট স্থান না পাওয়ায় এক নিম্নস্তরের অবস্থায় থেকে যেতো। (ইংরাজীতে বলা হয়েছে 'র‍্যাব্‌ল্'।) একদিকে নানান কারণে আত্মরক্ষার তাগিদে নিজেদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন, অন্য দিকে বিশেষ বিরোধী শক্তি না থাকার ফলে মধ্যযুগে সহর থেকে বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল কম। বরং কৃষকের বিদ্রোহই তখনকার লক্ষণ—যেমন ইংলণ্ডে ও জারমানীতে কৃষক বিদ্রোহে দেখা গিয়েছিল।

শ্রম বিভাগের বিস্তারে ব্যবসায়ীর এক পৃথক ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার পর সে ক্ষেত্র প্রসারিত হতে লাগলো। জনসংখ্যা বাড়ছে। ফলে চাহিদাও বাড়ছে। এই চাহিদা মেটানোর জন্য ম্যানুফ্যাকচারের উদ্ভব হলো। ম্যানুফ্যাকচার হলো বর্তমান বৃহৎ শিল্পের আদি বীজের মতো। বর্দ্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য হস্তশিল্পীদের এক জায়গায় জড়ো করে একই স্থানে তাদের দিয়ে উৎপন্ন করিয়ে নেওয়া হতো। চাহিদাও বেড়েছিল পরিধানের বস্ত্রের। কৃষকগণ পরিধানের প্রয়োজনে চাষের কাজের সঙ্গে বয়নের কাজও করতো। ফলে শিল্পের মধ্যে এইটাই সহজে আয়ত্ত শিল্প ছিল। সুতরাং বয়ন শিল্পই ম্যানুফ্যাকচারের প্রথম অবলম্বন হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এর উন্নতিও হতে লাগলো। বিলাসের প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ বিশেষ গুণ সম্পন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ায় উৎপাদন নিপুণতাতেও উন্নত হলো।

ম্যানুফ্যাকচারের প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গিল্ডের বন্ধন শিথিল

হয়ে পড়লো। নতুন 'বার্ঘার' বা সহরে ধনী দেখা দিল। এরাই হলো পরবর্তী বুর্জোয়া শ্রেণীর আদি। ব্যক্তিগত মালিকানায় নিযুক্ত শ্রমিক মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচার যত বাড়তে লাগলো, ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি ব্যবহার হতে লাগলো, প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব হলো। এইভাবে সামন্ততন্ত্রের বিরোধী শক্তির সমাবেশে সহর গড়ে উঠতে লাগলো।

সমগ্র ব্যাপারটার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কটা বোঝা প্রয়োজন। প্রাচীন দাসপ্রথার আমলেও ব্যবসা বাণিজ্য ছিল, সামন্ত যুগেও ছিল এবং এখনও আছে। উৎপাদন পদ্ধতির উপর বাণিজ্যের ভূমিকা কি থেকেছে এবং সহর বা গ্রামের সঙ্গেই বা কি সম্পর্ক থেকেছে এগুলি আলোচনার দরকার।

নিম্নে প্রদত্ত মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল হতে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি* এই বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে :

ব্যবসা প্রভাবে উৎপাদনের সংগঠনে কিছুটা ডিসসলিউশান (ভেঙ্গে যাওয়া) দেখা দিতে পারে কিন্তু শুধু ব্যবসার বৃদ্ধিতেই পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয় না। পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতিতে তা কতখানা ডিস্‌সলিউশান (ভেঙ্গে পড়া) ঘটাতে পারবে সেটা নির্ভর করবে ঐ পুরাতন পদ্ধতির নিরেটত্ব এবং অভ্যন্তরীণ গাঁথুনির উপর। অন্য ভাষায় বলতে গেলে এই ডিস্‌সলিউশান (ভেঙ্গে পড়া) পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির বদলে কোন্ নতুন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনে পৌঁছাবে, আসলে আদৌ পৌঁছাবে কি না সেটা নির্ভর করবে পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির : ত্রের উপর। প্রাচীন জগতে সব সময়েই বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ী মূলধনের উন্নতির ফল হতো দাস-প্রথা বিশিষ্ট অর্থনীতি। বাণিজ্যের ফলে ফারাকটা আরম্ভ হতো এই বিষয় থেকে যে শুধু আশু ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত দাস-প্রথা থেকে তা পরিণত হতো উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে এমন দাস-প্রথায়। অর্থাৎ বিনিময়ের জন্যই উৎপাদন করা হতো কিন্তু সে উৎপাদন হতো সেই দাস প্রথার মাধ্যমেই। উৎপাদনের পদ্ধতিটা থেকে যেতো একই। যাই হোক, আধুনিক কালে বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ী মূলধনের উন্নতির ফলে আসে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি। সুতরাং এ সব থেকে সিদ্ধান্তটা দাঁড়ায় এই যে এই সব ফল ঐ

---

* অনুবাদ সম্পূর্ণটা আক্ষরিক নয়। ইংরাজী শব্দগুলি ছাড়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া লেখাগুলি লেখকের। বোঝার সুবিধার জন্য যোগ করা রয়েছে।—লেখক

বাণিজ্যের প্রসার বা ব্যবসায়ী মূলধনের উন্নতি ছাড়া অন্যান্য পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়। এতো স্বাভাবিক যে সহরের শিল্প যখনই কৃষি-শিল্প থেকে আলাদা হলো তখনই সেই গোড়া থেকেই ঐ সহর-শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যে পরিণত হলো। কাজেই ঐ সব পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাণিজ্যের মাধ্যম প্রয়োজন হলো। বাণিজ্যের ঝোঁক থাকে সহরের উন্নয়ন ঘটানোর এবং অন্যদিকে সহরের নির্ভরতা থাকে বাণিজ্যের উপর। এ পর্যন্ত স্বাভাবিক। যাই হোক কী পরিমান শিল্পে উন্নয়ন তার সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে সেটা সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থার ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। প্রাচীন জগতে রোমেই বণিকের মূলধন বৃদ্ধি ঘটে। তার অতীতে এরূপ উচ্চ পরিমাণে এই বৃদ্ধি ঘটেনি। কিন্তু সেই উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উৎকর্ষ দর্শায়নি। অন্যদিকে ইউরোপ ও এশিয়া মাইনরে গ্রীসের ও কোরিন্থের সহরগুলিতে বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বেশ উৎকর্ষ ঘটে। আবার সহরের বৃদ্ধি হওয়া এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থা গড়ে ওঠা এ সবের সম্পূর্ণ বিপরীত কাণ্ড ঘটে যাযাবর জাতি সমূহের মধ্যে। তাদের মধ্যে এ সব ছাড়াই বণিকের মূলধন এবং ব্যবসায়ী প্রবণতা বাড়াতে প্রায়ই দেখা যায়।

ভৌগোলিক আবিষ্কার (আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার এবং সমুদ্রপথে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগের পথ আবিষ্কার) এর ফলে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যে বিরাট বিপ্লব ঘটে যায়। সন্দেহ নেই যে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে অবস্থান্তর আরও অগ্রসর করানোর মধ্যে বাণিজ্যের ঐ বিপ্লব অন্যতম প্রধান উপাদান। বিশ্বের বাজারের হঠাৎ এক ব্যাপক বিস্তৃতি, আদান-প্রদানের পণ্যের কয়েকগুণ বৃদ্ধি, এশিয়ার উৎপাদিত দ্রব্যাদি এবং আমেরিকার সোনারূপা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য অধিকারে আনার জন্য ইউরোপের জাতি সমূহের প্রতিযোগিতা, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার আবির্ভাব (নানান দেশে উপনিবেশ স্থাপন)—এ সমস্তই উৎপাদনের উপর সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলকে ধ্বংস করার পথে বেশ ভাল পরিমাণে যোগান দিল। যাই হোক প্রথম যুগেই ম্যানুফ্যাকচারের কালেই আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল সেখানেই **যেখানে মধ্যযুগেই তার অনুকূল অবস্থা পূর্ব হতেই গড়ে উঠেছিল**। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পর্তুগালের সঙ্গে হল্যাণ্ডের তুলনা করে দেখুন। (ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকা থেকে ভারত পর্য্যন্ত পোর্ত্যাণ্ড বাণিজ্যের বিস্তার ঘটালো, উপনিবেশ স্থাপন করলো, কিন্তু এ সবে

তার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটলো না।) যখন ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যের আচমকা বিস্তৃতি এবং বিশ্ব-বাজারের উদ্ভব পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির পতনের অনুকূলে সর্বাত্মকভাবে যোগান দিল, তাও সম্পাদিত হলো সেই স্থানে যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির পূর্ব হতেই অস্তিত্ব ছিল। সেই অস্তিত্বের উপরে ভিত্তি করেই তা সম্পাদিত হলো।

বিশ্ব-বাজার এই উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি। অন্যদিকে এই উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে অন্তস্থিত রয়েছে এক সহজাত প্রবণতা। সেটা হচ্ছে ক্রমোত্তর বেশী করে বৃদ্ধির হারে উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্ব বাজারকে ক্রমাগত ব্যাপকতর ক'রে এবং বিস্তৃততর ক'রে চলে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য শিল্পে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাচ্ছে না। বরং শিল্পই বাণিজ্যে সেইরূপ রূপান্তর ঘটাচ্ছে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রাধান্য এখন কম বেশী বড় শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ড এবং হল্যাণ্ডের মধ্যে তুলনা করুন। বাণিজ্যে নেতৃস্থানীয় জাতির মর্যাদা থেকে হল্যাণ্ডের অধোগতির ইতিহাস বাণিজ্যে নিযুক্ত মূলধন শিল্পে নিযুক্ত মূলধনের অধস্তন হওয়ার ইতিহাস।

প্রাক ধনতান্ত্রিক যুগের জাতীয় উৎপাদন পদ্ধতির যথেষ্ট নিরেটত্ব এবং সাংগঠনিক শক্তি থাকলে সেই শক্তি বাণিজ্য কর্তৃক উক্ত উৎপাদন পদ্ধতিকে জীর্ণ করার ক্ষমতা এবং ক্ষয় করার ক্ষমতার প্রতিরোধ করে। ভারত ও চীনের সঙ্গে ইংরাজদের বাণিজ্যিক সম্পর্কে এই অবস্থা বিস্ময়কর এবং চিত্তাকর্ষক রূপে বিচিত্রিত হতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র আকারের কৃষি এবং কুটির শিল্পের একাত্মীভূত সংগঠনের উপর এর সাধারণ প্রশস্ত ভিত্তি। ভারতের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে আবার সাধারণ মালিকানায় জমিও যোগ করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ চীনেও আদিতে জমির এই অবস্থা ছিল। ভারতে ইংরাজরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং (রাজক্ষমতা বলে) জমির মালিক হিসেবে অর্থনীতিক ক্ষমতা অবিলম্বে প্রয়োগ ক'রে এবং আঘাত ক'রে এই ক্ষুদ্র অর্থনীতিক সম্প্রদায়-গুলিকে ভেঙ্গে দেয়। ইংরাজের বাণিজ্য এই সমাজগুলির উপর বৈপ্লবিক প্রভাব প্রয়োগ করে এবং অভ্যন্তরীণ নীরেটত্ব ছিন্নভিন্ন করে দেয় মাত্র সেই মাত্রায় যে মাত্রায় তাদের সরবরাহিত পণ্যগুলির স্বল্প মূল্য এদের সূতাকাটা ও বয়ন শিল্পকে ধ্বংস করে। সাধারণভাবে কৃষি এবং শিল্পের ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের একাত্মীভূত করার যোগসূত্র এবং মিলিত করার উপাদান ছিল ঐ

শিল্প। (ইংরাজের শুধু বাণিজ্য ঐ ভাঙনের কাজ করতে পারেনি। রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষমতার প্রয়োগ ছিল আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ইংলণ্ডের আধুনিক শিল্পে উৎপন্ন পণ্য)। তাহলেও এই ডিস্‌সলিউশানের কাজ, ভাঙনের কাজ ধীরেই চলছে। শিল্প এবং কৃষির একই স্থানে একত্র যোগ থাকায় আদান প্রদানে সময়ের প্রয়োজন এবং খরচ উভয়ই কম হয়। ফলে বৃহৎ শিল্পের পণ্যের এরা কঠিন প্রতিরোধ করে। বড় শিল্পের পণ্যের মূল্যের মধ্যে তো পণ্য চলাচলের (সারকুলেশানের) ব্যয় ধরা থাকে।

*　　*　　*　　*

উপরে মার্কসের উদ্ধৃতিতে আমরা দেখলাম ভারতে গ্রাম কী করে ভেঙে ছিল (প্রসঙ্গতঃ, একের পর এক ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির বণিকগণ ভারতে আসার পর শেষে ইংরাজের প্রাধান্য হলো এবং তারাই কায়েম হলো—ঘটনার এইরূপ গতি এবং পরিণতিরও হেতু এবং ব্যাখ্যা এর সঙ্গেই পাওয়া যায়), পলাশীর যুদ্ধের পর কেমন করে ইংরাজ ভারতকে লুঠ করেছিল এবং ১৮১৩ থেকে কেমন করে ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্র ভারতে আমদানী করে গ্রামের মধ্যে কৃষির সঙ্গে জড়িত এই শিল্পকে নষ্ট করেছিল তার ইতিহাস মার্কস তাঁর সুপরিচিত লেখায় দিয়ে গিয়েছেন।* এ সব স্মরণ করতে মার্কসের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হলেও, তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখিয়েছেন কেমন করে ধীরে ধীরে আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা মুক্তির পথ উন্মোচন করবে। যাঁরা কাব্যকল্প হিসাবে গ্রামগুলিকে সুখের স্বর্গ মনে করতেন তাঁদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই গ্রামগুলিই প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারের ভিত্তি ছিল এবং এর মধ্যেই মানুষ এক হীন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল।

এঙ্গেল্‌স বলেছেন: "প্রাচ্য গভর্নমেণ্টের তিনটি শাসন ব্যবস্থার বেশী থাকেনি: অর্থ-বিভাগ (তথা দেশের মধ্যে লুণ্ঠন), যুদ্ধ (তথা দেশের মধ্যে এবং বাইরে লুণ্ঠন) এবং সাধারণের কাজ (পুনরুৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা)। ভারতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এক নম্বর এবং দুই নম্বরটি খুবই একটা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চালিয়ে যাচ্ছে এবং তিন নম্বরটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে; ফলে ভারতের কৃষি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। অবাধ প্রতিযোগিতা সেখানে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিন্দিত করেছে (ডিসক্রেডিট

---

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য মার্কসের ভারত সম্বন্ধে রচনা ক্যাপিট্যাল, ১ম খণ্ড, ৩১ম পরিচ্ছেদ এবং আর-পি-ডি'র 'আজিকার ভারত' দ্রষ্টব্য।

করেছে)। সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের তৈরী উর্বরতা বন্ধ হয়ে গেল। এতেই বোঝা যায় কেমন করে গোটা গোটা বিস্তৃত এলাকা, যাতে এক সময় চমৎকার ভাবে চাষ করা হতো, এখন নগ্ন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।" (মার্কসকে লেখা পত্র, ৬ই জুন, ১৮৫৩)। কৃষকের দেয় করকে এমন করে বাড়ানো হতো যে করের চাপে কৃষক খোরাকী শুদ্ধ বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। ব্যবসায়ীরাও সুযোগ পেয়ে সস্তায় সব ফসল কিনে নিয়ে বাণিজ্য করে মুনাফা করতো। এর নিষ্ঠুরতম নিদর্শন পাওয়া যায় ইংরাজ আমলে ১৭৭০ সালে ('৭৬-এর মন্বন্তরে) এবং গোটা বৃটিশ যুগ ধরেই কম বেশী এই ধরনের ইতিহাস থেকেছে।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও মধ্যযুগে এবং প্রাচীন যুগে কিভাবে শোষণ হতো তার কথা গান্ধীজীও স্বীকার করেছেন। এ বিষয় পূর্বেও উল্লেখ করেছি; এখানে বিস্তৃত উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি। "মুসলিম শাসনের সময়েও চরখা ছিল। ঢাকা মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রাজারা মেয়েদের কাছ হতে এবং নিষ্পেষিত শ্রেণীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম আদায় করতেন। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র পুস্তকে এইরূপ বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যুগ যুগ ধরে চরখা হিংসার প্রতীক ছিল, জবরদস্তি করা এবং বাধ্য করার প্রতীক ছিল।" (কাটুনী সংঘের সম্মেলনে গান্ধীজীর বক্তৃতা, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)। ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকে অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে তাঁতীদের উপর কিরূপ অত্যাচার হয়েছিল তাও আমরা জানি।

গ্রামে কৃষকের উপর সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণ — ভয় শোষণের কথাও ভুললে চলবে না। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ছাড়াও ফসল বিক্রয়ে কৃষককে ঠকতে হয় আবার প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়েও ঠকতে হয়। মার্ক্সবাদীর প্রয়োজন নেই—গান্ধীজীর শিষ্য জাজুজী কাটুনী সংঘের সম্মেলনে বলেন, তাঁরা গ্রাম উন্নয়নে কৃষি ব্যাপার হাতে নেননি, কারণ, তা খুবই কঠিন। যদি উৎপাদন বেশী করা হয়, ইতোমধ্যে দাম পড়ে যায়, কৃষককে ঠকতে হয় (সম্মেলনে বক্তৃতা, ১২ই অক্টোবর, ১৯৪৪)। লেনিন ভাল ভাবেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রামের শোষণের ছবি দেখিয়েছেন। হস্তশিল্পের ক্ষেত্রেও তিনি বলছেন: "লক্ষ লক্ষ রুশ হস্তশিল্পীরা উৎপাদন করছে ব্যবসায়ীদের জন্য, তাদেরই সরবরাহ করা উপাদান দিয়ে এবং তাদেরই দেওয়া মজুরীতে। তারা কি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে নিযুক্ত নয়?" উপরে পৃথক প্রবন্ধে আলোচনায় আমরাও দেখছি আমাদের দেশেও

হস্তশিল্প এমন কি চরখা ও তাঁতের শিল্পও ধনতান্ত্রিক প্রথাতেই পরিচালিত। উল্লেখিত সম্মেলনে গান্ধীজীকেও তা স্বীকার করতে হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করার দরকার গ্রামের যা প্রধান কাজ তা হলো চাষ। তার তো প্রধান প্রশ্ন জমি এবং জমির মালিকানা সম্পর্ক। চরখার কথা গান্ধীজী তুলেছেন কিন্তু কাস্তে বা লাঙ্গলের কথা গান্ধীজী কখনও তোলেননি। তুললেই জমির প্রশ্ন চলে আসে! যুদ্ধোত্তর কালে কৃষক আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলনের আঘাতে তিনি কিছু কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু সেও তাঁর সেই 'ট্রাস্টি' তত্ত্বের আবরণে। জমির মালিকদের 'ট্রাস্টি' হতে হবে—তার অর্থ যাই হোক।

যাই হোক যে কোনও দিক দিয়েই দেখা হোক, ছককাটা কাব্যকল্প গ্রামের অস্তিত্ব শোষণ বিশিষ্ট সমাজে কখনও থাকেনি।

অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমানের বাস্তব ঘটনা মার্কসের কথায় ন্যয্যতাই প্রমাণিত করেছে।

এঙ্গেল্‌স্ গৃহ সমস্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, সামাজিক বিপ্লব কিভাবে এর সমাধান করবে সে-সমস্যা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ করণীয়ের প্রশ্ন ছাড়াও আরও বেশী সুদূরপ্রসারী প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। তার মধ্যে অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে গ্রাম এবং সহরের মধ্যে বিরোধ—'অ্যান্টি-থিসিস বিটুইন টাউন অ্যাণ্ড কান্ট্রি'। "আমাদের কাজ এ নয়, ভবিষ্যত সমাজ কেমন হবে তার জন্য কল্পিত ব্যবস্থা রচনা; কাজেই সে প্রশ্ন এখানে আলোচনা নিষ্ফলের চেয়ে বেশী।"

বলা বাহুল্য ধনতন্ত্রের ধ্বংস সাধন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নেই "গ্রাম বনাম সহর" এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা নিহিত থাকে।

উপরে বর্ণিত মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের কারণেই গান্ধী-বাদের কাব্যকল্প গ্রাম পুনর্গঠনের ব্যর্থতা। কিভাবে এই সম্বন্ধে প্রচারাদি বিপ্লবের প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়েছে তার পুনরালোচনার এখানে প্রয়োজন নেই।

ক্যাপিট্যালের প্রকৃতি ও পরিণতি

একটা গল্প আছে, এক পুরাতন গড়ের কাছে একটা গোপন স্থান আছে যা কারও জানা নেই। কেউ যদি হঠাৎ অনবহিত ভাবে সেখানে গিয়ে পড়ে

দেখবে মোহরের তূপ, নিয়ে আসতে পারলেই হলো। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে ওখানে গেলেই এ রকম একটা বাদশাহী মেজাজ হয়ে যায় যে নিজের হাতে একটি মোহরও নেওয়ার কথা মন থাকে না। মনে হয়, বয়ে আনার জন্ত চাকর দরকার। এখন যাকেই বাইরে থেকে চাকর হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়, তার মেজাজও এই রকম হয়ে যায়। সেও ভাবে আমিই বা নেব না কেন? কিন্তু তারও বিপদ ঐখানে। এমন বাদশাহী মেজাজ হয়ে যায় যে সেও সেই মোহর ছুঁতে পারে না। তারও চাকর দরকার। ফলে যেখানকার মোহর সেখানেই থেকে যায়—কারও আর আনা হয় না।

গল্পটা সামাজিক সম্পর্কে আভিজাত্যবোধে মানুষের মনের কি পরিণতি হয় তারই ছবি।

কিন্তু ঠিক একই মতো না হলেও এরই কাছাকাছি একটি বাস্তব নিদর্শন আছে। সেই নিদর্শনের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের ব্যাপারটা বোঝা পরিষ্কার হয়। ওয়েকফিল্ড নামক একজন লেখক আমেরিকার প্রথম দিকে উপনিবেশ স্থাপনের সময়কার কাহিনী লিখেছেন। পুঁজি নিয়ে গেলেও তা পুঁজি বাড়াবার কাজে লাগানো যাচ্ছিল না—বরং ছোটো ছোটো জমির মালিক যাদের নিজ থেকেই সব কাজ করতে হচ্ছে নবাগত অধিবাসীরা এই রকম অবস্থায় রয়ে যাচ্ছিল। মার্কস এঁর বর্ণিত কাহিনী ক্যাপিট্যালে উল্লেখ করেছেন। আমেরিকায় তখন প্রচুর জমি পড়ে আছে। সুতরাং যে যায় সেই নিজে কিছু জমি নিয়ে আবাদ শুরু করে দেয়, পরের মজুর দাস হয় না। পীল নামক একজন পুঁজিপতি মোটা পুঁজি এবং তিন হাজার শ্রমিক নিয়ে আমেরিকা গেলেন। তাঁর মতলব তাঁদের খাটিয়ে তিনি উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা করবেন। কিন্তু সঙ্গে নেওয়া ঐ মজুরেরা নিজেরাই জমি নিয়ে পৃথক ভাবে আবাদ করতে রত হয়ে গেলেন। (আমেরিকার এই সব প্রথম দিকের নবাগতেরা নিজেদের ঘরের আসবাবপত্র তৈরী করা থেকে ঘর তৈরী পর্যন্ত সব কিছু নিজেরাই তৈরী করে নিতেন।) ফলে পীল সাহেবের পরিকল্পিত মূলধন খাটানো হলো না। মজুরের অভাব আছে এ কথা জেনে বুঝে মজুর নিয়ে গিয়েও তিনি সে-মজুর খাটাতে পারলেন না। কারণ, জমি পাওয়ায় যে মজুর গেলেন তাঁর শ্রমশক্তি বিক্রয়ের প্রয়োজন হলো না।

সেই আমেরিকাতেই পরে ধনতন্ত্র বেশ ফুলে ফেঁপে উঠলো। ইউরোপ থেকে নবাগতরা ক্রমাগত পশ্চিমের দিকে এগোতে লাগলো। এ দিকে ইউরোপে

ছোট কৃষক এবং হস্তশিল্পের মালিক, যাঁরা নিজের উৎপাদন সামগ্রীর উপর পরিশ্রম ক'রে পণ্য উৎপাদন করতেন, তাঁরা বড় পুঁজির কাছে হার মেনে জমি ও উৎপাদন সামগ্রী হারালেন। ইউরোপে সংখ্যায় শ্রমিকের প্রাচুর্য্য হলো অনেক বেশী।

এর ফলে আমেরিকায় যাওয়া আরও অনেক বেড়ে গেল। যে-সংখ্যায় আমেরিকার পূর্বের আগতরা পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী ''বাগতরা এসে পড়ছিলেন। ফলে আমেরিকার পূর্ব এলাকায় যেখানে নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি অবস্থিত সেখানে বেশ কিছু মজুর অবশেষ হিসাবে থেকে যাচ্ছিলেন। এঁরাই নতুন আমেরিকার মজুর দাস হলেন।

অবশ্য এর আগেই দক্ষিণ দিকে দাসপ্রথা মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য সঞ্চয় করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

তারপর মার্কিন গৃহযুদ্ধ এবং তার দরুন ফাটকাবাজী প্রভৃতিতে ধনসঞ্চয়—এ সবের মাধ্যমে পুঁজিবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে উপরের বর্ণিত উপায়ে মজুরের উপস্থিতি উভয়ে মিলে আমেরিকায় মূলধন বৃদ্ধি হতে লাগলো।

যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে এই—একদিকে পুঁজি দরকার আর একদিকে এমন মানুষ দরকার যিনি এই অর্থে মুক্ত যে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় ছাড়া আর কোনও জীবিকার উপায় নেই। ছোট খাটো সম্পত্তি বা নিজস্ব উৎপাদনের যন্ত্র—এ সবের বন্ধন থেকেই তিনি মুক্ত। তাঁর শ্রমশক্তি ক্রয় করে কাজে লাগিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্যে লাভবান হয়েই পুঁজিপতি পুঁজি বাড়াতে পারবেন।

ইউরোপে একদিকে গিল্ডের ভাঙনের মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে ভূমিদাসত্বের অবসানে ধনতান্ত্রিক উপায়ে কৃষির ফলে অবস্থার এই পরিবর্তন সম্পত্তি-বিহীন সর্বহারা শ্রমিক বাড়িয়ে তুললো।

ছোটোখাটো হস্তশিল্পের কর্মী এবং জমির মালিকদের উৎপাদন সামগ্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলে এবং প্রাণশক্তি নিয়ে বাজারে উপস্থিত হতে হলো। এদের সম্পত্তিহীন করার পর এবার শুরু হলো পুঁজির স্ফীতি এবং কেন্দ্রীকরণ। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঁজি জমতে লাগলো। এখন যাদের সম্পত্তি গেল তারা ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী নয়, তার ক্ষুদ্র পুঁজিপতি।

এ দিকে উৎপাদন হয়ে গেল সামাজিক চরিত্রের। কোনও একটি বস্তু কোনও একজন শ্রমিকের তৈরী বলে ধরা যাবে না। নানান রকমের কাঁচামাল

উৎপাদন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যমে নানান শ্রমিকের নানান আংশিক শ্রমের যোগে হলো এক একটি উৎপন্ন পদার্থ।

সুতরাং এখন আর কিছু করার থাকলো না। শুধু মুষ্টিমেয় শোষক, যারা সকলের নিয়ে মোটা হয়েছে তাদের expropriate করে নিল, বা তাদের স্বত্বাধিকারত্ব কেড়ে নিয়ে সমাজের হাতে অর্পণ করলেই সব চুকে গেল।

ব্যাপারটা বাংলায় মোটামুটি ব্যাখ্যা করা হলো। কিন্তু মার্কসের নিজস্ব মূল বক্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে রাখার জন্য ক্যাপিট্যাল পুস্তকের একটি সংশ্লিষ্ট অংশ ইংরাজী থেকে অনুবাদ করে উদ্ধৃত করছি :

উৎপাদনের উপায় ও সামগ্রীর উপর শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তা সে কৃষিতেই হোক, বা মানুফ্যাকচারেই হোক বা উভয়েই হোক—এই হলো ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি। ক্ষুদ্র শিল্প আবার সামাজিক উৎপাদনে উন্নয়নের এবং শ্রমিকের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য এই ধরনের উৎপাদন, দাসপ্রথা এবং ভূমিদাস প্রথা এবং অধীনতায় জড়িত অন্যান্য সমাজব্যবস্থাতেও আছে। কিন্তু এ ঝেড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, পূর্ণ ক্ষমতাকে বিস্তার করে, এবং চিরায়ত আনুষ্ঠানিক রূপ নেয় কেবল মাত্র সেইখানে, যেখানে শ্রমিক হলো তার ব্যক্তিগত উপায়ের মালিক এবং উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হয়, সক্রিয় হয় সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার নির্দেশে। কৃষক হলে নিজের জমি নিজেই চাষ করে কিংবা হস্তশিল্পী হলে নিজের যন্ত্র নিজেই ব্যবহার করে গুণী শিল্পীর মতো। এই ধরনের উৎপাদনের পদ্ধতিতে পূর্ব হতেই থাকতে হবে জমি খণ্ড খণ্ড এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায় থাকবে বিচ্ছিন্ন এবং ছড়ানো। যেহেতু উৎপাদনের উপায়গুলির কেন্দ্রীকরণ এর বহির্ভূত, সেহেতু কো-অপারেশন বা পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতিটি উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্য শ্রমবিভাগ, প্রাকৃতিক উৎপাদন শক্তির সমাজ কর্তৃক প্রয়োগ ও সমাজের হাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং সামাজিক উৎপাদন শক্তির অবাধ বিকাশ সবই এর বহির্ভূত। **এর সঙ্গে চলতে পারে এমন ধরনের উৎপাদনের ব্যবস্থা ও সমাজ যা সঙ্কীর্ণ এবং কমবেশী আদিম চরিত্রের সীমার মধ্যে থাকে। একে চিরস্থায়ী করার অর্থই হলো—প্রেকয়ের যেমন বলেন—অনুচ্চ খাটো স্তরকে সার্বিক মান হিসাবে। এর ক'রে দেওয়া (to decre- universal mediocrity)।** বিকাশের এক স্তরে এ নিজেই নিজের ধ্বংস সাধনের বাস্তব উপাদানের জন্ম দেয়। সেই মুহূর্ত থেকে নতুন শক্তি এবং নতুন

আবেগ সমাজের বুকে জেগে ওঠে; কিন্তু পুরাতন সামাজিক সংগঠন তাকে শৃঙ্খলিত করে রাখে এবং দমিয়ে রাখে। ঐ পুরাতন সংগঠনের বিনাশ সাধন করতে হবে এবং তা করা হয়। এর বিনাশ সাধন, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থাকে সামাজিকভাবে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা, অনেকের 'ক্ষুদে ক্ষুদে' সম্পত্তিকে কয়েকজনের বৃহৎ সম্পত্তিতে পরিণত করা, বিরাট জনগণকে তাঁদের জমি থেকে, জীবিকার উপায়, শ্রমের উপায় থেকে বঞ্চিত ক'রে তাঁদের ঐসব থেকে বিচ্ছিন্ন করা—জনগণের এই সব ভয়ঙ্কর বেদনা-দায়ক প্রবঞ্চনা হচ্ছে মূলধনের (ক্যাপিট্যালের) ইতিহাসের প্রারম্ভিক কাহিনী। এর রূপ হচ্ছে এক ধারায় পরিচালিত জবরদস্তির কাজ। আমরা ইতঃপূর্বে এর মধ্যে যে-গুলি মূলধনের (ক্যাপিট্যালের) যুগ-সৃষ্টিকারী আদিম পুঁজিগঠনের পদ্ধতি, তার আলোচনা করেছি।* যাঁরা ব্যবহার্য দ্রব্য খোদমেহনতে উৎপাদন করতেন তাঁদের বঞ্চিত করা সম্পাদিত হয় বিধ্বংসী নিষ্ঠুরতায়। এ সব করা হয় এমন সব প্রবৃত্তির প্রেরণায় যা সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত, ইতর, তুচ্ছ, নীচ এবং ঘৃণ্য। বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র শ্রমিক তার নিজের শ্রমের ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করছে, এর উপর স্বকীয় অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি। এর পরিবর্তে এর স্থান দখল করে ক্যাপিট্যালিস্টিক প্রাইভেট প্রপার্টি (বা পুঁজি চরিত্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি)। শেষোক্তের ভিত্তি হচ্ছে অন্যের নামে মাত্র মুক্ত শ্রমের অর্থাৎ মজুর-শ্রমের শোষণের উপর। যত শীঘ্র রূপান্তরের পদ্ধতি পুরাতন সমাজকে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত যথেষ্ট বসিয়ে দেয়, শ্রমিকরা প্রলেতারিয়েতে পরিণত হন, তাঁদের শ্রমের উপাদানগুলি পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, উৎপাদনের ক্যাপিট্যালিস্ট পদ্ধতি নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তত শীঘ্র শ্রমের আরও সামাজিকীকরণ হয়, জমি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়গুলির শোষণ সামাজিক চরিত্রের রূপ নেয় এবং ফলে উৎপাদনের উপায় মিলিত সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায় হয় (common means of production) ও আরও বেশী শোষণের মধ্যে (এবার) ব্যক্তিগত মালিকদের শোষণের রূপে একটা নতুন রূপ গ্রহণ করে। যাকে এখন প্রবঞ্চিত করতে হবে, যার সব কিছু লুটে নিতে হবে সে নিজের জন্য কাজ করা শ্রমিক নয়। সে হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট বা মূলধনের মালিক, যে অনেক শ্রমিককে শোষণ করে। ক্যাপিট্যালিস্ট উৎপাদন

* আদিম পুঁজিগঠন (primitive accumulation) মার্কসের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থে বা মার্কসীয় অর্থনীতির সরলীকরণের পুস্তকগুলিতে দেখা যেতে পারে।

পদ্ধতির অন্তর্নিহিত বিধির দ্বারাই তা হয়ে থাকে। এ সম্পাদিত হয় মূলধন-কেন্দ্রীভূত হওয়ার দ্বারা। একজন পুঁজিপতি অনেক পুঁজিপতিকে খতম করে। এইরূপ কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বা অনেক পুঁজিপতিদের শোষিত করে কয়েক-জন পুঁজিপতির বিপুলাকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য জিনিষ বিকাশ লাভ করে। ক্রমোত্তর বিস্তৃতরূপে শ্রমের পদ্ধতি সহযোগিতার (কো-অপারেশনের) রূপ নেয়, সচেতনভাবে উৎপাদনের কৌশলে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়, নিয়মিত পদ্ধতি অনুযায়ী জমি চাষ হয়—শ্রমের যন্ত্রপাতিগুলি মিলিতভাবে নানান লোকের কেবলমাত্র একত্র যাগে ব্যবহার যোগ্য শ্রমের যন্ত্রপাতিতে রূপান্তরিত হয় (the transformation of the instruments of labour into instruments of a labour only usable in common)—সমস্ত উৎপাদনের উপায়গুলি সম্মিলিত (কম্বাইনড্) ও সামাজিক (সোশ্যালাইজড্) শ্রমে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে তাদের প্রয়োগ ও কাজে লাগানোতে মিতব্যয় ঘটে—সকল জাতিকে বিশ্ববাজারের জালে এবং তার ফলে ক্যাপিট্যালিস্ট শাসনব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়। বৃহৎ ধনপতি, যারা এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সমস্ত সুবিধা একচেটিয়াভাবে হস্তগত করে, তারা সংখ্যায় অবিরত কমতে থাকে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়াতে থাকে বিরাট হতে বিরাটতর সংখ্যায় জনগণের দৈন্য দুর্দশা, নিপীড়ন, দাসপ্রথা, হীন অবস্থায় নামিয়ে দেওয়া এবং তীব্র শোষণ। কিন্তু এরই সঙ্গে আবার শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহও বেড়ে ওঠে। আর সেই শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে এমন এক শ্রেণী যা সর্বদাই সংখ্যায় বাড়ছে। ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সেই শ্রেণী একতাবদ্ধ, সুসংগঠিত এবং সুশৃঙ্খলিত প্রকৃতির হয়ে গড়ে উঠছে। ক্যাপিট্যাল একচেটিয়া হওয়ায় যে উৎপাদন পদ্ধতি তার সঙ্গে এবং তার অধীনে জেগে উঠেছে এবং সতেজে বেড়ে উঠেছে সেই উৎপাদন পদ্ধতির উপর ঐ একচেটিয়া ক্যাপিট্যালই শৃঙ্খলে পর্যবসিত হয়। উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীকরণ ও শ্রমের সামাজিকীকরণ শেষে এমন এক পয়েন্ট গিয়ে পৌঁছায় যে তখন তারা, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে আবরণ তার উপর চাপা থাকে, তার সঙ্গে খাপ খায় না। শেষে এই ক্যাপিট্যালিস্ট আবরণ ছিন্নভিন্ন করা হয় (is burst asunder)। ক্যাপিট্যালিস্ট-ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে। যারা লুণ্ঠনকারী ও বঞ্চনাকারী তাদেরই বঞ্চিত করা হয়। ক্যাপিট্যালিস্ট-ব্যক্তিগত সম্পত্তি (সমাজীকৃত উৎপাদন যার ভিত্তি তার)

সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তর অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, (যা ব্যক্তিগত শ্রম থেকে উদ্ভূত) তার ব্যক্তিগত ক্যাপিট্যালিস্ট সম্পত্তিতে রূপান্তর—স্বভাবতই এমন এক প্রক্রিয়া যা প্রথোমোক্তের তুলনায় অতুলনীয় ভাবে দীর্ঘায়িত হিংস্র এবং কঠিন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম সামান্য সংখ্যক লুণ্ঠনকারী জবর দখলকারীদের দ্বারা বিরাট জনগণের শোষণ। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিরাট জনগণ কর্তৃক সামান্য সংখ্যক জবরদখলকারী লুণ্ঠনকারীদের সম্পদ আহরণ। (ক্যাপিট্যাল, ১ম খণ্ড, ৩২তম পরিচ্ছেদ)

প্রেম নিবেদনের দিক নির্দেশ

ওরিয়েন্টেশান

মালিক ও শ্রমিক উভয়ের মধ্যে সংগ্রামে এবং তাঁর ফলে উদ্ভূত শ্রমিক ধর্মঘটে শ্রমিকদের পক্ষে না থেকে মালিকের পক্ষে থাকলে তাকে শ্রমিকের বিরোধিতাই বলা হবে। এইরূপ বিরোধীরা যদি শ্রমিকের কোনও অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের শ্রমিকদের পক্ষ বিশ্বাসঘাতকই বলবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে যিনি শ্রমিকের প্রকৃত হিতার্থী এবং তাঁর ভবিষ্যত রাজনীতিক প্রগতিরও শুভাকাঙ্ক্ষী তিনি সমস্ত সম্প্রদায় নির্বিশেষে শ্রমিকের ঐক্যই কামনা করবেন। তাঁরা যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারেন প্রকৃত হিতার্থীর একান্ত উদ্দেশ্য থাকবে তাই। এমন হতে পারে যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের শ্রমিকের রাজনীতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশী এবং তাঁদেরই উদ্যোগে ধর্মঘট পরিচালিত। এমনও হতে পারে যে শোষণবিশিষ্ট সমাজের দৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ফলে প্রথমোক্তরা অন্য সম্প্রদায়ের হেয় ভেবে সাধারণভাবে সামাজিক মেলা-মেশায় গ্রহণ করেন না। আমেরিকার মত দেশে সাদা কালো শ্রমিকের মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকতেই পারে এবং থাকে। ইংলণ্ডে ইংরাজ শ্রমিক ও আয়ার-ল্যাণ্ড হতে আগত শ্রমিকের মধ্যে পূর্বে এরূপ সম্পর্ক ছিল। এখন ধলা-কালো সমস্যাও সেখানে দেখা দিয়েছে। ভারতেও এ সমস্যা কম নয়। ধর্মগত, ভাষাগত, বর্ণভেদগত ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দিয়ে, ঐরূপ ভেদাভেদে শ্রমিক শ্রেণীকে জড়িত ক'রে শ্রমিকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি ক'রে তার সুযোগ করার দিকে সমস্ত মালিকরা উন্মুখ হয়ে থাকে। তবু মালিকদের সমস্ত চক্রান্ত পরাস্ত করে সব ক্ষেত্রেই শ্রমিকের প্রকৃত হিতার্থীরা তাঁদের ঐক্য বজায় রাখার সুযোগ গ্রহণ করেন। আমেরিকায় এ কথা কোনও কালা শ্রমিকদের বন্ধু বলবেন না যে শ্বেত মালিকের সঙ্গে শ্বেত শ্রমিকের সংগ্রাম উপস্থিত হলে সেই সুযোগে কালা শ্রমিকের উচিত হবে মালিক পক্ষের সুবিধা করে দিয়ে

নিজেদের সুবিধা গুছিয়ে নেওয়া। হতে পারে সাদা শ্রমিকদের আশু অর্থনীতিক সমস্যা মিটে গেলে কালা শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের আচরণ পূর্বাপেক্ষা খুব উন্নত হবে না। তা সত্ত্বেও ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতার পথ কেউ অনুমোদন করবেন না। বরং ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট সার্থক করার চেষ্টায় কালদেরও রত হওয়া উচিত এ কথাই বলবেন। কারণ, তারই ফলে শ্রমিকের চেতনা যতো সামান্যই হোক উচ্চস্তরে উঠবে। অন্ততঃ সাদাদের মধ্যে যারা সাম্যের পক্ষে স্বসম্প্রদায়ে তাদের শক্তি বাড়বে। বুর্জোয়া সম্পত্তির প্রভুত্বই ভেদাভেদ বজায় থাকার ভিত্তি; অন্যদিকে বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমিক ঐক্যের বাস্তব ভিত্তি। সুতরাং বুর্জোয়া মালিকানাকে আঘাত করলে, তাকে দুর্বল করতে পারলে তার ভেদাভেদের উপর কাঠামোকে আঘাত করা হয় এবং শ্রমিক ঐক্যের বাস্তব ভিত্তি থেকে উদ্ভূত নতুন উপর কাঠামো সাম্যের শক্তিকে জোরদার করা হয়। অবশ্য বিশেষ প্ররোচনা মূলক ধর্মঘটও হতে পারে। মালিকদেরই চক্রান্তে অংশ গ্রহণ করে কোনও শ্বেত শ্রমিক নেতা সংগ্রামের অনুপযোগী ক্ষেত্রে ও সময়ে ধর্মঘটের আহ্বান দিয়ে কৃষ্ণকায়দের জড়িত করে বিপদে ফেলতে পারে। এমন যে হতে পারে না এ কথা বলা যায় না। এ সব ধনীদের চক্রান্তের নানান রূপের এক রূপ। সে ক্ষেত্রে কেউ যদি ঐরূপ ধর্মঘটের বিরোধী হয়, বিরোধিতার কারণকেও সেই ভাবে দর্শাতে হবে।· সেরূপভাবে দর্শালে সেটা আলোচ্য হতে পারে। নিম্নের দৃষ্টান্তে দেখা যাবে, ধর্মঘট বিরোধিতায় ঐরূপ কোনও অজুহাতেই নেওয়া হয়নি। বরং সোজাসুজি বলা হয়েছে উল্লেখিত সংগ্রাম ছিল মজুরী সম্বন্ধে অসন্তোষের জন্য। উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিক ক্ষমতা দখল। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায় শ্রমিকদের নেতৃত্বে এইরূপ একটি ধর্মঘটের কথা গান্ধীজী বলেছেন এবং তিনি এ ক্ষেত্রে কিভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের নেতৃত্বে দিয়েছেন, তাও বলেছেন। এইটুকু ভূমিকার পর ঘটনাটির বিবরণ তাঁর নিজের ভাষাতেই দিচ্ছি। (১৯১৮ সালে আমেদাবাদে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বিতরিত 'হ্যাণ্ডবিল হতে এটা উদ্ধৃতি। গান্ধীজীর রচনা সংগ্রহে গুজরাটি হতে ইংরাজী অনুবাদ সংযোজিত। সেই ইংরাজী থেকে আমি উদ্ধৃতিটি বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম):

"দক্ষিণ আফ্রিকা হচ্ছে বৃটিশ উপনিবেশ। ইউরোপীয়ানরা সেখানে চারশ' বছরের উপর থেকে আছে। নিজেদের শাসন করার স্বাধীনতা তাদের আছে।

সেখানকার রেলওয়েতে অনেক ইউরোপীয় শ্রমিক নিযুক্ত। এই সব শ্রমিকরা তাদের মজুরীতে অসন্তুষ্ট বোধ করছিল। কিন্তু তাদের মজুরী বৃদ্ধি করার চেষ্টা করার পরিবর্তে তারা গভর্নমেণ্ট দখল করার চিন্তা করতে লাগলো। (রাজনীতিক লক্ষ্যবিশিষ্ট শ্রমিকসংগঠনের যে-কোনও আন্দোলন, যেমন উল্লেখিত ধর্মঘটকে, গান্ধীজী ভবিষ্যত লক্ষ্যের সঙ্গে এক করে দেখতে পারেন। মালিকরা তো সব সময়েই শ্রমিকের যে কোনও সংগ্রামকে রাজনীতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বর্ণনা করে থাকে। তাদের এই ধরনের সমস্ত মতের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের এতো সঙ্গতি যে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিরেক না হয়ে থাকতে পারে। শ্বেতকায়দের সুবিধাবাদী শ্রমিক সংগঠনের চরিত্রও তাদের সম্বন্ধে মানুষকে সন্দিহান করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের লক্ষ্য এবং নীতির দিকে নজর রেখে এ সব ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রশ্ন বিবেচিত হয়। সুবিধাবাদের পাল্টা সন্দেহ দিয়ে নয়।—লেখক): এই গভর্নমেণ্ট দখল করার চেষ্টা ছিল অন্যায়; এ ছিল শয়তানের ন্যায়নিষ্ঠতা (ডেভিলিশ জাসটিস)। এর ফলে গভর্নমেণ্ট এবং শ্রমিকের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হলো এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ভীত হলো। কেউই নিরাপদ বোধ করছিল না। শেষে উভয় দলের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হলো এবং কিছু নির্দোষ ব্যক্তি নিহত হলেন। মিলিটারী প্রত্যেকটি স্থানকে ঘেরাও করলো। উভয় পক্ষই মোটা রকম ক্ষতিতে পড়লো।

একে অপরের পরাজয় কামনা করলো। কোনও পক্ষই ন্যায়নিষ্ঠতার ('জাসটিসের') ধার ধারলো না। উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অত্যুক্তিভরা কাহিনী বলতে লাগলো। কোনও পক্ষেরই কোন পক্ষের মনোভাব বিষয়ে বিবেচনার ভাব ছিলনা।"

"এই অবস্থা যখন চলছিল তখন আমাদের শ্রমিকরা ন্যায় পরায়ণতার আচরণ করে গেছেন। যখন উপরোক্ত রেলের স্ট্রাইক চলছিল, বিশহাজার ভারতীয় শ্রমিক যাতে সংশ্লিষ্ট এমন একটা স্ট্রাইকও চলছিল। তাঁরা ঐ দেশের গভর্নমেণ্টের কাছে বিচার পাবার জন্য সংগ্রাম করছিলেন। আমাদের শ্রমিকদের অস্ত্র ছিল সত্যাগ্রহ। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁদের কোনও শত্রুতা ছিল না, সেই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে হানিকর কোনও মনোভাবও তাঁদের ছিল না। ঐ গভর্নমেণ্টকে গদীচ্যুত করার ইচ্ছাও তাঁদের ছিলনা। ইউরোপীয় শ্রমিকগণ ভারতীয় শ্রমিকদের স্ট্রাইককে তাঁদের স্বার্থ সাধনে কাজে লাগাবার

(এক্সপ্লয়েট করবার) চেষ্টা করছিল। আমাদের শ্রমিকেরা ঐরূপে কাজে লাগতে অস্বীকার করলেন। তারা বললেন: 'আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে সত্যের সংগ্রাম। আমরা গভর্নমেণ্টকে পীড়ন করতে চাই না। তোমাদের এই লড়াই-এর বদলে আমরা সেইহেতু আমাদের সংগ্রাম স্থগিত রাখবো।' এই বিবৃতি দিয়ে আমাদের শ্রমিকেরা তাঁদের স্ট্রাইক বন্ধ করলেন। একেই আমরা প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতা বলি। শেষে আমাদের শ্রমিকেরা কৃতকার্য্য হলেন। যেহেতু গভর্নমেণ্ট আমাদের দাবী মেনে নিয়ে ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় দিলেন, আমাদের শ্রমিকেরা অপর পক্ষের মনোভাবের সম্মান করলেন এবং বিরোধী পক্ষের বিড়ম্বনার অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করলেন না। সংগ্রামের শেষে গভর্নমেণ্ট এবং আমাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন নিকটতর হলো। তাদের নিকট আমাদের সম্মান আরও উঁচুতে উঠলো। এইরূপে দেখা যায় সত্য ন্যায়নিষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিচালিত সংগ্রাম উভয়পক্ষের উপকারী।"

"আমরা যদি ঠিক উপরের মতো, ভিত্তিতে একটা ন্যায়নিষ্ঠতার ভিত্তিতে আমাদের সংগ্রাম পরিচালনা করি, আমাদের মালিকদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ ভাব না রাখি আমরাই শুধু সার্থক হবো না, শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে ভাল সম্পর্কও বাড়বে।"

উপরে উল্লেখিত ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে গান্ধীজী শ্বেতকায় মালিকদের হৃদয়ে স্থান অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু শ্বেতকায় শ্রমিকদের হৃদয়ের কথা ভাবেননি। মালিকদের হৃদয় আছে এবং শ্বেতকায় শ্রমিকদের সে পদার্থটা নেই—এমনতো হতে পারে না। শ্বেতকায় শ্রমিকদের সহযোগিতার আবেদন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। শ্বেতকায় শ্রমিকদের হৃদয়ে স্থান অর্জন করার কোনও ইচ্ছা তাঁর হলো না। বরং হলো তার বিপরীত। সেই সময় একটি ধর্মঘট বন্ধ ক'রে কাজে যোগদান ক'রে মালিক পক্ষের সরকারের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করলেন। তিনি যা বলেছেন, তার সোজা অর্থ দাঁড়ালো এইভাবে ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে লাগায় ভারতীয় শ্রমিকগণ পুরস্কৃত হলেন।

এই একটি দৃষ্টান্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী প্রেমাকর্ষণ নিক্ষেপ করার দিকনির্দেশ (ওরিয়েনটেশান) পরিষ্কার করে দেয়। শ্বেতকায় মালিকদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনকে তিনি অধিকতর মূল্যবান মনে করেছেন। শ্বেতকায়

শ্রমিকদের সঙ্গে সেরূপ কোনও বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা মনে করছেন না। বরং উপরে বর্ণিত কাজের দ্বারা তাদের অপ্রীতি এবং বিরোধিতা অর্জনকেও স্বাগত করেছেন। শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ব্যবধান দূর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—অন্তত: ভবিষ্যতে সুফলের কিছু প্রতিশ্রুতি বহন করতে পারে। ধনতন্ত্রের বাস্তব চরিত্র যা ব্যাপকতম সংখ্যায় মানুষকে সর্বহারায় পরিণত করে, উৎপাদনকে সামাজিকীকরণ করে সেই চরিত্রই শ্রমিকের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত করে ঐক্যের প্রেরণা সঞ্চারিত করে। সেই প্রেরণাকে অগ্রাহ্য ক'রে সেইরূপ ঐক্যের পথকে বর্জন ক'রে মালিক তোষণের নীতি গ্রহণ করলে অচিরেই তার বিষময় ফল সংশ্লিষ্ট বিভ্রান্ত শ্রমিকদের ভোগ করতে হয়। এইরূপ কাজের মধ্যে ব্যবধানের বিস্তৃতিরই প্রতিশ্রুতি থাকে। মালিকের তাই কাম্য। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় মালিকদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্প্রীতির ব... [illegible]করূপ নিকটতর হয়েছে আজকের ইতিহাসে তা সুস্পষ্ট। শ্বেতকায় মালিকরা সুচতুর কৌশলে শ্বেতকায় গরীব (পুওর হোয়াইট) আফ্রিকার আদিম অধিবাসী এবং ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে ভেদাভেদের সুযোগ নিয়ে আজকে ধনী নির্ধন নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিকদের এবং স্থানীয় আফ্রিকাবাসীদের এক শোচনীয় অবস্থায় নিয়ে গেছে। অতীতে ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ী ও তাদের প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে পরিচালিত ও অনুষ্ঠিত উপরে বর্ণিত নিদর্শনের অনুরূপ আচরণ কত ঘটে থাকতে পারে তা সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়। প্রলেতারিয়েতের অগ্রগামী দলের নেতৃত্বে বর্ণবি[illegible] ও জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে এই ধরনের কাজ যে অনেক ক্ষতি সাধন করে থাকতে পারে এও সহজেই বোঝা যায়। গান্ধীজী বলেছেন, "ঐ স্ট্রাইকের সময় কেউই নিরাপদ বোধ করছিলো না।" এই "কেউই"টা কারা? শ্বেতকায় মালিকদের কথা তো বোঝাই যাচ্ছে। তার সঙ্গে কি ভারতীয় ধনীরা ছিলেন এবং তাঁরাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন?

আর একটা কথা স্মরণে পড়ছে। গান্ধীজী কতবারই বলেছেন, মানুষকে মানুষের উচ্চারিত কথার উপরই মেনে নিতে হয়। তিনি বলেছেন, কথার পিছনে অভিসন্ধি আছে এ রকম ভেবে নিয়ে রাজকর্মের সিদ্ধান্ত করা বা কর্মসূচী গ্রহণ করার তিনি বিরুদ্ধে। বলেছেন, এর চেয়ে বরং মেনে নিয়ে যদি ঠকতে হয় সেরূপ ঠকাও ভাল। শ্বেতকায়দের শ্রমিক সংগঠন যখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য আহ্বান দিয়েছিল তাঁরাও নিশ্চয়ই ভারতীয়

শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার বিষয়ে কিছু সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এক তরফা সমর্থনের কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু গান্ধীজী শ্রমিকদের মুখের কথার উপর ভরসা করলেন না তো? গান্ধীজীর উপরিউক্ত প্রকারের উক্তির একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি :

"It is true that I have often been let down. Many have deceived me and many have been found wanting. But I do not repent of my association with them. For I know how to noncooperate, as I know how to cooperate. The most practical, the most dignified way of going on in the world is to take people their word, when you have no reason to the contrary." (Young India 26-12-24)

গান্ধীজী বলেছেন, তিনি সহযোগিতা করতে জানেন, অসহযোগিতাও করতে জানেন। কমবেশী মাত্রায় সকলের ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য।

মানুষ সহযোগিতা ছাড়া থাকতে পারে না আবার বাধ্য হয়ে তাকে কেন্দ্র বিশেষে অসহযোগিতাও করতে হয়। আবার সহযোগিতা ও অসহযোগিতা মানুষ বেছে নেয়। প্রশ্নটা হচ্ছে কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ সময়, কার সঙ্গে সহযোগিতা বা (অন্যথায়) অসহযোগিতা, এমন কি বিরোধিতা। ভারতীয় বুর্জোয়ারা বিদেশের মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এমন কি দেশের শ্রমিক কৃষকদের বিরুদ্ধেও তা করেছেন এবং করছেন। সামগ্রিক ভাবে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধেও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতা করেছেন। আবার প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ-পূরণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইরকম বিবাদে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তকে দেশের নামে লড়াই করার জন্য আহ্বান করেছেন—লাভের ধন ভাগ দেওয়ার জন্য নয়, নিপীড়ন ও নির্যাতনের দুর্ভোগ মাথায় নেওয়ার জন্য। তাঁদের মন্থনে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের প্রতি আমন্ত্রণ থেকেছে নীল কণ্ঠের মতো বিষপান করতে। গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও প্রশ্নটা তাই—সহযোগিতা এবং অসহযোগিতার ক্ষেত্র নির্বাচনের প্রশ্ন।

সুখের বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি অমিত বিক্রমে স্বৈরাচারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, নিদারুণ অত্যাচার সত্ত্বেও দ্বিধাহীন অকাতর আত্মত্যাগে সর্বপ্রকার ভেদ বিভেদের প্ররোচনায় বিরুদ্ধে শ্রমিকদের

তাঁদের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে কমিউনিজমের সংজ্ঞাই দেওয়া হয়েছে কালাধলা সমান এ কথা বিশ্বাস করা. ভাবা এবং প্রচার করা। তাঁরা কালাধলার সাম্যে বিশ্বাস করেন সুতরাং তাঁরা কমিউনিস্ট—এই অভিযোগে বহু শ্বেতকায় শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীও অশ্বেতকায়দের সঙ্গে সমান ভাবেই নির্য্যাতিত হয়েছেন। দুটি মত, দুটি পথ। কোন্‌টি গৌরবের? কোন্‌টি সম্ভাবনাময়?

ন্যায়নিষ্ঠতা (জাসটিস্), কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি

পূর্ব-প্রবন্ধে আমরা দেখেছি গান্ধীজী ন্যায়নিষ্ঠতা তথা জাসটিসের কথা বলেছেন। তিনি শয়তানী ন্যায়নিষ্ঠতা বা তাঁর ভাষায় ডেভিলিশ জাসটিসের কথা বলেছেন।

মুস্কিল হচ্ছে, এই 'জাসটিস' পদার্থটিকে নিয়ে। কখন যে এটি ডেভিলিশ জাসটিস বা শয়তানী ন্যায়নিষ্ঠতা হয়ে যায় এবং কখনই বা তা প্রকৃত ন্যায়নিষ্ঠতা হয়। এ এমন এক রহস্য যার অর্থ মেলা ভার।

শ্রমিকদের দাবী সম্বন্ধে তিনি বলছেন—"দুটো জিনিষ দরকার: দাবী এবং সেই দাবী আদায়ের পদ্ধতি উভয়ই ন্যায়পরায়ণ (জাস্ট) এবং পরিষ্কার হওয়া চাই। যা কেবল ধনিকদের পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চায় তাই হলো বে-আইনী দাবী। কিন্তু শ্রমিক যখন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং সন্তানদের সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযোগী মজুরীর দাবী করে তা আইন সঙ্গত দাবী। হিংসার আশ্রয় না নিয়ে ন্যায়পরায়ণতার (জাস্টিসের) চেষ্টায় থাকা এবং সালিসী মাধ্যমে পুঁজিপতিদের সুবিবেচনার প্রতি আবেদন করা হচ্ছে আইনসঙ্গত পদ্ধতি।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮।৪।২০)। একটা মজুরীর দাবী আইনসঙ্গত হতে পারে এ তিনি মানছেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলছেন—এর জন্য পুঁজিপতির সুবিবেচনার প্রতি আবেদন করার পদ্ধতি আইন সঙ্গত। অর্থাৎ সেরূপ পদ্ধতি গ্রহণ না করলে এবং ধনিকদের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে না খেয়ে কাটাতে না পারলে সেটা আর আইন সঙ্গত থাকবে না। ধনিকদের সুবিধা হচ্ছে মজুরী নির্দ্ধারণ করার সময় তাদের কারও সুবিবেচনার উপর আবেদন করতে হয় না, নির্ভরও করতে হয় না। ধর্মঘট এবং অসন্তোষের ক্ষেত্রে সংগ্রামের পথ থেকে শ্রমিকদের বিরত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত গান্ধীবাদীদের কাছেও তারা আবেদন করে না। তারা মজুরী নির্দ্ধারণ করে নিজের মর্জিতে। অবশ্য একটা ন্যূনতর মানে তাদের তা নির্দ্ধারণ করতে হয়। সে-তত্ত্বে এখন আমরা যাচ্ছি না।

এই জাস্ট বা ন্যায়পরায়ণ কথাটা তাঁর লেখায় বা ভাষণে বার বার আসে।

মজুরী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেই তিনি বলেছেন: মজুরী হবে "যা আলোক প্রাপ্ত জনমত ন্যায্য (জাস্ট্) বলে ঘোষণা করবে।" (হরিজন, ৩১-৩-৪৬)

ধর্মঘটের সার্থকতার সর্ত সম্বন্ধে তিনি বলছেন—"স্ট্রাইকের উদ্দেশ্য ন্যায্য (জাস্ট্) হওয়া চাই।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-২-২১)। সঙ্গে সঙ্গে ঐ একই প্রবন্ধে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন: "যদি ধর্মঘটে রত শ্রমিকের স্থানে অন্য শ্রমিক কাজে যোগ দিতে প্রস্তুত থাকে, ধর্মঘটে কোনও কাজ হয়না।" এ কথা আসবেই কারণ তিনি তার আগেই বলে নিয়েছেন "যারা ধর্মঘট করবে না তাদের উপর কোনও হিংসা প্রয়োগ চলবে না।" তা হলে করা হবে কি? উপরোক্ত পরিস্থিতিতে তাঁর পরামর্শ হচ্ছে "অন্যায় আচরণ এবং যথার্থ প্রয়োজনের কম মজুরী ইত্যাদি অভিযোগের ক্ষেত্রে, কাজ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিকারের পদ্ধতি।" অন্য লোকে কাজ নিল, মজুর সংগ্রাম ছেড়ে এমন কি কাজ ছেড়ে চলে গেল। এতে প্রতিকার কি করে হলো, বোঝা গেল না। ধনিককে ভালবাসার কথা তো আছেই (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হরিজন ১-৩-৩৫)। তার বেশী উল্লেখ দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

নিম্নের উদ্ধৃতিটি তাঁর মনের কিছু পরিচয় দেবে:

"খাঁটি ন্যায়পরায়ণতা (জাসটিস্) হচ্ছে তাই যা প্রতিবেশী সুলভ প্রীতি এবং করুণার দ্বারা উদ্দীপিত হয়। ভারতে একেই আমরা প্রাচ্য বা প্রাচীন ন্যায়নিষ্ঠতা (জাসটিস্) বলি। যে ক্ষেত্রে ঐরূপ প্রীতি বা করুণা নেই—তাকে বলা হয় শয়তানী (ডেভিলিস) বা পাশ্চাত্য আধুনিক ন্যায়নিষ্ঠা (জাসটিস্) প্রীতির কারণে পিতা পুত্রের জন্য অনেক কিছু ছেড়ে দেন। তার বিপরীতও ঘটে। এইরূপে কাজ করে শেষে উভয়েই লাভবান হন। এক জনের জন্য ত্যাগ করে দাতা একটা গৌরব বোধ করেন। তিনি এটা তাঁর শক্তির পরিচয় মনে করেন, দুর্বলতার নয়। ভারতে এক সময় ছিল যখন ভৃত্যেরা একই বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে কাজ করতো। তারা যে-পরিবারে কাজ করতো সেখানে পরিবারের অন্যতম হিসাবেই বিবেচিত হতো। তারা মালিকের দুঃখ দুর্দশারও অংশ গ্রহণ করতো। মালিকও তাদের সুখ দুঃখের সাথী হতেন। যে-সময় ভারতে এই রকম অবস্থা ছিল, সামাজিক ব্যবস্থা সরল ছিল এবং এটা হাজার হাজার বছর ধরে এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল। এমন কি এখনও আমাদের দেশে এই মনোভাবের পরিচয় পাই। এইরূপ ব্যবস্থা যেখানে আছে সালিশীর জন্য তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। মালিক ও ভৃত্যের মধ্যে

কলহের মীমাংসা হয় তাদের উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায়। পরস্পরের প্রয়োজনের তাগিদের উপর মজুরীর বৃদ্ধি বা হ্রাস নির্ভর করতো না। ভৃত্যেরা বেতনবৃদ্ধির দাবী করতো না যখন ভৃত্যের অভাব ঘটতো। কিংবা মালিকরা মজুরী কমাতো না যদি ভৃত্যের চাকরীর প্রার্থী বেশী হতো। এখন যেমন বাস্তব সম্মত নয় বলে মনে করা হয় তখন তা করা হতো না। কারণ, মনিব এবং চাকরের মধ্যে এই সম্পর্ক সারা দেশেই প্রচলিত ছিল। ইতিহাসের রেকর্ডে রয়ে গেছে আমাদের দেশের মানুষ এই খাঁটি ন্যায়নিষ্ঠতাকে জীবনের আইন হিসাবে গ্রহণ করেছিল বলে অনেক মহান কাজ করতে পেরেছিল। এই হলো প্রাচীন বা প্রাচ্য ন্যায়নিষ্ঠতা (জাসটিস্)। পাশ্চাত্য জগতে সম্পূর্ণ অন্যরকম জীবন। এটা মনে করা ঠিক হবে না যে পশ্চিমের সব মানুষই আধুনিক ন্যায়নিষ্ঠতার অনুমোদন করেন। পশ্চিমে অনেক সাধু ব্যক্তি আছেন—তাঁরা প্রাচীন মানকে মেনে নিয়ে খাঁটি জীবন যাপন করেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের সাধারণের অধিকতম কাজে প্রীতি বা করুণার কোনও ভাব নেই। মালিক যেমন সুবিধা বোঝেন চাকরকে তেমনই মজুরী দেবেন—এটাই ন্যায্য বিবেচনা করা হয়। চাকরের প্রয়োজনের তাগিদ কি নির্দেশ দেয় তা বিবেচনা করা হয় না। সেইরকম শ্রমিক ও মালিকদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে তার অবস্থা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী যা ইচ্ছা মজুরী দাবী করে। একে ন্যায্য বলে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেকে নিজের কথা ভাবে, অপরের কথা ভাবতে বাধ্য হয়।"
('এ রাইচাস্ স্ট্রাগল্', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, উদ্ধৃতি অংশের অনুবাদ লেখকের)

বলা বাহুল্য শেষের কথাগুলোই আসল কথা। অর্থাৎ মজুর কর্তৃক মজুরীর দাবীর সমালোচনা। কারণ, বেকসুর অনশনের দণ্ডদান করার ক্ষমতা যার আছে ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুর অপেক্ষা সেই ধনিকের ওজন বেশী তাতে তো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। সামন্তযুগে আবেগ আর অনুভূতির মাধ্যমে শোষণের রূঢ়তাকে ঢেকে রাখা হতো। গান্ধীজী তারই বিবরণ দিয়েছেন। এ পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের ব্যাপার নয়। দেশে দেশে বিশেষ করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি ঐ চরিত্রের সম্পর্ক মধ্যযুগীয় সম্পর্ক। গান্ধীজী লিখছেন পুরুষানুক্রমে যারা চাকর ছিল তাদের কথা। তিনি কি আশা করতেন প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের সভ্যতার গৌরব বর্দ্ধনের জন্য তাদের সেই পুরুষানুক্রমের বৃত্তি চালিয়ে যাওয়াটাই কাম্য ছিল?

তাই যদি বা কাম্য হয় তাদের সেই বৃত্তিচ্যুত করলো কে? শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুর কি স্বেচ্ছায় গ্রাম থেকে বের হয়েছিল? প্রভুর বংশরক্ষার জন্য পান্না নিজ শিশুর প্রাণ বলিদান করেছিল। অনুরূপ সব দৃষ্টান্তে যে প্রভুভক্তির নিদর্শন আছে আজকের দিনে তাই কি মজুরের অনুকরণীয় বলে মজুরের সামনে তুলে ধরতে হবে? "জমীদারের নুন খেয়েছি, তার কথা মানতে হবে, পুরুষানুক্রমে খেয়েছি, তার প্রতি বেইমানী করা আমার বংশে হবেনা"—এইরূপ ধর্মবোধে জমীদারদের লেঠেলরা জমিদারদের নির্দেশে গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ, নরহত্যা চালিয়ে গেছে। তাঁর স্বাক্ষর এখনও গ্রামে গ্রামে রয়ে গেছে। গান্ধীজী যখন মিষ্ট সম্পর্কের কথা বললেন, তখন এই তিক্ত কথাগুলো স্মরণ করলেন না কেন?

বাহ্যিক ছলনায় ধনতন্ত্রে ধরে নেওয়া হয় সবাই সমমর্য্যাদার—সবাই সমান। পণ্য বিক্রেতা বা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই সমান। শ্রমিক ও তাঁর শ্রমশক্তির বিক্রেতা। মালিক তার ক্রেতা। গান্ধীজী একদিকে সামন্ত যুগের ছলনা মনিব-চাকরের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্ক—একেও নিয়ে এসেছেন আবার ধনতন্ত্রের সাম্যের ছলনা মালিক ও শ্রমিকের শ্রমশক্তির, ক্রেতার ও বিক্রেতার সম্পর্কের সাম্যের ছলনা, উভয়কে মিশিয়ে জড়িয়ে ফেলেছেন। এতে এক রহস্যের আবরন সৃষ্টি হয়—যার দ্বারা ধনতান্ত্রিক শোষণের রূঢ় সত্য ঢাকা থেকে যায়।

মধ্যযুগীয় সম্পর্ক যদি এতই মধুর ছিল এবং শুধু মিষ্টই ছিল ভাঙলো কেন এবং ভাঙলো কে? আমাদের দেশে অবশ্য পশ্চিমের তথা ইংলণ্ডের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আক্রমণের আঘাতে তা ভেঙেছে। কিন্তু যে বুর্জোয়া শক্তি তা করেছে বিশ্বের একাংশে তথা ইউরোপে তার উদ্ভব মধ্যযুগের সমাজের অভ্যন্তরে। সেই সমাজের মধ্যেই সেই বিরোধী শক্তির পুষ্টি ও বৃদ্ধি। শেষে বিপ্লবের মাধ্যমে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এতে আমাদের দেশের কোনও রূপ ভূমিকাই থাকেনি এমন নয়। ভূমিকা সক্রিয় না হলেও, শুধু অপরিপন্থী বা প্যাসিভ হলেও সে ভূমিকা ইতিবাচক। এখানকার লুন্ঠিত ধনসম্পদ বুর্জোয়া ইংলণ্ডের পুঁজির স্ফীতিতে সাহায্য করেছিল। সে স্ফীতি বিপুলাকার এবং তারই ফলে ইংলণ্ডে দ্রুতগতিতে শিল্প বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বুর্জোয়া সম্পর্ক কর্তৃক মধ্যযুগীয় সম্পর্কের ধ্বংস সাধনের বিবরণ মার্কস সুন্দরভাবে "কমিউনিস্ট ইস্তাহারে" বর্ণনা করেছেন।

"ইতিহাসের দিক দিয়ে (বলা যায় যে) বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা অভিনয় করে গেছে।"

"বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই কর্তৃত্ব করতে পেরেছে সেখানেই ফিউডাল সম্পর্ক অভিজাতসুলভ মোড়লীর ব্যবস্থা, সাবেকী ভাবপ্রবণ আমল শেষ ক'রে দিয়েছে 'প্রাকৃতিক অধিকারে যারা সমাজের মাথা' তাদের কাছে যে-ফিউডাল বাঁধনে মানুষ আগে বাঁধা ছিল, সেই বাঁধন এরা নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলেছে। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে খোলাখুলিভাবে নিজস্ব স্বার্থের বন্ধন, ভাবাবেগহীন শুধু 'টাকা দেওয়া নেওয়া'র বাঁধন ছাড়া আর কিছুই (তখন) বাকি রইল না। ধর্মের উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, আর্ত্তকে উদ্ধার করবার অভিযানের উৎসাহ, সস্তা ধরনের ভাবাবেগের বেশাতি—এই সব কিছুকেই আত্মাশ্রয়ী হিসাব-নিকাশের বরফজল ঢেলে এরা ডুবিয়ে দিল। লোকের নিজস্ব মূল্যকে এরা পণ্য-বিনিময়ের মূল্যের স্তরে টেনে নামিয়েছে। সাবেকী দিনের সর্বগ্রাহ্য অসংখ্য প্রতিষ্ঠিত অধিকারের স্থানে তারা এনে খাড়া করল একটি মাত্র স্বাধীনতার অপরিসীম দাবী, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার। এক কথায়, ধর্মনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত ভুল বুঝানোর আবরণে যে শোষণ (এতদিন) ঢাকা ছিল, বুর্জোয়া শ্রেণী তার বদলে এনে দিয়েছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ।

"মানুষের যে-সব বৃত্তিকে এতদিন লোকে সম্মান করে এসেছে, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে লোকে যার দিকে চেয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণী সেই সব বৃত্তির মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসক, আইন বিশারদ, পুরোহিত, কবি, বৈজ্ঞানিক—সকলকে এরা মাইনে করা ভৃত্যের পর্য্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে।

"বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবার প্রথা হতে তার ভাবোচ্ছ্বাসী পরদাটুকু ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে পরিণত।

"মধ্যযুগে শক্তির পশুসুলভ যে প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এতটা মাথায় তোলে, তারই যোগ্য সাথী হিসাবে অলস নিষ্ক্রিয়তা কি করে এসে পড়েছে সে-কথা বুর্জোয়া শ্রেণীই ফাঁস করে দেয়। প্রথম এরাই দেখিয়ে দিল মানুষের প্রয়াস কি-না সম্ভব করে তোলে। এদের আশ্চর্য্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পয়োপ্রণালী ও গথিক গির্জাকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গিয়েছে। এরা এমন অভিযানে নেতৃত্ব যুগিয়েছে যার তুলনায় অতীতের সকল জাতির দিগ্বিজয় ও জয়যাত্রা ম্লান হয়ে পড়ে।

"উৎপাদনের উপায়ের ভিতর ক্রমাগত বিপ্লবী বদল না এনে বুর্জোয়া শ্রেণী

টিকে থাকতে পারে না। তার ফলে উৎপাদনের সম্বন্ধে বিশাল পরিবর্তন আসে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ভিতর পারস্পরিক সম্বন্ধের গোটা চেহারাটা বদলে যায়। অপরদিকে, শিল্পের কাজে নিযুক্ত আগেকার সকল শ্রেণীর বেঁচে থাকবার প্রথম অবলম্বনই ছিল সাবেকী উৎপাদন প্রণালীর অপরিবর্তিত রূপটাকে বজায় রাখার চেষ্টা। আগেকার সকল যুগ হতে বুর্জোয়া যুগের বিশেষ তফাৎ হলো এই যে, (এখন) উৎপাদন পদ্ধতিতে বারবার বদল এসে পড়ে, সামাজিক সকল ব্যবস্থার অবিরাম শান্তিভঙ্গ হতে থাকে, অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে। জমাটবাঁধা চিরস্থির সকল সম্বন্ধ ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়; অথচ নবগঠিত সকল সম্বন্ধই দৃঢ়সম্বন্ধ হয়ে ওঠবার আগেই তার দিন ফুরিয়ে আসে। যা কিছু স্থূল তাই যেন বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকে; যা পবিত্র বলে গণ্য তার আর মাহাত্ম্য থাকে না; শেষ পর্যন্ত মানুষকে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা মাত্র নিয়ে নিজের জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে নিজের আসল সম্বন্ধের সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।"

এই সূত্রে এঙ্গেল্‌সের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য:

"In order to create the modern revolutionery class of the proletariat it was absolutely necessary to cut the umbilical cord which still bound the worker of the past to the land. The hand worker who had his little house, garden and field along with his loom was a quiet, contented man, "godly and honourably" despite all misery and despite all political pressure, he doffed his cap to the rich, to the priest and the officials of the state and inwardly was altogether a slave. It is precisely modern large scale industry which has turned the worker, formerely chained to the land, into a completely propertyless proletarian, libarated from all traditional fetters, *a free out low*, it is precisely this economic revolution which has created the sole conditions under which the exploitation of the working class in its final form, in captalist production can be overthrown And now comes this tearful Proudhonist

and bewails the driving of the workers from health and home· as though it were a great retrogression instead of the very first condition of their intellectual emancipation." (Engles, Housing Question)

(মর্মার্থ: আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের সৃষ্টির জন্য অতীতের শ্রমিকের জমির সঙ্গে নাড়ির যে বন্ধন ছিল তা ছিন্ন করার প্রয়োজন ছিল। হস্তচালিত তাঁতের তাঁতী—যার তাঁত ছাড়া ছিল ছোট বাড়ী, বাগান আর খেত —শান্ত সন্তুষ্ট মানুষ ছিল! সব রকম দুর্দশা এবং রাজনীতিক চাপ সত্ত্বেও সে ছিল 'ধর্মভীরু এবং সম্মানিত'। মাথার টুপিটি তুলে সে ধনীদের, পুরোহিতকে এবং সরকারী কর্মচারীকে সালাম দিত এবং মনের ভিতর ছিল একেবারে দাস মনোবৃত্তি সম্পন্ন। এ হলো আধুনিক বৃহদাকার শিল্প, যা জমির শৃঙ্খলে বাঁধা শ্রমিককে সম্পূর্ণ সম্পত্তিহীন প্রলেতারিয়েতে পরিণত করেছে। তাকে অতীতের চিরকালের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন আইনের আশ্রয়বিহীন মানুষে পরিণত করেছে। এই হলো সেই নির্দিষ্ট অর্থনীতিক বিপ্লব যা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের চূড়ান্ত রূপ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে উল্টে দেওয়ার একমাত্র সর্ত, একমাত্র অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এখন অশ্রুভরা চোখ নিয়ে এসে হাজির হচ্ছেন প্রুধোবাদী। তিনি শ্রমিকের তার ঘর ও চুলো থেকে বিতাড়িত হওয়ায় কাতরভাবে ক্রন্দন করছেন। যেন এই বিচ্ছিন্নতঃ শ্রমিকের বুদ্ধি মুক্তির প্রথম সর্ত হওয়ার পরিবর্তে একটি পশ্চাৎ পদক্ষেপ ঘটেছে)

তিনি আরও বলেছেন :

The English pro.etarian of 1872 is on an infinitely higher level than the rural weaven of 1772 with his health and home.' (Ibid)

(মর্মার্থ: ১৮৭২ সালের ইংরেজ প্রলেতারিয়ান শ্রমিক ১৭৭২ সালের 'চুলো ও ঘর' ওয়ালা শ্রমিক অপেক্ষা অসীম গুণের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত)।

'জাসটিস' তথা ন্যায়-নিষ্ঠতার ওকালতি সম্বন্ধে মার্কসের বক্তব্য উপস্থিত করা প্রয়োজন। এঙ্গেলস্ বলেছিলেন : "Every time our good Proudhon loses the economic hang of things—and this happens to him with every serious problem—he takes refuge in the sphere of law and appeals to etetnal justice." (Housing Question)

(মর্মার্থ: যখনই প্রুধোঁ অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুগুলির আসল স্থিতি হারিয়ে ফেলেন—এ আবার তাঁর প্রত্যেকটি সিরিয়াস সমস্যাতেই ঘটে—তিনি আইনের আশ্রয় নেন এবং চিরন্তন ন্যায় নিষ্ঠতার (ইটারন্যাল জাসটিসের) প্রতি আবেদন জানান)।

মার্কস বলছেন: "প্রুধো পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতি বিশিষ্ট আইনের সম্পর্ক (জুরিডিক্যাল সম্পর্ক) থেকে তার সনাতন ন্যায়নিষ্ঠতার (জাসটিস্ ইটারন্যালের) আদর্শ গ্রহণ করে আরম্ভ করেন। লক্ষ্যণীয় যে এর দ্বারা তিনি তার একটা কাজ উদ্ধার করেন। তিনি সকল সৎ নাগরিককে সান্ত্বনা দিয়ে প্রমাণ করেন যে পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি সেইরূপ সনাতন পদ্ধতি যেমন ন্যায়নিষ্ঠতা (জাসটিস্)। তার পর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঐ আদর্শ অনুযায়ী প্রকৃত পণ্য উৎপাদনকে এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গতি বিশিষ্ট প্রকৃত আইনের ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে চান। একজন রসায়নবিদ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত কী হবে (যদি দেখি) তিনি বস্তুর গঠন বিন্যাস ও বিশ্লেষণে মলিকিউলার পরিবর্তনের বাস্তব বিধিগুলি অনুশীলন করার পরিবর্তে ঐ গঠন বিন্যাস ও বিশ্লেষণকে 'ন্যাচুর্যালিটি এবং অ্যাফিনিটি'র সনাতন ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার দাবী করেন? Usury বা কুসীদ গ্রহণকে গির্জার যাজকগণ বলতেন (ঐ পাপ) 'গ্রেস ইটারন্যাল' 'ফয় ইটারন্যাল' এবং 'লা ভ্যালন্টি ইটারন্যাল' প্রভৃতি (ধর্মীয় পুণ্য সূত্রগুলির) সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আমরা কি সত্যই কুসীদ গ্রহণ সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে পাই যদি 'জাসটিস্ ইটারন্যাল' 'ইকুইটি ইটারন্যাল' এবং 'মিউচিউয়ালিটি ইটারন্যাল' এবং অন্যান্য 'ভেরিটিজ ইটারন্যাল' (অর্থাৎ বুর্জোয়া আইনের পরিভাষায়) কতকগুলি গুণের উল্লেখ করে বলি কুসীদ গ্রহণ সে সবের বিরোধী?

মূল ইংরাজী অনুবাদ নিম্নরূপ:

("Proudhon begins by taking his ideal of justice of '*justice eternelle*' from the juridical relations that correspond to the production of commodities; thereby, it may be noted, he proves, to the consolation of all good citizens, that the production of commodities is a form of production as ever lasting as justice. Then he turns round and seeks to reform the actual legal system corresponding there to, in accordance

with this ideal. What opinion should we have of a chemist, who, instead of studying the actual laws of the molecular changes in the composition and decomposition of matter, and on that foundation solving definite problems claimed to regulate the composition and decomposition of matter by means of the 'eternal ideas' of '*naturalite and affinite*'? Do we really know any more aboute usery when we say it contradicts '*justies eternelle*' '*equite eternelle*' '*naturalite eternelle*' and other '*Verities eternelle*' than the fathers of the church did when they said it was incompatible with '*graoe eternelle*' '*foi eternelle*' and '*la volonte eternelle* de Dieu'?" Marx, Capital, Moscow, 1954, Vol I, foot note 2, pp. 84-85.)

এই সঙ্গে গান্ধীজীর 'অধিকার ও কর্তব্য' সম্বন্ধে উপদেশাবলীও আলোচনা করে নিতে হয়। "মালিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট মজুরী, সুবিধাদি ও ভাল ব্যবহার দাবী করার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে। সঙ্গে সঙ্গে এতো আশা করা যায়, তোমারা যা মজুরী পাও তার বদলে ন্যায় পরিমাণ শ্রমটা দেবে" (হরিজন, ২-২-৩৪)। মজুরই তার পরিশ্রমের মূল্য পান না। এবং তাঁর কাছ থেকে আদায় করা উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যাতিরেকে ধন পুঞ্জীভূত হয় না। ইত:-পূর্বেই মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল হতে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি, পুঁজি থাকলেও শ্রমশক্তি বিক্রয় করার মতো লোক না থাকলে অর্থাৎ মজুর না থাকলে ধনবৃদ্ধি হয় না। বাস্তবের এই পটভূমিকায় গান্ধীজী কর্তৃক মজুরকে স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপরোক্ত উপদেশ দান অসঙ্গত বলেই প্রতিভাত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার সম্বন্ধে অকুণ্ঠভাবে, নির্লজ্জভাবে চাপ দেওয়ার সমালোচনা করে গান্ধীজী বলেছেন: "অধিকার এবং কর্তব্য এই দুই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার প্রয়োজন আছে আমি সাহস করে বলব যে যে-অধিকার সুসম্পাদিত কর্তব্যপালন হতে বের হয়ে আসে না সে অধিকার গ্রহণ করার যোগ্য অধিকার নয়। সে-রকম অধিকার হবে কেড়ে নেওয়ার অধিকার—যত শীঘ্র পরিত্যক্ত হয় ততই ভাল। যে হতভাগা [illegible] সন্তানদের প্রতি তার কর্তব্য পালন করে না অথচ তাদের বাধ্যতার দাবী করে সে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পায় না, উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন স্বামীর কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রীর নিকট হতে প্রতিটি

বিষয়ে পূর্ব নির্দেশ পালন আশা করা ধর্মের বিকৃতি। কিন্তু সেইসব সন্তানের যারা কর্তব্যপরায়ণ পিতা বা মাতার নির্দেশ অমান্য ও অগ্রাহ্য করে, তাদের অকৃতজ্ঞ বলে বিবেচনা করতে হবে। তারা পিতা মাতার যত ক্ষতি করুক বা না করুক তার চেয়ে বেশী নিজেদেরই ক্ষতি করবে। স্বামী এবং স্ত্রী সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা চলে। এই সরল এবং সার্বিক (ইউনিভারস্যাল) নিয়ম যদি মালিক ও শ্রমিক, জমীদার ও প্রজা, রাজন্যবর্গ ও তাঁদের প্রজা, হিন্দু এবং মুসলমান সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় দেখবে ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যা ঘটেছে জীবন এবং কাজ কারবারের সেরূপ কোনও গণ্ডগোল এবং স্থিতিচ্যুতি না ঘটিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং সুখকর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়।" (হরিজন, ৬-৭-৪৭)। "কর্তব্য ভালভাবে পালন করলেই অধিকারের যোগ্য হওয়া যায় এবং অধিকার রক্ষা করা যায়" (হরিজন, ৮-৬-৪৭)।

ব... বাহুল্য, উপরে ন্যায়নিষ্ঠতা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো এ তারই অনুসিদ্ধান্ত। মার্ক্স তাঁর "পভার্টি অব ফিলসফি" পুস্তকের একটি প্রসিদ্ধ অনুচ্ছেদে এই 'বিউটিফুল হারমনি বিটুইন রাইট্‌স্ এণ্ড ডিউটিজ', বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। অনুচ্ছেদটি নিয়ে উদ্ধৃত করছি:

"Eeudalism also had its proletariat-serfdom, which contained all the germs of the bourgeoisie. Feudal production also had two antagonostic elements which are likewise designated by the name of the good side and the bad side of feaudalism irrespective of the fact that it is always the bad side that produces the movement which makes history by providing a struggle. If, during the epoch of the domination of feudalism, the economist, enthusiastic over the knightly virtues, the beautiful harmony between rights and duties, the patriarchal life of the towns, the prosperous condition of the domestic industry in the countryside, the development of industry organi...d into corporation, guilds and traternaties, in short everything that constitutes the good side of feudalism had set themselves the problem of

eliminating everything that cast and shadow on this picture —serfdom, privileges and anarchy—what would have happened ? All the elements which called forth the struggle would have been destroyed, and the development of the bourgeoisie nipped in the bud. One would have set themselves the absurd problem of eluminating history."

(মর্মার্থ : সামন্ততন্ত্রেরও প্রলেতারিয়েত ছিল—যথা ভূমিদাস, যার মধ্যে বুর্জোয়াজীর জীবাণু ছিল। মন্দ দিকই চিরকাল ভাল দিকের উপর জয় করে এই বাস্তব ঘটনা নির্বিশেষে, সামন্ততন্ত্রেরও ভাল দিক এবং মন্দ দিক ছিল। মন্দ দিকটাই সেই দিক যা সেই আন্দোলন উৎপাদন করে, যা সংগ্রামের উপলক্ষ সরবরাহ করে ইতিহাস সৃষ্টি করে। যদি সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যের কালে অর্থনীতিবিদরা নাইটদের গুণাবলী, অধিকার এবং কর্তব্যের সুন্দর মিল পিতৃপ্রধান সহরে জীবন, গ্রামদেশের কুটির শিল্পের সমৃদ্ধি, মণ্ডলে সংগঠিত শিল্পের বিকাশ, গিল্ড্ এবং ভ্রাতৃমণ্ডলী সমূহ, সংক্ষেপে, যা কিছু নিয়ে সামন্ততন্ত্রের ভাল দিক রচিত তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত আবেগে যা কিছু এই চিত্রের উপর ছায়াপাত করে—ভূমিদাসপ্রথা, (সামন্ত শোষকদের) বিশেষ সুযোগ সুবিধা, অরাজকতা—প্রভৃতি অপসারণ কাজে রত হতেন তা হলে কি ঘটতো ? যে-সব উপাদান গুলি সংগ্রামকে জাগিয়ে তুলতো এবং ডেকে আনতো সেগুলির বিনাশ ঘটতো এবং বুর্জোয়াজীর বিকাশ কুঁড়ির অবস্থাতেই বিনষ্ট হতো। ইতিহাসকে এলিমিনিট করার ইতিহাসকে বাতিল করার অসম্ভব কার্যসূচী গ্রহণ করা হতো।)

মার্কস আবার বলছেন :

"From day to day it thus becomes clearer that the production relations in which the bourgeoisie moves have not a simple, uniform character, but a dual character ; that in the selfsame relations in which wealth is produced. Poverty is produced also ; that in the salfsame relations on which there is a development of the productive forces there is also a force producing repression ; that these relations producce *bourgeois wealth* i. e. the wealth of the bourgeois

class, only by continually annihilating the wealth of the individual members of this class and by producing an evr-growing proletariat." (Marx, Poverty of philosophy)। মর্মার্থ: দিনের পর দিন এ কথা আরও পরিষ্কার হচ্ছে যে বুর্জোয়াজী যে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সক্রিয় থাকে তার একটা সরল, একবিধ চরিত্র নেই, তার আছে দ্বৈত চরিত্র। যে সম্পর্কের মধ্যে ধনোৎপাদন হয়, দারিদ্রের উৎসও সেই সম্পর্কে। যে-সম্পর্কের ফলে উৎপাদনের বিকাশ হয় সেই সম্পর্কের মধ্যেই আবার থাকছে নিষ্পেষনের শক্তি। এই সম্পর্ক বুর্জোয়া ধনসম্পদ সৃষ্টি করে অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনসম্পদ সৃষ্টি করে—কিন্তু তাও করে অবিরত ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগত সদস্যদের ধন সম্পদ ক'রে এবং বিরতি হীন ভাবে-বৃদ্ধিমান প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে।)

এর পর মার্কস দেখালেন যে "যতই অ্যানট্যাগনিসটিক কারেকটার বা মুখোমুখি বিরোধিতার চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়ে ততোই বুর্জোয়াজীর বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিরা দেখে তাদের নিজেদের মতবাদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন মতের গোষ্ঠী জেগে ওঠে।" এরপর বুর্জোয়া অর্থনীতির চিরায়ত ধারক অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো এবং অন্যান্য পন্থীদের গোষ্ঠীগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি হিউম্যানি-টেরিয়ান বা মানব হিতৈষণার প্রচারক গোষ্ঠীর আলোচনা করেন। হিউম্যানিটেরিয়ান তথা 'মানবহিতৈষী' বর্তমান কালের উৎপাদন সম্পর্কের মন্দ দিকটার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। নিজেদের বিবেকের সন্তোষের জন্য এরা প্রলেতারিয়েতের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি জানায়। শ্রমিকদের এরা নানান উপদেশ দেয়, কঠিন পরিশ্রম করতে বলে ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতে বলে। এই গোষ্ঠির সমগ্র মতবাদ, মত এবং কাজ, নীতি এবং ফল, আদর্শ এবং প্রয়োগ, ভাল এবং মন্দের সীমাহীন পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নিজেদের 'ফিলানথ্রপিক' বা মানবপ্রেমিক বলে যারা দাবী করে সেই গোষ্ঠীর সম্বন্ধে মার্কস বলছেন এরা হিউম্যানিটেরিয়ান মতবাদের পূর্ণ পরিণতি এরা বিরোধিতা বা অ্যানট্যাগনিজমের আবশ্যিকতাই অস্বীকার করে সব মানুষকে এরা বুর্জোয়া করতে চায়। ফিলানথ্রপিস্টরা বুর্জোয়া সম্পর্কটা রাখতে চায় তার দ্বন্দ্বটা বাদ দিয়ে—যে দ্বন্দ্ব তার অন্তর্নিহিত এবং তার থেকে

অবিচ্ছেদ্য। তারা মনে করে তারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়ছে। কিন্তু তারা বুর্জোয়াদের চেয়েও বেশী বুর্জোয়া।

যারা দারিদ্রের মধ্যে দারিদ্র ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না তাদের মার্কস দেখিয়ে দিলেন যে এই দারিদ্রই হচ্ছে বিপ্লবের দিক, পুরাতন সমাজকে উচ্ছেদ করার দিক, উল্টে দেওয়ার দিক।

আসলে সামন্ততান্ত্রিক যুগের তবু কিছু ভাল দিক স্মরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজকে অতীতে এবং ভবিষ্যতে প্রলম্বিত ক'রে সেই সমাজকে চিরস্থায়ী ভাবলে কী দারুণ বিভ্রান্তি ঘটে মার্কস তারই ব্যাখ্যা করেছেন এবং কী করলে এরূপ ঘটে তা মার্কস দেখিয়েছেন।

গুরু বচনে ভক্তদিগের বিশ্বাসের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধীজী নিজেই বলেছেন, রাসকিন তাঁর গুরু। সুতরাং রাসকিনের একটি বক্তব্য এখানে উপস্থিত করছি।

রাসকিন বলেছেন: "Therefore the first necessity of social life is the clearness in enforcing the law that he should keep who has justly earned (মর্মার্থ "সুতরাং সামাজিক জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে পরিষ্কার ভাবে এই আইনকে প্রয়োগ করা, যে ব্যক্তি যা ন্যায্য ভাবে উপায় করেছে সে তা রাখবেই।"—ক্রাউন অব ওয়াইল্ড অলিভস, ১৯৬০ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০)

উপায় ন্যায্যভাবে হয়েছে কিংবা অন্যায্যভাবে হয়েছে সে পৃথক কথা। লক্ষনীয়, রাসকিনে আদর্শ হচ্ছে এই যে বুর্জোয়া সম্পত্তি রাখতেই হবে। এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মার্কস তৎকালীন ইউরোপের এক গোষ্ঠীর সম্বন্ধে বলেছিলেন, তারা বুর্জোয়ার চেয়েও বুর্জোয়া। আজকের দিনে এখানেও সেরূপ চরিত্রের গোষ্ঠীর অভাব নেই। তবে ধনতন্ত্রের দ্রুত অবক্ষয়ের কালে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাদের সমধর্মিতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।